ভারত-ভগিনী নিবেদিতা

[অনুধ্যান]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

আমাদের নিবেদন

ভগ্নী নিবেদিতার জন্ম-লগ্ন থেকে এক শতাব্দী পূর্ণ হয়ে এল। সেই শতবর্ষ-পূর্তির স্মরণিকা হিসাবেই সে মহীয়সী নারীর 'চরিতানুধ্যান' বাংলার বিদগ্ধ-সমাজের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করলাম।

ভগ্নী নিবেদিতার একাধিক জীবন-কথা ইতিমধ্যে, একাধিক ভাষায়, প্রকাশিত হয়েছে। সন-তারিখ-সম্বলিত সে-সব জীবন-কাহিনীর কোনটি সংক্ষিপ্ত, কোনটি বিস্তারিত তথ্যে সমৃদ্ধ। আমাদের বর্তমান-প্রয়াস অবশ্য ঠিক ঐ সব গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত নয়। সন-তারিখের খুঁটি-নাটি ও তাদের পারম্পর্য নিয়ে নিবেদিতার ভাব-জীবন বা কর্মজীবন, কোনটিই আমরা ধরতে চেষ্টা করিনি। সে-চেষ্টা পুনরুক্তি দোষে কতকটা দুষ্টও হয়ত হত।

আমরা প্রধানতঃ নিবেদিতার স্বকীয় উক্তি থেকেই তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। একই দেহে ধর্মান্তর গ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত আছে পৃথিবীতে, কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর লাভের ইতিহাস দুর্লভ। নিবেদিতা সে দুর্লভ ইতিহাসেরই অনন্য নায়িকা। এক কঠিন তপস্যার অগ্নিদাহে তাঁর পক্ষে সে জন্মান্তর লাভ সম্ভব হয়েছিল। এক নিঃশেষ আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা মিস্ নোবল বিবেকানন্দ-দুহিতা নিবেদিতায় রূপান্তর লাভ করেছিল। বর্তমান অনুধ্যানে আমরা সেই রূপান্তরের বিচিত্র রহস্যটুকুই উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছি, অবারিত করতে চেয়েছি।

তাঁর দেহত্যাগের পর কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী অতীত হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সে-কাল মধ্যে, অবিভক্ত বঙ্গদেশ এবং অবিভক্ত পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সমগ্র দেশটিই যেন নানা দিক থেকে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

আজ সমস্যা-কণ্টকিত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের অমর-আত্মা সাম্য-মৈত্রীর শাশ্বত ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে প্রয়াসী। সে প্রয়াসের প্রারম্ভিক যুগে নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিচিত্র সংমিশ্রণে তাঁর অসামান্য জীবনটি সুগঠিত হয়েছিল।

নিবেদিতার চরিতানুধ্যান—সে সংগঠনেরই অকিঞ্চিৎকর এক ইতিহাস।

যাঁরা নিখুঁত, মাস-বর্ষ-হিসাবের জীবনেতিহাস অনুসন্ধান করবেন, তাঁরা এ গ্রন্থপাঠে হয়ত পরিতৃপ্ত হবেন না। তাঁদের জন্য আমাদের প্রযত্নও নয়। 'তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।'

কিন্তু যাঁরা, বাহ্য-ঘটনা নিচয়ের অন্তরালে—অদৃশ্য, অন্তর-জীবনের ক্রমবিকাশের নিগূঢ় ইতিহাসের অনুসন্ধান করবেন, জানতে চাইবেন নিবেদিতার জন্মান্তরের রহস্য, তারাই হয়ত এ গ্রন্থপাঠে কিছুটা পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। অন্তত, আমাদের তাই আশা এবং সে আশা পূর্ণ হলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। ইতি

'সারদাপুরী,'
মাখলা, হুগলী

বিনীত গ্রন্থকার।

অধ্যায়ানুক্রম

***
×
***

নিবেদিতা

সরস্বতীর শ্বেত-তনুশোভা,
অতি মনোলোভা—
তোমাতেই রূপ ধরেছিল,
হে অনন্যা, মহীয়সী
ভগ্নী নিবেদিতা!

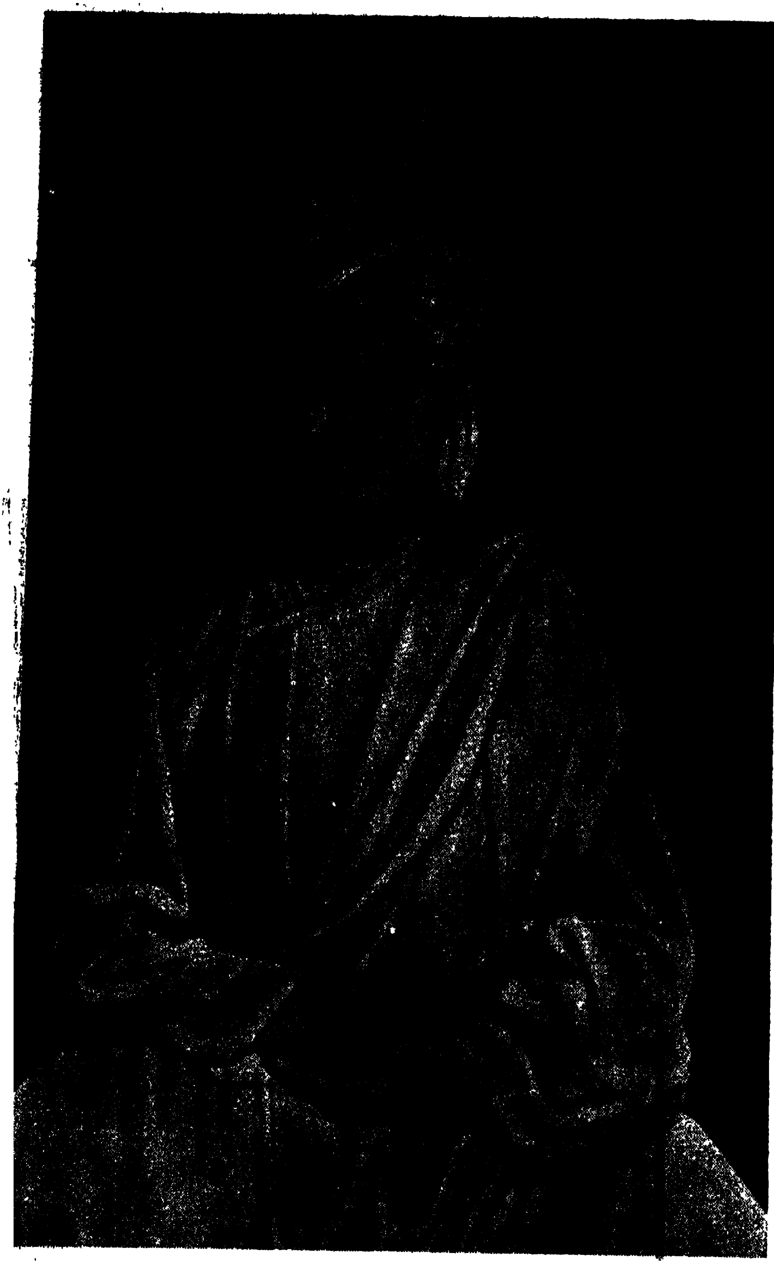
পরম সত্যের তরে যে তপস্যা তব,
অতি অভিনব—
আমরণ ছিল অব্যাহত,
তাহে তুমি শুচি শোভান্বিতা
সর্বত্র বন্দিতা, ভগ্নী নিবেদিতা!

তব নাম সর্বদেশে তুলনা বিহীন
অতি অমলিন,
তোমার মহতী-কীর্তি অম্লান অক্ষয়,
মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত দীপ্ত আভাময়
রবে চিরদিন।

ত্যাগের মহিমা তুমি, হে ভগিনী
সন্ধ্যা দীপশিখা,
তোমার উন্নত ভালে দিব্য ললাটিকা
স্বস্তিকের রেখা।

কবিগুরু 'সতী' নাম দিয়েছিল তোমা,
শিল্পাচার্য অতঃপর কহে 'মহাশ্বেতা'
দেবের বাঞ্ছিতা।

বিবেক-আনন্দ-সুতা, তুমি
দেবী নিবেদিতা,
নিত্যশুদ্ধ, সর্বত্র বন্দিতা
চির অনিন্দিতা,
ভগ্নী নিবেদিতা!



স্বামী বিবেকানন্দ

এক

ধ্যানসিদ্ধ আচার্য বিবেকানন্দের মানসকন্যা, ভারত-ভগিনী নিবেদিতার বিচিত্র-মধুর জীবন-কাহিনী নিয়ে আমাদের এই আখ্যায়িকা।

ঘটনাবহুল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এক বিপরীত পরিবেশে ও এক অপ্রত্যাশিত পটভূমিতে এ আখ্যায়িকার সূচনা, আর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অনেকটা আকস্মিক ভাবেই এর পরিসমাপ্তি। মধ্যবর্তীকালের স্তরবিন্যস্ত ক্রম-অভিব্যক্তির যে মাধুর্য ও মহিমা সেটি সুদুর্লভ। জগতের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তে কোন দেশের কোনকালের জীবনেতিহাসের সংগ্রহশালায় এমন বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ইতিপূর্বে বড় একটা দেখা যায়নি। নিঃশেষ আত্মোৎসর্গের এবং একান্ত আত্মবিলুপ্তির এমন নিদর্শনও অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। অসীম সমুদ্রের অন্তহীন বেলাভূমিতে যুগে যুগে—

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।'...

—রূপকথার বচনবিন্যাসে এমন কাহিনী আমরা শুনতে পেয়ে থাকি। ঐ পরশপাথরের স্পর্শ দিয়ে লৌহপিণ্ডকে সে স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করবে, হীনবস্তুকে মহৎ মর্যাদা দান করে পরিতৃপ্ত হবে—এই সে উন্মাদের আশা, এই তার স্বপ্নবিলাস। এ-জগতের কোন সম্পদ সে চায়নি, কোন বস্তু সে কামনা করেনি—

'রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর—
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়,
একবার পেতে চায় পরশপাথর।'—

মানবজীবনের বিস্তৃত বেলাভূমিতেও ঠিক এমনিভাবেই প্রেমোন্মাদ আচার্যকুল যুগে যুগে সজীব পরশ-পাথরের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে সন্ধান করেছেন, প্রতীক্ষা করেছেন। আর সে অপ্রাকৃত সন্ধানের অমৃতবার্তা নিয়েই কালে কালে গুরু-শিষ্য-সংবাদের এক একটি বিশিষ্ট অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে—মানুষের ধর্ম-ইতিহাসে, সমাজ-ইতিহাসে।...

ভারতের যে সুপ্রাচীন ইতিকথা তার অগণ্য সন্তান-সন্ততির জীবনধারাকে যুগ যুগ ধরে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, তার মধ্যে আবার এই গুরু-শিষ্য-সংবাদের বিশেষ উল্লেখ ও তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রত্যেকটি যুগে বা যুগ-সন্ধিক্ষণেই গুরুশক্তির অমেয় প্রভাব ভারতবর্ষ যেন একান্ত-বাঞ্ছিত দেবাশীর্বাদ রূপেই গ্রহণ করেছে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এ আশ্বাস-বাণীতেও সে অশেষ বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছে। সেইজন্য, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অতি-সংকটময় প্রারম্ভমুখে, 'বিষমে সমুপস্থিতে'—গাণ্ডীবধন্বা মহামতি অর্জুন বিষাদ-ক্লিষ্ট হয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন:

'হে অচ্যুত, হে পুরুষ-প্রধান—আত্মীয় ও স্বজন বিরোধের এই বিপরীত প্রমত্ততায় আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে, আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।...অতএব, তোমার কাছে আমার এই নিবেদন,—এই বিষম মুহূর্তে আমাকে পথনির্দেশ কর, কর্তব্য-নির্ণয়ে শুভবুদ্ধি দাও। আমাকে তোমার শিষ্যত্বে গ্রহণ কর।

'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'···

মোহগ্রস্ত অর্জুনের এই ছিল সেদিনের আর্ত প্রার্থনা, এবং সে প্রার্থনা পূরণ করেই 'সর্বদেবময়ো হরিঃ' অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা' উপদেশ করেছিলেন।

কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের সে অনবদ্য কাহিনী আজ শুধু হিন্দুর নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরন্তু সমগ্র মানবজাতির জীবনদর্শনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে স্বীকৃত। এর পঠন-পাঠনে অমর জীবন লাভ করা যায়।

'গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

* * *

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রবক্তা, মহাঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ অন্যতমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেই এক শাশ্বত জীবনকথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের পৃষ্ঠায় বিবৃত করেছিলেন—সর্বকালের জন্য, সর্বলোকের জন্য।···

বস্তুতঃ অবতার-প্রথিত পুরুষ যাঁরা, যাঁদের আবির্ভাবে যুগে যুগে মানব-সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে, যাঁদের তপস্যা থেকে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে,—তাঁদের সবারই জীবন গুরু-শিষ্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের দ্বৈত মহিমায় উদ্ভাসিত।

সেণ্ট পলের যে মহাজীবন, সেটির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই যীশু-খ্রীষ্টের ভাব-সৌধ নির্মিত।···

ভক্তি ও বিশ্বাসের সহস্রদল রক্তকমলের শীর্ষে শীর্ষে পদ স্থাপন ক'রে একদিন কর্ম-স্রোতস্বিনী অতিক্রম করেছিলেন সনন্দন, আচার্য শংকর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে। সেইজন্য সেদিন পদ্মপাদ নামে সম্বোধন ক'রে তাঁকে অশেষ সম্মান নিজে দান করেছিলেন শংকর।

আবার, এরও পরে, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাময় জীবনেও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গতা যেমনি শিক্ষাপ্রদ, তেমনি বিস্ময়কর ছিল।

এমনিভাবে, প্রায় প্রতিদেশেই যুগে যুগে যুগ্ম-জীবনের সুন্দর সার্থক আবির্ভাব ঘটেছে।

কত বিচিত্র মাধুর্যে, কত নিগূঢ় রহস্যে সে-সকল অপার্থিব গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ যে গ্রথিত—ভাষার অক্ষম লিপিবন্ধনে তার সম্যক প্রকাশ সম্ভব নয়। উত্তর যুগের সাধকগণ, রস-পিপাসু বাণী-উপাসকগণ সে বৈশিষ্ট্যের সুরটি, প্রেম-বন্ধনের সে অদৃশ্য স্বর্ণ-সূত্রটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। কত উন্নত সাহিত্য, কত প্রোজ্জ্বল জীবনাখ্যায়িকা তারই ফলে রচিত হয়েছে, কথিত হয়েছে।

আবার, আমাদের যুগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের দিকে যদি তাকাই, তবে সেখানেও দেখতে পাব শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ্মজীবন কি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় পরস্পরকে পরিপূর্ণ ক'রে যুগ-প্রত্যুষে উদয়-দিগন্তে প্রকাশিত হয়েছিল। সে নিষ্কলুষ ও অহেতুক প্রেমাকর্ষণের পূত মহিমা এ-যুগের মহাকাব্যকথার এক অনবদ্য উপকরণ। চন্দ্রের সঙ্গে সূর্যকিরণের মতো, সুরের সঙ্গে সংলাপের মতো তারা যেন অচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে গ্রথিত। একটিকে বাদ দিলে অপরটির যথার্থ প্রকাশ ব্যাহত হয়, প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। কি ঐতিহাসিক বিচারে, কি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে, সর্বভাবেই উভয়ে উভয়ের সম্পূরকরূপে প্রকাশিত। দীর্ঘ ছয় বৎসরে সে অপূর্ব গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং আরও কয়েক বৎসরে তার পূর্ণ পরিণতি সাধিত হয়েছিল। অথচ, সেখানেও প্রক্রিয়াটির শেষ হয়নি। কারণ, যুগ-ধর্মের ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে যে অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছিল—নিঃশেষ আত্মনিবেদনের সুকঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, সেটিও ঐ গুরুশিষ্য-সংবাদেরই আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও সে অনবদ্য সম্বন্ধ-কাহিনী আমাদের কাছে প্রায় অকথিত ছিল। আত্মবিস্মৃত জাতির বহু বিস্মৃতির অন্তরালে ভগিনী নিবেদিতার অসামান্য চরিতকথা, তাঁর অতুলনীয় ত্যাগ-ভক্তির কথা—'কাব্যে উপেক্ষিতার' মতোই যেন উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল। সেজন্য কবি মোহিতলাল একদা গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সব কিছুই স্মরণ করি, কীর্তন করি—তাঁদের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও স্মৃতিকথা রচনা ক'রে এই নিত্য-বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতি-ভ্রংশ নিবারণ করি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে স্বামীজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে যে একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রের মহিমা, তাকে তেমন ক'রে আর স্মরণ করি না। এমনকি, যে মন্দিরের নব-নির্মিত চত্বরের এক প্রান্তে তিনি তাঁর অন্তরের পূজাপ্রদীপ প্রজ্বলিত ক'রে নিজের সমগ্র দেহ-মন লুটিয়ে দুই করপুটে সেবার পুষ্পাঞ্জলি সাজিয়ে-ছিলেন—মনে হয়, সেখানেও তাঁর নামটি তেমন ক'রে কেউ স্মরণ করে না।'

আমাদের মনে হয়, এই সেদিন পর্যন্তও এ-অভিযোগ এবং আক্ষেপ বহুলাংশে সত্য ছিল, আমাদের পক্ষে এক নিদারুণ কলঙ্ক-স্বরূপ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সে দুর্দিনের অবসান সূচিত ক'রে আজ নিবেদিতার অনিন্দ্য জীবনকথা নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হতে শুরু করেছে।

এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব-রূপায়ণে নিবেদিতার যে অমূল্য অবদান ছিল, এদেশের নর-নারীকে মনে-প্রাণে ভালবেসে, এ জাতির ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ; এর নদ-নদী, বৃক্ষলতা, আকাশ-বাতাস, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এক কথায় সব কিছুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে,—তাদের শিক্ষার জন্য, সেবার জন্য, পরিচর্যার জন্য—নিজের সমগ্র জীবনখানি উৎসর্গ করবার যে অক্ষয় মন্ত্রে নিবেদিতা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—তার

সুনিপুণ বিশ্লেষণে সে-সব জীবনাখ্যায়িকা ক্রমশঃ সমৃদ্ধি ও সজীবতা অর্জন করতে চলেছে। বর্তমান অপরিসর গ্রন্থ প্রণয়নে আমাদের যে অক্ষম প্রয়াস, সেটিও সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত নব-প্রচেষ্টারই সূত্রানুসরণ মাত্র, মহৎজনের মহৎ প্রয়াসের ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা।

একদিকে তদানীন্তনকালের পরশাসিত, দুঃখিনী ভারত-ভূমির সন্তান এক ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী, আর অন্যদিকে স্বাধীন দেশের প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় জাত ও বর্ধিত এক তেজস্বিনী নারী। উভয়েরই জীবন-বৃত্তান্ত অসামান্য, উভয়েরই চরিতকথা অসাধারণ। কিন্তু তাঁদের পূত, আধ্যাত্মিক সম্মেলনে যে জীবনাখ্যায়িকার উদ্ভব, তার অসামান্যতা অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মধুর, অনন্য মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। গুরুশিষ্য-সংবাদের বহু-বিচিত্র ইতিহাসেও তেমন অনবদ্য কাহিনী সহজলভ্য নয়।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা আমরা বলছি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর সে দিনটি। মহানগরী লণ্ডনের এক বাসগৃহের প্রশস্ত একটি কক্ষতলে, শীতজর্জর এক অপরাহ্ণ-বেলায়—এই দুই যুগ-জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

কবির কথায়,—

সেদিন সে দিবসের শেষে
শীতের প্রদেশে,—
সন্ধ্যারবি অস্তে গেলা চলি,
ফেলি স্বর্ণ সহস্র-কিরণ
সদ্য চারিভিতে।

আর সেই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যেই নিবেদিতা সবিস্ময়ে—

দেখিল আচার্যে তাঁর প্রথম চকিতে।

বসেছেন পদ্মাসনে অপূর্ব মূরতি,
সমাহিত চিতে।
ধ্যান-শান্ত নেত্র হতে ঝরিছে করুণা,
বিচিত্র ব্যঞ্জনা।
কণ্ঠ হতে উঠিতেছে—শিব, শিব ধ্বনি
মর্তভূমে অমৃতের বাণী —দিব্য উন্মাদনা।

সে এক অভাবিত, স্বর্গীয় দৃশ্য। গৈরিক-মণ্ডিত দেহে ঈষদুন্নত একটি বেদীতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী। অর্ধ-নিমীলিত বিশাল চক্ষে করুণা ও বৈরাগ্যের এক অলৌকিক তন্ময়তা। কণ্ঠ থেকে ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত হচ্ছে এক রহস্যময় ধ্বনি—দূরাগত শব্দের মতো,—শিব, শিব। সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে সমাসীন জিজ্ঞাসু এবং পিপাসু এক বিদ্বন্মণ্ডলী। মার্গারেটের সেই প্রথম গুরু সন্দর্শন ঃ

'The time was a cold Sunday afternoon in November, and the place, it is true, a West-End drawing room. But he was seated facing a half-circle of listeners, with the fire on the hearth behind him, and as he answered, question after question, breaking now and then into the chanting of some Sanskrit text in illustration of his reply,···he sat amongst us, in his crimson robe and girdle, as one bringing us news from a land, with a curious habit

of saying now and again—Shiva! Shiva!'—এই ছিল নিবেদিতার সেদিনের অভিজ্ঞতার নিজস্ব নিখুঁত বর্ণনা।...

সে সাক্ষাতের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ছয় বৎসর-ব্যাপী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি কাল ছিল। সেটি দুই সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। সন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার প্রথম পাদ, আর ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় পাদরূপে চিহ্নিত হতে পারে। আবার, এরও উত্তর পর্যায়ে, প্রায় নয় বৎসরের যে দীর্ঘ সময়, অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, যেদিন অকস্মাৎ স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেছিলেন,—সেদিন থেকে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর—যেদিন নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়েছিল, সেদিন পর্যন্ত যে কাল, সেটি যেন প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের পূর্ণ পরিণতির শুভ যুগ।

নবোদগত একটি দৃঢ়মূল কিশলয়ের মহা-মহীরুহে পরিণতি-লাভের মহাবিস্ময়কর সেই কাল। এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল, যাঁর শিরা-উপশিরায় উষ্ণ কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত ছিল, ইংল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের যুক্ত-সংস্কৃতিতে যাঁর শিক্ষা ও মানসজীবন গঠিত ছিল—সেই তীক্ষ্ণধী বিদেশিনী নারীর জন্মান্তর-লাভের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং তাৎপর্য এরই মধ্যে নিহিত। সে যাই হোক, সেদিন সেই অপ্রত্যাশিত শুভ-লগ্নটিতে, সেই দৈবচিহ্নিত বিশেষ ক্ষণটিতে ভাবী আচার্যের দর্শনমাত্র মার্গারেটের অবচেতন মনের সর্বস্তর যেন সহসা আলোড়িত হয়েছিল। নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী যেন সচকিত হয়ে উঠেছিল। প্রভাত-সূর্যের কিরণ-ছোঁয়ায় সমগ্র পদ্মবন যেমন বহু বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই সেদিন মার্গারেটের হৃদ্‌পদ্ম যেন,

অকস্মাৎ ফুটিল চকিতে—
প্রদীপ্ত জ্যোতিতে।
আর তারি সঙ্গে সঙ্গে—
মধুময় হল ধরাতল;

অন্তর ভরিয়া গেল
আশার জ্যোতিতে, স্বর্গীয় ভঙ্গীতে।

শ্রীমা বলতেন,—

'যে যাব, সে তার
যুগে যুগে অবতার।'

এ যেন তারই এক সার্থক রূপায়ণ হল বাস্তবের ভূমিতে।

সে ঘটনাব দীর্ঘ দশ বৎসব পরে অতীতেব মধু-স্মৃতি রোমন্থন করে সেই প্রথম দর্শনেব বিস্ময়-বিমুগ্ধ অনুভূতিব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্গারেট বলেছিলেন –

'অন্তবেব মণিকোঠায় তিনটি মহামূল্য রত্নগুটিকা সেই প্রথম সাক্ষাতেব অবিস্মরণীয় দিনটিতেই আমি আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। একথাটি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলাম যে এই ভাবতীয় যোগীপুরুষেব ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মতবাদ যেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি উদাব। তাঁব মৌলিকতা এবং প্রাণশক্তি অপবিমেয়। সর্বোপরি, মানুষের অন্তর্নিহিত যে দেবত্ব, তার চেতন-উৎসে তদীয় সুকৌশল অঙ্গুলি-সংস্থাপনও যেন এক মহাবিস্ময়কব প্রক্রিয়া, এক অকল্পিত অভিজ্ঞতা।

···'his call was always sounded in the name of that which was strongest and finest in man,···Man proceeds from truth to truth, and not from error to truth.'

আবার, উত্তরজীবনে—অর্থাৎ, স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানেরও কয়েক বৎসর অন্তে, ঐ প্রথম দর্শনেরই স্মৃতিকথায় জনৈকা বান্ধবীর কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন নিবেদিতা—

'কল্পনা কর, স্বামীজী যদি সে সময় লণ্ডনে না আসতেন, তবে আমার কি হত? মনে হয়, আমার সমগ্র জীবনটিই ব্যর্থ

হয়ে যেত। আমার মনে তখন এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে আমার জীবনে একটি আহ্বান আসবে, নির্দেশ আসবে। সে-কথা নানাপ্রসঙ্গে আমি প্রকাশও করেছি।

যদি নিজ জীবন সম্বন্ধে কোন নিবিড় নিঃসংশয় পরিচয় আমার থাকত, তবে হয়ত সন্দেহ জাগত, দ্বিধা হত যে পরম-লগ্নটি যখন উপস্থিত হবে—তখন তাকে ধরতে পারব কিনা, চিনতে পারব কিনা। সৌভাগ্যক্রমে, সে-পরিচয় আমার ছিল না। তাই, সংশয়ের বেদনা থেকেও আমি নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম।

আজ কতদিনের ব্যবধানে এই গ্রন্থখানির [নিবেদিতার অন্যতম রচনা—*The Web of Indian Life*] দিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে—যদি স্বামীজী না আসতেন! তবে কি হত! সে এক বিচিত্র আকুতি, এক তীব্র আত্ম-বিকাশের আকাঙ্ক্ষা, তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। করা সম্ভবই নয়।'

বৈষ্ণব কবির গানে আছে—

যদি গৌর না হত, কেমন হইত ?
কেমনে ধরিতাম দেহ ?

ঠিক অনুরূপ ধরনের এক মনোভাব। যা হয়নি, কিন্তু হতে পারত ; যা ঘটেনি, অথচ ঘটতে পারত ; এমনি একটি বিগত-অতীতের করুণ অভিব্যক্তি !

'সেদিন কত দীর্ঘ সময়, কলম হাতে নিয়ে আমি বসে থাকতাম,—কিছু লিখব বলে, কিছু বলব বলে। কিন্তু কথা আসত না, ভাষা জুটত না, প্রকাশ-ক্ষমতা সক্রিয় হত না। আর আজ ? মনে হয় কথার যেন অন্ত নেই, অবধি নেই। আজ এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে এ জগতে কিছু কাজ করবার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি এবং সে-কাজের প্রয়োজনও রয়েছে প্রচুর।'……

আমরা যখনকার কথা বলছি—মার্গারেটের বয়স তখন আটাশ-বৎসর। স্বামীজীর তেত্রিশ।

দেহ ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী তখন মার্গারেট। বহু বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে জীবনের জিজ্ঞাসা এবং অভিজ্ঞতা। তীক্ষ্ণ সংঘাত এসেছে তাঁর নিজ জাতির জীবন-ক্ষেত্রে, মর্মান্তিক প্রশ্ন উঠেছে নিজ জীবনের আদর্শ নিয়ে, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

তাদের আশু সমাধান চাই, নিরসন চাই। এমন একটি মানুষের সক্ষম স্পর্শ চাই, যার জীবনে তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়েছে। যার কথা ও কাজ, অনুমান এবং প্রত্যক্ষানুভূতিতে শোভন সামঞ্জস্য লাভ করেছে। সে যা দেখেছে শুধু তাই বলতে অভ্যস্ত। 'যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ'—এই উক্তির মূর্ত প্রকাশ হয়ে উঠেছে তার জীবন।···

সুতরাং, গুরু-সন্দর্শনের সেই প্রথম দিনটি, সেই পরম মুহূর্তটি মার্গারেটের পিপাসু মনের অলিখিত ইতিহাসে যে অক্ষয় অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

আরও একটি রহস্য আছে। একদা তদীয় আচার্যদেবের জীবনেও অনুরূপ একটি বিচিত্র মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছিল, বহুলাংশে একই তাৎপর্য নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ তাঁদের উভয়ের জীবনেতিহাসে সবিস্তার উল্লিখিত আছে। সেখানেও এক অপ্রত্যাশিত দৈব সংযোগে কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে এক ভক্তগৃহে, দিবাবসানের প্রাক্কালটিতেই গুরুশিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানেও দুই বহ্নিগর্ভ মহাবৃক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। দান ও গ্রহণের, জিজ্ঞাসা ও মীমাংসার সংঘাত সেদিনও এসেছিল শত বিচিত্র পথে, শত বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। কালের ব্যাপ্তিও ছিল প্রায় অনুরূপ এবং চরমে গুরুর অপার্থিব প্রেম-প্রভাবে

নিঃশেষ আত্মবলিদানের যে অনন্ত মহিমা তাও ছিল বহুলাংশে সমতুল।

তাই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংবাদ আর বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-সংবাদ একই গুরু-শিষ্য সংবাদের দুটি পরিপূরক অধ্যায় মাত্র। একই অদৃশ্য সম্বন্ধ-সূত্রে উভয়ে গ্রথিত, একই অমৃতরসে উভয়ে অভিষিক্ত।

সেই হেতু, উত্তরকালে মার্গারেট যখন 'নিবেদিতা'রূপে নবজন্ম লাভ করে ধন্য হয়েছেন, যখন ভারতবর্ষই তাঁর মাতৃভূমিতে পরিণত হয়েছে তখন তাঁর মনে হত যে পূর্বজন্মে ভারতবর্ষেরই কন্যা ছিলেন তিনি। এবারে নবযুগের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সহজ প্রচারের জন্যই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তাঁর জন্ম হয়েছে। নতুবা, ভারতবর্ষই তাঁর প্রকৃত মাতৃভূমি, ইওরোপ তাঁর ধাত্রীদেবতা মাত্র।

উত্তরকালে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিজমুখেই তা-ই একদিন নিবেদন করেছিলেন নিবেদিতা।—

বলেছিলেন,—'মা, আমি এদেশেরই মেয়ে, আমার পূর্বজন্ম এদেশেই হয়েছিল। তবে, এবার পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুরের ভাব-প্রচার সহজ হবে বলেই ওদেশে আমার জন্ম হয়েছে হয়ত।' কিন্তু যাক্ সে কথা।···

* * *

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম গুরু-সন্দর্শনের কথা আমরা বলছিলাম। ঠিক তার আটাশ বৎসর পূর্বে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসের ২৮শে তারিখ নিবেদিতার জন্ম হয়েছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের যে-ক্ষুদ্র শহরটিতে তার জন্ম, ভৌগোলিক কিংবা ঐতিহাসিক কোন বিচারেই সে শহর বিখ্যাত ছিল না। কিন্তু যে নোবল-পরিবারে তার জন্ম, আয়র্ল্যাণ্ডের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে তার নামের উল্লেখ ছিল, মর্যাদা ছিল। একটি বৈপ্লবিক চিন্তা এবং কর্মধারা যেন সে বংশের রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল।

মাতামহীর নামানুসারে তার শৈশবে নামকরণ হয়েছিল—মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। নোবলই পিতামাতার প্রথম সন্তান। মায়ের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তার জন্ম হয়। পিতা এবং পিতামহ, উভয়েই স্বধর্মে আস্থাবান ছিলেন। প্রোটেস্ট্যান্ট শ্রেণীর ধর্মযাজকের কাজ বৃত্তিরূপেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ, গভীর দেশপ্রেমেও তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা-আন্দোলনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপেও তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয় প্রকারে।

ফলে, একটি অকপট দেশাত্মবোধ এবং সহজাত ধর্ম-বিশ্বাসের দুর্লভ সংমিশ্রণেই নোবলের জীবন-দর্শনের বুনিয়াদ গ্রথিত হয়েছিল। তাছাড়া, আরও একটি দৈবঘটনা এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল।

কথিত আছে, নোবলের জননী, মেরী হ্যামিলটন, প্রথম যৌবনে একদিকে যেমন একটি বংশ-গৌরব-সন্তান কামনায় উন্মুখ হয়েছিলেন, তেমনি বয়সের অল্পতাহেতু—সন্তান সম্ভাবনায় শঙ্কিতও হয়েছিলেন।

এবং মর্য ভীতি, আশা এবং শঙ্কা—এই দুই বিপরীত ভাবের সে এক মিশ্রিত, জটিল মনোভাবের প্রেরণায় ভগবানের কাছে সংগোপনে তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলে ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরেরই সেবাকার্যে তিনি তাকে সমর্পণ করবেন, এককালে উৎসর্গ করে দেবেন।

জননীর সে প্রাক্-জন্মকালীন ঐকান্তিক নিবেদন মার্গারেটের জীবনে কত শোভন-সৌন্দর্যে, কত সর্বতোভদ্র মাধুর্য ও মহিমায় সার্থক হয়েছিল, কত বিচিত্র পথে এবং সুকঠিন সাধনায় তাকে ভারতবর্ষের নব-চেতনার বেদীমূলে উৎসর্গ করে দিয়েছিল, তার যথাযথ অনুশীলনই নিবেদিতার অসামান্য চরিতকথার যথার্থ মূল্যায়ন।

মার্গারেটের শৈশবজীবন অতি-সচ্ছলতায় না হলেও, স্নেহ-যত্নের স্নিগ্ধতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। বৃদ্ধা মাতামহীর গভীর স্নেহ-ভালবাসা তার শৈশবজীবনের এক অমূল্য সম্পদ ছিল। কিন্তু,

মার্গারেটের মাত্র সাত বৎসর বয়সে সেই স্নেহময়ী মাতামহীর মৃত্যু ঘটে। শোনা যায়, কিশোরী বালিকার জীবনে সে মৃত্যু একটি মর্মান্তিক আঘাত-স্বরূপ হয়েছিল এবং এও শোনা যায় যে জীবনের সুদীর্ঘকাল সে আঘাতের স্মৃতি মার্গারেটের অন্তরে জাগরূক ছিল।

মাতামহীর মৃত্যুর পর পিতার সঙ্গ ও সাহচর্যই মার্গারেট সমধিক লাভ করে। তারই ফলে অন্তরে প্রগাঢ় এক ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং তাঁরই শিক্ষায় নিবিড় দেশপ্রেমেও সে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।...

মাত্র নয়-দশ বৎসর বয়ঃকালেই পিতার অনুবর্তিনী হয়ে মার্গারেটকে নিয়মিত ভাবে গীর্জায় যেতে দেখা যেত। গীর্জায় গমনকালে সে কিশোরী বালিকার মুখে ও পাদবিক্ষেপে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফুটে উঠত। পিতার পাশে সমান তালে সে হেঁটে চলেছে। চোখের তারায় এক রহস্যময় স্বপ্ন-লোকের সন্ধান বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মুখ-মণ্ডলে শৈশব-সারল্যের পূত কমনীয়তা। এ দৃশ্য মার্গারেটের কৈশোর জীবনের অনেকগুলি দিনের সঙ্গে যেন জড়িত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মার্গারেটের পিতাও দীর্ঘায়ু ছিলেন না। মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য মার্গারেটের আরও দুইটি বোন এবং একটি ভাই জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং, পিতার মৃত্যুতে--মার্গারেট নোবল আর তার সদ্যোবিধবা জননী, মেরী হ্যামিলটন, তিনটি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকার হাত ধরে দুর্গম সংসার-পথে অনিশ্চিত যাত্রায় বের হয়েছিল। মার্গারেটের জীবনে জীবন-সংগ্রামের সেই সূত্রপাত। জীবন-জিজ্ঞাসারও সেই প্রকৃত সূচনা। অর্থ-কৃচ্ছ্রতার সঙ্কটময় কালেরও সেই আরম্ভ বলা যেতে পারে।...

মার্গারেট তখন কিশোরী বালিকা, সুতরাং তার শিক্ষাজীবনের কথাও প্রসঙ্গতঃ এখানেই উল্লেখ করতে হয়।

হ্যালিফেক্সের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী মার্গারেট। মেধাবী ও উৎসাহী ছাত্রীরূপে মার্গারেটের বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর ছিল সে বিদ্যায়তনে। প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য নানাকর্মে, নানাচিন্তা ও সাধনার খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে মার্গারেটের জীবন-মন্দাকিনীকে পরিপূর্ণ করেছিল উত্তরকালে, তারই বহুল প্রকাশ তদীয় বিদ্যার্থী-জীবনকেও বিবিধ প্রয়াসে সক্রিয় করে রেখেছিল। তাছাড়া, পরিবারের অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং স্বদেশের বিবিধ সমস্যা সে-বয়সেই তার মধ্যে যেন একটি মৌন স্বাতন্ত্র্য জাগ্রত করেছিল।

তখন হ্যালিফেক্স বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মিস্ ল্যারেট। নিপুণ শিক্ষিকা হিসাবে মিস্ ল্যারেটের বিশেষ সুনাম ছিল। আর খ্যাতি ছিল একটি উচ্চ নীতিবোধের জন্য, ছাত্রীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং শুভ-ইচ্ছার জন্য। মার্গারেটের শিক্ষা-জীবনে এই মনস্বিনী নারীর চরিত্র ও নিষ্ঠা তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিজ জন্মগত এবং বংশগত ধর্মানুরাগ এঁরই সাহচর্যে প্রভূত পরিমাণে প্রবুদ্ধ হয়েছিল। এঁরই দৃষ্টান্তে একটি প্রখর মর্যাদাবোধ এবং নীতিজ্ঞানও মার্গারেটের চরিত্রে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।

ফলে, বিদ্যালয়ের নিয়মানুগ কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মার্গারেট ক্রমশঃ নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিল। সে দৃষ্টি-ভঙ্গির স্বকীয়তা যেমন সুস্পষ্ট ছিল তার পশ্চাতের যুক্তি-বিন্যাসও তেমনি সুদৃঢ় ছিল। তবে, পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে কতকটা অপরিণত কালেই মার্গারেটের শিক্ষাজীবন শেষ হয়েছিল। কারণ, পারিবারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা তখন গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হ্যালিফেক্সের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রথমে কেস্ উইকের একটি বিদ্যালয়ে এবং পরে রাগ্‌বির সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেছিলেন।

দুঃখিনী বিধবা জননী আর ছোট ভাই-বোন দু'টির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহুলাংশে তখন তাঁরই স্কন্ধে পড়েছে। কাজেই, জীবনের গতি তখন আর সহজ নয়, আরামপ্রদ তো নয়ই।...

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের সে কাল। সে কথা পূর্বেই বলেছি। ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রোবেল, পেস্তালোৎসির প্রভাব তখন ক্রমবর্ধমান। শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে মানবশিশুর আবির্ভাব এবং প্রাধান্য তখন সূচিত হচ্ছে, স্বীকৃত হচ্ছে। পুঁথি নয়, পাঠক্রম নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা নয়—শিক্ষার মর্মবিন্দুতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবে শুধু একটি দেবতা—সে শিশুদেবতা, নরদেবতা।...তার চতুর্দিকে বিস্তৃত যে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতি, সেও, ঈশাবাস্যম্।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তখন চিন্তার মোড় ঘুরছে। 'Greatest good for the greatest number'—এই তখন রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে চাইছে। যুগ যুগ ধরে যারা বঞ্চিত হয়েছে, উপেক্ষিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে; রাজনীতির পরিভাষায় 'হ্যাভ্‌নট্‌স' বলে যারা আখ্যাত—তখন তাদের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে। কম্যুনিজম্, নিহিলিজম্ প্রভৃতি নানা সাম্যবাদের বিক্ষুব্ধ ঝটিকা তখন আসন্ন এক বিস্ফোরণের মুখে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই একই কালান্তরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

'শোন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'...

গুরু নয়, পুরোহিত নয়, শাস্ত্র নয়, আপ্তবাক্যও নয়—মানুষ, মানুষ। অমৃতের পুত্র, অমৃতময় যে মানুষ, ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে তারই প্রথম অধিকার। তারই জন্যে মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার আয়োজন।

তারই জীবন-জিজ্ঞাসার যথাযথ সমাধানকল্পে শাস্ত্রের প্রয়োজন, ধর্মসাধনা এবং ধর্মোৎকর্ষের সার্থকতা।

'Ye, children of immortal bliss, Ye sinners! It is a sin to call a man so.'—এই ছিল সেদিনের ধর্মজগতের পুরাতন বাণীর নবতম ঘোষণা।···

এরই মধ্যে তরুণী মার্গারেট এক স্বপ্ন-জড়িত দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষাব্রতীরূপে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করেছিল। বায়ু ছিল অনুকূল, ক্ষেত্রও ছিল অতি উর্বর। ফলে, ফ্রোবেল এবং পেস্তালোৎসির চিন্তাধারা অতি প্রবলভাবে মার্গারেটকে আকর্ষণ করেছিল। অফুরন্ত আশা এবং আগ্রহ নিয়ে শিশু-মনোরাজ্যের অনাবিষ্কৃত ভূমিতে যাত্রা শুরু করছিল মার্গারেট। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অপরের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করবার নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে—উইম্বলডনে, 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাকে স্থাপন করতে হয়েছিল। উত্তরজীবনে, অব্ধিপারের এক দূর অপরিচিত দেশে, প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষাপ্রসারের যে মহাব্রত তাকে গ্রহণ করতে হবে এবং যার সার্থক উদ্‌যাপন-কল্পে নিজের সমগ্র জীবনখানি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করবার মহা-নির্দেশ তখনও অদৃশ্য নিয়তির হস্তে তার জন্য অপেক্ষমাণ—উইম্বলডনের 'রাস্কিন স্কুল' যেন তারই এক প্রস্তুতি-পর্বের মত। কারণ, এ বিদ্যালয়-স্থাপনের অল্পকাল পরেই লণ্ডন মহা-নগরীতে উপস্থিত হয়েছিল মার্গারেট—স্থায়িভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং দৈব নির্দেশে সেখানেই ধীরে ধীরে তার বিচিত্র নবজন্মের সূত্রপাত ঘটে।

এই লণ্ডনবাসের অল্পদিন মধ্যেই তত্রত্য বিদগ্ধসমাজের বহু ব্যক্তির সঙ্গে তার সংযোগ হয়েছিল। একালেই লেডি রিপনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, পরিচয় হয় নির্বাসিত রুশ-বিপ্লবী পিটার ক্রোপোট্‌কিনের সঙ্গে। আবার একালেই, পরিচয়

ঘটে লেডি ইসাবেল মার্গসনের সঙ্গে, ফ্রোবেল-শিষ্যা মিসেস ডি-লীউর সঙ্গে।

মার্গারেটের মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে নানা প্রবন্ধ এবং রচনাও এ কালেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আবার এ সকল ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে একসময় মার্গারেটের এক বিবাহ-প্রস্তাবও কতকটা অগ্রসর হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু পাত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে অতি অপরিণত অবস্থাতেই সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, এবং অপর কোনও বিবাহ-প্রস্তাব আর কখনও উত্থিত হয়নি।

তাই মার্গারেট চির-কুমারী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মানস-কন্যা ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা। সে যাই হোক--

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝিকালে, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দেব প্রথম দর্শন লাভের অব্যবহিত পূর্বে, মার্গারেটের জীবনে শিক্ষা, ধর্ম এবং দেশপ্রেম যেন ত্রিধারায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর তাদেব ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অসংখ্য জটিল প্রশ্ন ও সমস্যা যেন সহস্রফণা বিস্তার করেছিল। সম্মুখের পথরেখা হয়ে উঠেছিল বঙ্কিম। জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে তাও যেন দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। জীবনের অপরিসর ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তব, ইহকাল এবং পরকাল--যদি পরকাল বলে সত্যি কিছু থাকে, শোভন-সামঞ্জস্যে কি সার্থক হবে? যদি হয়, তবে তার উপায় কি? পন্থা কোথায়?--এই ছিল সমস্যা।

শিক্ষকতায় অন্তরের পিপাসা মেটে না, ধর্ম-কথা অগভীর এবং অবাস্তব মনে হয়। কোনটির পশ্চাতেই যেন শাশ্বত জীবনের কোন আশ্বাস নেই, প্রেরণা নেই অমৃতত্ব-লাভের। দেশের স্বাধীনতা অবশ্য চাই, সেটি নিঃসন্দেহে এক কাম্য-সামগ্রী, কিন্তু নিজ জীবনের দূর-বিসর্পিত যে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে চায়, যে বিশেষ সংস্কার অভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষায় মাথা খুঁড়ে মরে, তাদের সফলতা আসবে

কোন্ পথ দিয়ে? —এই সব দুরূহ জিজ্ঞাসার নাগরদোলায় মার্গারেটের চিত্ত তখন নিরতিশয় আন্দোলিত, এবং তাদের আশু-নিরসনের জন্য উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতাও কম দুর্বার নয়। মনোজগতের সেই সঙ্কট মুহূর্তের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, -যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।…

শ্রীশ্রীমা অনেক সময় বলতেন,—মানুষের জীবনে কখনো কখনো সুদুর্লভ এক একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত দৈবানুগ্রহে উপস্থিত হয়ে থাকে, তখন--

'যা না-হয় ধনে জনে,
তাই হয় ক্ষণের গুণে।'

মার্গারেটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে, সেই একান্ত শুভ মুহূর্তটিতে এক অপ্রত্যাশিত নবজন্মের সূচনা হয়েছিল তার জীবনে।

* * *

পুরাকালে ভারতের মাটিতে কিশোর বিদ্যার্থীদল দীক্ষা ও শিক্ষা লাভের বিনম্র আকূতি নিয়ে গুরুগৃহে গমন করত।—গমন করত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, সমিধ্‌পাণি হয়ে। অন্তরে প্রার্থনা থাকত,—'হে গুরু, আমাদের মন্ত্র দাও, শিক্ষা দাও নবজন্ম দান কর। দ্বিজত্ব-লাভে আমরা ধন্য হব, সার্থক হব। তার পথ নির্দেশ করে দাও।'

সে-কালে এই ছিল শিক্ষারম্ভ, এই ছিল উপনয়ন।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং মার্গারেট নোবেলের প্রথম সাক্ষাতের মহেন্দ্র-লগ্নটিও অনুরূপ একটি উপনয়নের কাল ছিল। মার্গারেটের অন্তরের অনুচ্চারিত প্রার্থনাও ছিল একই ধরণের —

'আমাকে দীক্ষা দাও। হে আচার্য, আমার সংশয় দূর করে আমাকে নবজন্ম দান কর।'

তবে, দেশ ও কালের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রার্থনার সঙ্গে দ্বিধা-সন্দেহও যথেষ্ট জড়িত ছিল এবং সংশয়ও কম ছিল না। তাছাড়া, সেদিনের স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর উক্তিসমূহই কি মার্গারেটের কাছে খুব সহজবোধ্য কিংবা সুস্পষ্ট ছিল? না, তাও ছিল না। উত্তরজীবনে, এই প্রথম সাক্ষাতের সংশয়-সঙ্কোচের কথায়ই নিবেদিতা লিখেছিলেন,—

'যে সুরতরঙ্গ যত গভীর, তার প্রভাবও মানুষের অন্তররাজ্যে তত ধীরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। সেজন্য, যথাযথ কালের অবকাশ চাই, প্রচুর উৎকর্ষ চাই। মদীয় আচার্যদেবের মুখ থেকে যে-সকল বাণী বিচিত্র ধ্বনি-মাধুর্যে নিঃসৃত হয়েছিল সেই আমার প্রথম দর্শনের দিনটিতে—সেগুলি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আজ দীর্ঘ-কালান্তরে সেদিনের কথা যখন চিন্তা করি, তখন স্বতঃই মনে হয়— স্বামীজীর উক্তিসমূহের নিহিতার্থ সেদিন আমি ধরতে পারিনি, উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি।' উদাহরণ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

'সেদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী যখন বলেছিলেন, The Universe is like a cobweb and minds are spiders; for mind is one as well as many—তখন সে উক্তির তাৎপর্য আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল, আমার উপলব্ধি-ক্ষমতার বাইরের বস্তু ছিল।

'তাছাড়া, সেদিন, আর শুধু সেদিনই বা কেন, পরবর্তীকালে অনেকদিন পর্যন্ত, - আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু মিশ্রিত ছিল যার জন্য তাঁর কথার যথাযথ মূল্যায়ন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি সাগ্রহে শ্রবণ করেছি, লিখতে চেয়েছি, কিন্তু অন্তরের মণি-কোঠায় বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি।'

'I noted what he said, was interested in it, but could not pass any judgment upon it, much less accept it.

And this statement describes more or less accurately the whole of my relation to his system of teaching even in the following year, when I had listened to a season's lecture ; even perhaps, on the day when I landed in India.'···

প্রথম দর্শনের এই ছিল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। একদিকে দ্বিধা ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব, অপরদিকে এক বিচিত্র অনুভূতির নব-উন্মাদনা। একদিকে অস্পষ্ট রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তা আর অপরদিকে উদয়শিখরে আলোকশিশুর প্রথম আবির্ভাবের মত এক উদার মহা-আবির্ভাব। দুইটির মিশ্রণে মার্গারেটের জীবনযাত্রায় এক বিরাট বিপ্লবের অপ্রত্যাশিত সূচনা।

জীবনদেবতার সে যেন এক অলঙ্ঘ্য নির্দেশ,—এক অনিবার্য আহ্বান,—বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ হয়েছে। মহা-সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। নূতন দেশে চল, নূতন অভিযানে ব্রতী হও।···

চরৈবেতি, চরৈবেতি,
চরৈবেতি।···

চলাই হল অমৃতত্ব লাভ, চলাই তার স্বাদু অমৃতফল। সূর্য চলেছে, নিজ কক্ষপথে নিরবধি কাল ধরে চলেছে, কখনো থামেনি, কখনো বিশ্রাম করেনি। তাই তো এত আলো, এত ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ!···

অতএব, তুমিও চল, এগিয়ে চল।···

এ দর্শনের পর কয়েকটি মাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি আছে।

সে বিরতির পর স্বামীজীর সঙ্গে মার্গারেটের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

তার ফল পরে বলব।...কিন্তু এ বৎসরেরই শেষভাগে, রোমের পথে, প্রথমবারের পাশ্চাত্যদেশ-পরিক্রমা সমাপ্ত করে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন।...এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের এক পরিচ্ছন্ন, শীত-স্নিগ্ধ প্রত্যূষে কলম্বো বন্দরে তিনি পদার্পণ করেছিলেন। আর তারও ঠিক এক বৎসর পরে 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'—আত্ম-নিবেদন করবার সংকল্প নিয়ে, স্বামীজীর জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে যার বন্দনা তাঁর মুখে নিত্য উচ্ছ্বসিত ছিল, সেই ভারতমাতার সেবাকল্পে নিজেকে নিবেদন করবার দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করে মার্গারেটও এসেছিল ভারতবর্ষে। সেও গুরুরই নির্দেশে।

একদিন জনৈক অনুরাগী পাশ্চাত্য শিষ্যা স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।...অপ্রত্যাশিত না হলেও প্রশ্নটির মধ্যে যে ভক্তি ও প্রেমের নিবিড়তা ছিল সেটিই প্রসন্ন করেছিল স্বামীজীকে।—

'How best can we serve you, Swamiji ?'—এই ছিল জিজ্ঞাসা। আর উত্তরও ছিল, অন্য কিছু নয়। 'শুধু ভারতবর্ষকে তোমরা ভালবাস, তাকে সেবা কর—Love India, serve India. তবেই আমার সেবা হবে, আমি সম্যক্ পরিতৃপ্ত হব।'

মহাপ্রাণ ভাবী গুরুর সে আহ্বানই ঘরছাড়া করেছিল মার্গারেটকে। সে অন্তর-কামনাই ধ্যানে ও কর্মে, তপস্যায় ও উৎকর্ষে সার্থকতালাভের পথ খুঁজেছিল, এবং তার চিহ্ন-অনুসরণেই মার্গারেটের ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু, ভারতের মাটিতে তার প্রথম পদক্ষেপ। যেমন,—

'নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত-হস্তে আকাশে আকাশে—
ক্লান্তি নাহি জানে।'···

তেমনি এক নিঃশব্দ, গম্ভীর এবং অক্লান্ত জীবনযাত্রার সেই ছিল সূত্রপাত। কিন্তু সে-কথাও এখন থাক।···

দুই

সন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লণ্ডনে পদার্পণ করেছিলেন—একথা পূর্ব পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। এবার লণ্ডনে তিনি তাঁর এক বিশেষ অনুরাগী বন্ধু মিঃ ই. টি. স্টার্ডির গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন।

মার্গারেটের স্মৃতিকথায় আছে—

'The Swami returned to London in April of the following year, and taught continuously at the house where he was living with his good friend—E. T. Sturdy in S. Georges Road and again, after the Summer holidays, in a large class-room near Victoria Street.'

অবশ্য, এবারের স্থিতিও প্রথমবারেরই মত অল্পকালস্থায়ী ছিল, —সবসুদ্ধ তিন-চার মাস এ-যাত্রায় তিনি ইংলণ্ডে বাস করেছিলেন। কিন্তু সে অপরিসর কালটি মার্গারেটের ব্যক্তিগত জীবনে অল্প তাৎপর্যের সময় ছিল না। অপ্রত্যাশিত প্রথম দর্শনের কালে স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে ও মতবাদে মার্গারেটের অন্তরে যে বিপুল ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছিল, তার পূর্ণতর বিকাশের জন্যই দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। মার্গারেটও উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষমাণা ছিলেন। ফলে, স্বামীজীর দ্বিতীয়বারের লণ্ডন অবস্থানের একটি দিনও, কোন কারণে, বৃথায় নষ্ট হতে দেননি মার্গারেট।

আকর্ষণ ছিল অনিবার্য। জিজ্ঞাসা এবং অন্তর-পিপাসা ছিল যেন দুষ্পূরণীয়। তাই প্রতিটি ভাষণে, প্রতিটি সভায়, প্রতিটি আলোচনাচক্রে উপস্থিত থেকে সেই সন্ন্যাসীর অভিনব জীবন-দর্শন যথাযথ অনুধাবন করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। মুগ্ধ-বিস্ময়ে প্রহরের পর প্রহর সেই আশ্চর্য পুরুষের পাদমূলে তিনি বসে থাকতেন। রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রতিটি বাক্য শ্রবণ করতেন এবং অশেষ যত্নে তার নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে চাইতেন।···

কোন বিশেষ দেশের ঐতিহ্যের সীমারেখায় স্বামীজীর বাণী-সমূহ আবদ্ধ থাকত না। কোন বিশেষ ধর্মের নীতিকথা তাঁর প্রতিপাদ্য হত না। পরন্তু, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর যে শাশ্বত, উদার মর্মবাণী, যে-বাণী সর্বকালের জন্য সত্য, সর্বলোকের পক্ষে প্রযোজ্য —সে বাণীই স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে মহামন্ত্রের মত সঞ্জীবনী রসে সিক্ত হয়ে মুহুর্মুহুঃ উদ্গীত হত। অবহিতচিত্তে আকাশে কান পাতলে এখনো যেন শোনা যায় তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত মন্ত্রের মহাঝঙ্কার :

'Thou art He, O Man! Thou art He. At first, the goal is far-off, outside Nature, and far beyond it, attracting us all towards it. This has to be brought near, yet without being degraded or degenerated. until, when it has come closer and closer, the God of Heaven becomes the God in Nature,···and the God who is Nature, becomes the God within this temple of the body, and the God dwelling in the temple of the body becomes the temple itself, becomes the soul of man. Thus it reaches the last words it can teach. He whom the sages have sought in all these places, is in our own hearts.'······

সে সব অক্ষয় মন্ত্রের ভাব-তরঙ্গে মার্গারেটের অবগাহন ছিল যেন তীর্থসলিলে অবগাহনেরই মত---শুচিতায় এবং তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধতায় ও মাধুর্যে অত্যন্ত সরস।

কোন কোন দিন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতেন স্বামীজী। একদিন সে ধরনেরই একটি আলোচনায় মার্গারেট শুনেছিলেন:

একটি যুক্তি-ভিত্তিক ধর্মের উপরই ইওরোপের ভবিষ্যৎ পরিত্রাণ নির্ভর করছে। অন্ততঃ তাই আমার বিশ্বাস।···

'The salvation of Europe depends on a rationalistic religion···'

জড়বাদী যখন বলেন, There is but one···তখন তিনি সত্য কথাই বলে থাকেন। পার্থক্য শুধু এই যে আমি 'ঈশ্বর' শব্দটি দিয়ে যাকে অভিহিত করি, জড়বাদী তাকেই 'পদার্থ' শব্দে অভিহিত করে থাকেন।

'Only he calls that one Matter, and I call it God.'

আরও শুনেছিলেন,--এক দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণে আবৃত রয়েছে সর্বংসহা এই বসুন্ধরা। এরই বুকে, নিরবধি কাল ধরে আমরা আন্দোলিত হচ্ছি আমাদের কান্না-হাসির, দুঃখ-সুখের তরঙ্গদোলায়। এই বিশ্বচরাচরের সর্বাবয়ব কোন জ্ঞান আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। এমন কি, সে অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে বলবার যে শক্তি বা ভাষা তাও আমাদের নাগালের বাইরে। অর্ধ-নিদ্রা ও অর্ধ-জাগরণের এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করছি, আবর্তিত হচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের এই তো পরিণাম! পশ্চাতে অতীতের কুক্ষিমধ্যে কি সম্পদ ফেলে এসেছি জানি না, দূর-ভবিষ্যতে কোন্

পরিণামে গিয়ে উত্তীর্ণ হব তাও জানি না। শুধু বর্তমানের স্বল্পমেয়াদী জীবনটি নিয়েই আমাদের—

'কান্নাহাসির দোল-দোলান
পৌষ-ফাগুনের মেলা'—চলছে।

এই তো মায়া, এই তো জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র রহস্যলীলা।

'To walk in the midst of a dream, half-sleeping, half-waking, passing all our lives in a haze, this is the fate of every one of us. This is the fate of all sense-knowledge. This is the Universe.'…
এখানে সুখের আশা বৃথা, রঙিন স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য!

ন্তু, এ-জাতীয় তত্ত্ব, যার সঙ্গে অন্ততঃ কতকাংশেও বিষাদের ছায়া জড়িয়ে থাকে, তাদের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ এবং আশার অমৃত-কথাও উচ্চারণ করতেন স্বামীজী অজস্র-ধারায়। সে-সব কথা আবার অমর-জীবনের জারক রসে অভিষিক্ত হয়ে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক অবাচ্য অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দিত মুহূর্ত মধ্যে।

মার্গারেটের কাছে সেও ছিল এক মহাবিস্ময়, এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

মায়াধীন জীবনের অসহায়তার কথা বলতে বলতেই চকিতে সে বন্ধনপাশ ছিন্ন করবার কৌশলটি বিবৃত করতেন বিবেকানন্দ। মার্গারেট ভাবতেন কি করে এটি সম্ভব হয়? এ মহাশক্তি কোথা থেকে আসে, কী ভাবে আসে?

স্বামীজী বলতেন,—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবন্ধনকে অতিক্রম করে শাশ্বত জীবনতত্ত্ব অধিগত করা যায়। যিনি অদ্বিতীয়, সর্বকারণ,

যোগক্ষেম ও জ্যোতির্ময়,—তাঁকে জানলে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়।···

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।

তবে এ জ্ঞানলাভের সবিশেষ কৌশলটি ঠিক ঠিক জানা চাই, তপশ্চর্যায় তাকে আয়ত্তে আনা চাই। ধর্ম সেই কৌশলটিকেই আমাদের জানিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

'মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে' সর্বসৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত করবার পন্থাই সে নির্দেশ করতে চায়।···

'It is always a matter of the growth of the individual, a question of *being* and *becoming*.'··· ধর্মের এই তো নিগূঢ় তত্ত্বকথা।···

অবশ্য, এর জন্য মহৎ প্রয়াস চাই, নিরলস জীবন-মরণ সাধনা চাই। বস্তু থেকে ভাবে, প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, মায়া থেকে মায়াতীতে উত্তীর্ণ হবার সবিশেষ আকুতি চাই। 'পিঞ্জরাদিব কেশরী' —এ জগৎজাল থেকে অভিনির্গমনের দুর্জয় সাহস থাকা চাই। এ কথাটি স্মৃতিপটে ধরে রাখা চাই যে অব্যয় আত্মা জড়প্রকৃতির দাস নয়, তার জন্য সেই নিত্য-মুক্ত চিন্ময়বস্তু বসে নেই।··· 'Not the Soul for Nature, but Nature for the Soul.'

কোন্ এক প্রশান্ত ধ্যান-রাজ্য থেকে সযত্নে আহরণ করে এ সব অপার্থিব বাণী, শাস্ত্রমুখে 'মন্ত্র' বলে, 'আপ্তবাক্য' বলে যারা কথিত—তাদের যেন প্রকাশ করতেন স্বামীজী। বিস্ময়মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ তদগতচিত্তে সে বাণী শ্রবণ করত, অনুধাবন করতে চেষ্টা করত।

সে চেষ্টায় সন্দেহ সংশয় যে দেখা দিত না এমন নয়। সব কথা যে সকলেরই বোধগম্য হয়ে উঠত এমনও নয়। ফলে, কখনো কখনো কেউ হয়ত বিরূপ মন্তব্যও করে বসত। বলত,—

'আপনি যা বলছেন সে সবই অবশ্য অতি সুন্দর কথা, মধুর কথা। কিন্তু এদের মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? মৌলিকত্বই বা কি আছে?'

মার্গারেট দেখতেন—সে সব মন্তব্য ভারতীয় যোগীর সমাহিত চিত্ততায় সামান্য একটু আঘাত হয়ত করত, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু দুটি যেন কোন স্বপ্ন-সায়রের অথৈ সলিলে নিমগ্ন হত এবং সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হত রহস্যময় গম্ভীর প্রত্যুত্তর :

'বন্ধুবর, আমি যা বলেছি তা নূতনও নয়, পুরাতনও নয়। সে শুধু সত্য, সে শুধু চিরন্তন। সত্য তার একমাত্র পরিচয়। তুষারঢাকা হিমালয়ের মত, সীমাহীন নীল আকাশের মত, নিত্য-প্রবাহিত এই সৃষ্টির মত—সে প্রাচীন, সে সনাতন।

যদি এর সাহায্যে আপনার চিন্তার গভীরতম প্রদেশটি আন্দোলিত হয়ে থাকে, যদি কোন মহত্তর জীবন যাপনে এ বাণী আপনাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে—তবে আমি তো ভাল কাজ করেছি বলেই মনে হয়।'···

এমনি কত কথা, অমৃতোপম কত মহাবাণী শ্রবণ করবার সুযোগ লাভ করেছিল মার্গারেট—দ্বিতীয় সাক্ষাতের সেই অপরিসর কালটিতে। সে সুযোগ যেমনি দুর্লভ ও অপ্রত্যাশিত ছিল তার প্রতিক্রিয়াও ছিল তেমনি সুদূরপ্রসারী।

একদিন অতীত যুগে গোপী-গীতার অমর কবির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল এই কথা :

হে প্রভু, আমার এ তপ্তজীবনে তোমার কথাই তো অমৃত। তোমার বাণী ছাড়া কল্মষাপহ আর কোন বস্তু কি আছে?

যুগে যুগে কবিকুল তোমার কথা নিয়েই রচনা করেছেন কাব্য, গ্রথিত করেছেন ছন্দগীতি। শ্রবণ-মঙ্গল তোমার কথা, কীর্তন-মঙ্গল তোমার বাণী—আমি শুনব, আমি বলব।···

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।

আজ আচার্য বিবেকানন্দের বাণী শ্রবণ করে মার্গারেটের পিপাসু মনটিতেও ঠিক অনুরূপ উচ্ছ্বাসেরই উদয় হয়েছিল। অশেষ সৌভাগ্য এবং সুকৃতি বশে সেই অপূর্ব, অনন্ত জীবনতত্ত্ব শুনবার সুযোগ তিনি লাভ করেছেন। এর তুলনা কি কোথাও আছে, কোন দেশে আছে? না, নেই। অন্ততঃ মার্গারেটের জীবন অভিজ্ঞতায় তো নেই।

এমন কথা তিনি কখনো শোনেননি, কোথাও শোনেননি। আজ স্বামীজীর কথা শুনে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অপসারিত হচ্ছে আবরণ, মুছে যাচ্ছে সর্ব সংশয় যবনিকা।···

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট রেখায় যেন প্রকাশিত হচ্ছে অনাগত জীবনের যাত্রাপথ। যে পথকে ক্ষুরধার বলে, দুর্গম বলে বর্ণনা করেছেন কবিকুল—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

* * *

আবার, একালেই একদিন একটি আলোচনা চক্রে মার্গারেট শুনতে পেলেন এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান :

আজ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, অশান্ত এই পৃথিবী কোন্ কাম্য বস্তুটির জন্য অপেক্ষমাণ ? কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন তার পক্ষে আজ একান্ত অপরিহার্য ?...

আজ তার সর্বাধিক প্রয়োজন—এমন মুষ্টিমেয় নরনারীর—তাদের সংখ্যা বিশ-একুশ হলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু যাদের কাছে—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্যো'র মত, আদর্শের আনুগত্যে যাদের চিত্ত ভাবনাহীন, শঙ্কাহীন।...যারা নাম-যশ চায় না, ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা করে না, যারা 'অভী' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারে—

ভগবানই আমার জীবনের একক কাম্যধন। ভগবান ভিন্ন, আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর আমার কিছুই প্রার্থনীয় নেই।...

'What the world wants to-day, is twenty men and women, who can dare to stand in the street yonder and say that they possess nothing but God. Who will go ?'

অথবা,

'The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word fall like a thunder-bolt.'

এবং, এসব কথা বলতে বলতেই যেন উজ্জ্বল বহ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠতেন স্বামীজী এবং মুহূর্তে নিজ দীর্ঘ দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে স্থির হয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ব্যগ্র প্রত্যাশা, কি যেন গভীর অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা !...

কেউ কি সাড়া দেবে? শ্রেয়ের জন্য প্রেয়কে বিসর্জন দেবার শক্তি রাখে, স্বপ্ন দেখে···এমন কেউ কোথাও কি আছে?

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন,'—সে ধন্য হবে, সার্থক হবে!···

সমস্ত কক্ষটি তখন যেন এক দিব্য আবেশে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, একটি নিরবয়ব মহাপ্রশান্তি যেন আচ্ছন্ন করেছে সকলকে।

কিন্তু তারি মধ্যে আরও একটি বাণী ধ্বনিত হল, ধ্যান-ব্যুত্থিত চিত্তের অনাহত শব্দের মত—

'If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?'

এ মহাতত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে অপর বস্তু-নিচয়ের আর প্রয়োজন কি? আর এ তত্ত্বই যদি মিথ্যা হয় তবে জীবনের মূল্যই বা কি?···

এমনিভাবে লণ্ডনের দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকারের দিনগুলিতে ক্ষণে ক্ষণে অভিনব ভাব-প্রবাহের খরস্রোতে যেন ভেসে চলেছিল মার্গারেট। মনে হয়েছিল, এক অপ্রত্যাশিত পরিণাম, এক মহা-আহ্বান যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে। কে যেন বলছে, ভবিষ্যতের অস্পষ্টতার অন্তরাল থেকে অহরহই বলছে—

'আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
কিছু নাই তোর ভাবনা।'

অর্থাৎ, সেকালে মার্গারেটের জীবনে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন যে আসন্ন হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নাই। একদিকে রহস্যাবৃত অন্তর-জগতের অভিনব সংবাদ বিচিত্র উন্মাদনার সৃষ্টি করছে আর অন্যদিকে দ্বিধা ও সংকোচ যেন মধ্যে মধ্যেই মনটিকে পিছনের দিকে আকর্ষণ করছে। একদিকে নূতন জীবনের স্বপ্ন ও এড্‌ভেঞ্চার গোধূলিলগ্নের বংশীধ্বনির মত—'Like the sound of a flute

heard far away on the bank of some river in the hour of dawn'—ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অপরদিকে অনিশ্চয়তার শঙ্কা জাগ্রত হচ্ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

তাই মার্গারেটের আত্মস্মৃতির পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—

'His system as a whole, I for one, viewed with suspicion, as forming only another of those theologies which it a man should begin by accepting would surely end by transcending and rejecting.'

এই যেমন একদিকে—আবার অন্যদিকে, একই কালে,—মার্গারেটের অন্তরে এ বিশ্বাসটিও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল যে এই সেই দৈব-প্রেরিত, আধিকারিক পুরুষ যাঁর কল্যাণস্পর্শে তার স্বকীয় জীবন ধন্য হবে, জন্ম সার্থক হয়ে উঠবে। মনে হয়েছিল যে এই সে আদর্শ মহাজীবন—প্রেম এবং জ্ঞান, ভক্তি এবং যুক্তি—যার মধ্যে এক দিব্য দেব-দেউল গড়ে তুলেছে, এক মন্দাক্রান্তা জীবনছন্দ রচনা করেছে। মার্গারেটের নিজস্ব ভাষায়:

'It is difficult at this point to be sufficiently explicit. The time came before Swami left England, when I addressed him as 'Master'. I had recognised the heroic fibre of the man. and desired to make myself the servant of his love for his own people.'

—কাজেই নিঃসংশয়, মার্গারেট নিঃসংশয় হয়েছিলেন সে বিষয়ে।…

সমস্যা ছিল শুধু নিজ ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ বন্ধন-জটিলতা নিয়ে। নিজ দেশগত এবং শিক্ষাগত দৃঢ়মূল সংস্কাররাশি নিয়ে। তাই প্রশ্নও জেগেছিল এই ধরনের,—

এই সিংহবীর্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার নিজ জীবনের প্রাক্তন সম্বন্ধ কি কিছু আছে? যদি থেকে থাকে তবে সে সম্বন্ধের রূপ কি? প্রকৃতি কি? আর যদি না থাকে—তবে? তবেই তো মহা-অনিশ্চয়তা, মহা-সমস্যা। মার্গারেটের সেদিনকার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও এই ছিল মূল জটিলতা। এরই ফলে, নিরতিশয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য তাকে পেয়ে বসেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, একথা সেদিন তার জানা ছিল না যে যাঁকে কেন্দ্র করে তার অন্তরজীবনে কঠিন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, যাঁকে নিয়ে মহাজিজ্ঞাসার সে সম্মুখীন—তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়েও অনুরূপ জটিল সমস্যাই মাথা তুলেছিল।

আধ্যাত্মিক জীবনের সূক্ষ্ম, অনুভূতিগম্য ইতিহাসে, গুরুশিষ্য-সংবাদের ইতিবৃত্তে এ কোন নূতন কথা নয়, অভিনব ব্যাপার নয়। স্বামী বিবেকানন্দের চরিতকথায়ও দেখা যাবে যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আচার্য বিবেকানন্দ, একদিন এক সংশয়-পীড়িত, জিজ্ঞাসু যুবক ছিল। নরেন্দ্রনাথ নামে সেদিন সে পরিচিত ছিল। সমস্যা-জর্জরতায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নগ্নপদে, একবস্ত্রে কলিকাতা মহানগরী থেকে প্রায় তিন চার ক্রোশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পাগল-পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে সেদিন সে উপস্থিত হয়েছিল। বুঝতে চেয়েছিল আত্মরূপ, জানতে চেয়েছিল সে কে, কোথা থেকে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি।

তারপর? তারপর, দিনে দিনে দিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। সংশয়-কুয়াসা অপসারিত হয়েছিল ধীরে ধীরে। অপগত-সংশয় সে যুবক তখন প্রার্থনা করেছিল নির্বিকল্প সমাধি, পূর্ণ সমাহিত-চিত্ততা। বলেছিল,

আমি নিরবধি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাই, ডুবে থাকতে চাই। আর আমার কোন কামনা, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। হে ঠাকুর, আমার এ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করে দাও।

কিন্তু কাল সেদিন অনুকূল ছিল না। নরেন্দ্রনাথের অন্তরের ঐকান্তিক আবেদনও তখন সেজন্যই পূর্ণ হয়নি। পরন্তু, তদীয় আচার্যদেব প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে তাঁর সে আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং তৎপরিবর্তে আর এক মহা-কর্মভার, এক বিশেষ গুরু-দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিলেন। করে বলেছিলেন,...

নির্বিকল্প সমাধি এখন নয়। যথাকালে সে সম্পদ তুমি লাভ করবে। আজ যুগ-প্রয়োজনে শিববোধে জীবসেবার দায়িত্ব গ্রহণ কর তুমি। আর্তজনের চোখের জল মুছিয়ে দাও। নিষ্পাদপ ঊষর প্রদেশে বহু-যোজন-বিস্তৃত-শাখা মহীরুহের মত নিজ জীবন-বৃক্ষটিকে তুমি বর্ধিত কর, প্রসারিত কর দিগন্ত সীমানায়। আর তার প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে তৃষিত, তাপিত নর-নারী আশ্রয় লাভ করুক, শান্তিলাভ করুক। এবারে এই তোমার জীবনব্রত।...

তাই বলছিলাম,—লণ্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ কালে তরুণী মার্গারেটের সম্মুখে যে সমস্যা মাথা তুলেছিল—ঠিক সে জাতীয় সমস্যাই একদিন তদীয় আচার্যদেবের জীবনেও উপস্থিত হয়েছিল, প্রায় একই ধরনের জটিলতা নিয়ে, একই-জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে।...পার্থক্য যা ছিল সেটি পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়। কোয়ান্টিটেটিভ, কোয়ালিটেটিভ নয়।...

নরেন্দ্রনাথ যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রথম গমন করেন সেদিন যুবক নরেন্দ্রনাথকে দেখবামাত্র তাঁর গুরু চিনতে পেরেছিলেন; নিঃসংশয় হবার জন্য পরীক্ষা অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু প্রথম-দর্শনের যে সিদ্ধান্ত সেটি সর্বাংশেই নির্ভুল ছিল। তাই প্রথম-দর্শনেই নিজ উত্তর-সাধককে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি এবং আকর্ষণও করেছিলেন অনিবার্য শক্তিতে।

আর আজ? আজ স্বামী বিবেকানন্দও কি মার্গারেটের মধ্যে তাঁর উত্তর-সাধিকা মানস-কন্যাটিকে প্রথম-দর্শনেই চিনতে পেরে-

ছিলেন? বহিরাবরণের প্রচ্ছন্নতার অন্তরালে যে চিত্তটি উৎসর্গ-উন্মুখতায় অপেক্ষমাণ তার আকুতি কি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন?

সুবাসিত পুষ্প রহে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?—

এ-উক্তি মার্গারেটের জীবনে কি সত্য হয়ে উঠেছিল? রূপ নিয়েছিল সেইদিন? হয়ত নিয়েছিল, অন্ততঃ নেওয়াই সম্ভব। কারণ, সিদ্ধগুরুর তৃতীয় নেত্রের সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে শুভ সংস্কারের মহাসম্পদ উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। দক্ষ শিল্পী নানা আবর্জনার মিশ্রণ থেকেও কঠিন হীরকখণ্ডকে আবিষ্কার করে। বস্তুতঃ, তাকে রূপ দেবার এবং ঔজ্জ্বল্য দান করবাব প্রবল আংকাক্ষাই শিল্পীকে সেই বিশেষ দৃষ্টিটি দান করে।

অতএব, মার্গারেটেব ঐকান্তিক আবেদন— ভাষায় অনুক্ত হলেও —যথাকালে তার ভাবী আচার্যের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। এবং সেইজন্যই দেখা যায় যে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারেব কালেই, একদিন সহসা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজী আহ্বান জানিয়েছিলেন মার্গারেটকে। সে আহ্বানের পশ্চাতে যেন একটি পূর্বনির্দিষ্ট-সিদ্ধান্তেব সুর ধ্বনিত ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন,— 'আমাব দেশেব মেয়ে-দের জন্য আমার বিশেষ একটি পরিকল্পনা রয়েছে। মার্গারেট, আমার মনে হয়, অনেক সময়ই মনে হয়, আমার সে পরিকল্পনাটিতে তোমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাকে রূপ দেবার জন্য, সফল করবার জন্য তোমাকেই আমার প্রয়োজন।'…

'I have plans for the women of my own country in which you, I think, could be great help to me.'

সে আবেদনের সন্ধানও যেমন মার্গারেটেব ক্ষেত্রে অব্যর্থ হয়েছিল—তার প্রভাবও তেমন মর্মস্পর্শী হয়েছিল। মুহূর্তে যেন জোয়ার এসেছিল তার জীবনপ্রবাহে। অন্তরের মণি-মঞ্জুষার কঠিন আবরণ সহসা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রয়েছে। হে পূষন্, সে আবরণ অপসারিত করে দাও। আমি সত্যকে জানব, ধর্মকে উপলব্ধি করব। —উপনিষদের এই ত প্রার্থনা।

আর আজ মার্গারেটের সম্মুখেও সেই সত্য ও ধর্মকে দেখবার জন্য, তাদেরই নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করবার জন্য আচার্যের ছিল অপ্রত্যাশিত মহা-আহ্বান।

মার্গারেট মনেপ্রাণে অনুভব করেছিল যে এই সেই অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত—যা তার সমগ্র জীবনটিকে আমূল বদল করে দেবে, পরিবর্তিত করে দেবে।

'It was a call which would change my life.'

বলা বাহুল্য, কোন মামুলি বা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের জন্য সে আহ্বান-বাণী উচ্চারিত হয়নি। বেদনা-পীড়িত এ পৃথিবীর বিশাল কর্মশালা বর্জন করে আত্মমুক্তির চিরাচরিত পথ অনুসরণ করবার জন্যও সে আহ্বান ধ্বনিত হয়নি। পরন্তু, 'শিববোধে জীবসেবার' যে মহা-দায়িত্ব নিজ গুরুর কাছ থেকে তিনি স্বয়ং লাভ করেছিলেন এবং যার কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি—তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যই নিজ মানস-কন্যার প্রতি তাঁর ঐ আহ্বান ছিল।···

আজ মার্গারেটের দেহত্যাগের কত বৎসর অন্তে তাঁর মহৎ জীবনের সে অক্ষয় লগ্নটির কথা আমরা চিন্তা করি, ধ্যান করি। মার্গারেট অবশ্য কোনদিক দিয়েই একজন সাধারণ রমণী ছিলেন না। বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক প্রচণ্ড কর্মৈষণাও তাঁর প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্ট এক রহস্যময় ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন নিরবধি হাতছানি দিয়ে ডাকত। সে-কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কাজেই, এটা সম্ভব যে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তাঁর মনে এক মহা-আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়াও ছিল সেই বিরাট পুরুষের বিচিত্র জীবন, বিচিত্র মহিমা,—যাঁকে দেখবামাত্র সমগ্র সত্তা উচ্চকিত হয়ে স্বতই যেন বলে উঠত—

'Behold, behold the man !'

তথাপি, ঠিক সেইমুহূর্তেই, স্বামীজীর পরিকল্পনার কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই, কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি মার্গারেট।

হওয়া সম্ভবও ছিল না।

তার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন ছিল, আরও সন্দেহ-নিরসনের আবশ্যকতা ছিল। তাই দেখা যায় যে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিজ মনোগত প্রশ্ন কয়েকটি সহজ বাক্যে গ্রথিত করে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করছেন মার্গারেট ঃ

আপনার জীবনের লক্ষ্য কি, ব্রত কি ? কোন্ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে আপনি সতত নিযুক্ত আছেন ? দুটি-একটি বাক্যে সে-কথা আমি জানতে চাই।... আমার নিজের জীবনের ঐকান্তিক-প্রয়োজনের তাগিদেই সে-কথা আমার জানা বিশেষ দরকার।

'ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

একদা বিগত অতীতে, মহাভারতের যুগে মহারথী ধনঞ্জয় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলেছিলেন। কারণ ছিল তাঁর বিভ্রান্তি, কারণ ছিল তাঁর বিমূঢ়তা। বহু বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘাতে বস্তুতই তিনি পীড়িত হয়েছিলেন সেদিন। আবার শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় পরিচয়টিও তখন পর্যন্ত তাঁর কাছে অজ্ঞাত রহস্যের মত ছিল। সুতরাং, 'বুদ্ধিং মোহয়সীব মে' এ অভিযোগটি স্বতই উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ হতে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে শাশ্বত উপদেশ এবং দিব্যদৃষ্টি

লাভ করে অনাসক্ত কর্মকৌশল তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টিরহস্যের বিচিত্র মর্মকথা—

'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।'

ফলে, অর্জুনের মোহ নষ্ট হয়েছিল, লুপ্তস্মৃতি পুনর্জীবিত হয়েছিল। তিনি আত্মস্থ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করে বলেছিলেন,—

হে পুরুষোত্তম, তোমার প্রসাদে আমার মোহ অপসৃত হয়েছে, নষ্টস্মৃতি আমি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। এখন নিঃসংশয় হয়ে তোমার আদেশ আমি পালন করব। আমি যুদ্ধ করব।

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥'

ইত্যাদি···

আবার আজ, সে যুগের কত কাল, কত মন্বন্তর পরে—বিভ্রান্ত মার্গারেটের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দও যেন অনুরূপভাবেই নিজ জীবনের নিভৃত মর্মকথাটি প্রকাশ করেছিলেন। একটি নাতি-দীর্ঘ পত্রের মাধ্যমে সে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল। সে পত্র মার্গারেটের সংশয়-পীড়িত চিত্তে যেন অমৃতনিষেকের মত ক্রিয়াশীল হয়েছিল। চলার পথে চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণের অগ্নিমন্ত্রই যেন বহন করে নিয়ে এসেছিল সেই পত্রখানি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে লিখিত সে পত্রটি এইরূপ ছিল ঃ

'প্রিয় মিস নোব্‌ল,

আমার জীবনের আদর্শটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা চলে।

মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সে দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার। যে উৎপীড়িত, তাকে

আমি করুণা করি—তা সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। আর যে উৎপীড়নকারী—তার প্রতি আমার করুণা সমধিক।

আমার কাছে এ ধারণাটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অজ্ঞতাই সর্বদুঃখের হেতু। তাছাড়া, আর কিছু নয়। জগৎকে কে আলো দেবে? কে পথ দেখাবে?

আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতযুগের কর্মরহস্য। আর আমার মনে হয় অনাগত কালেও যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা নির্ভীক, যাঁরা বরেণ্য--বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য তাঁদেরই আত্মবিসর্জন করতে হবে, আত্মত্যাগ করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বক্ষে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব হবে এ কামনা নিয়ে চিরকাল এ জগৎ অপেক্ষা করবে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন, একান্তভাবে প্রয়োজন—চরিত্র। প্রেম-প্রদীপ্ত জীবন চাই, স্বার্থহীন মানুষ চাই। তেমন মানুষের জীবন অব্যর্থ হবে। তার প্রত্যেকটি কথা অমোঘ হবে।··

এসব তোমার কাছে কুসংস্কার বলে মনে হবে না আশা করি। তোমার মধ্যে এক বিরাট শক্তি রয়েছে, ক্রমে আরও শক্তি আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, আর জ্বলন্ত, জীবন্ত কর্মসাধনা। হে মহাপ্রাণ,—ওঠ, জাগো। দুঃখের আগুনে পুড়ে গেল সংসার, ছাই হয়ে গেল পৃথিবী—আর তুমি ঘুমোচ্ছ? এ নিদ্রা কি তোমার সাজে?

এস, আমরা ডাকি, অবিশ্রাম ডাকি—যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হয়ে ওঠেন, যতক্ষণ না অন্তরের অধিদেবতা সাড়া দেন। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর আর কি আছে বল?

আমি জানি খুঁটিনাটির জন্য কিছু আটকাবে না। আমার চলার পথে, গতির সঙ্গে সঙ্গেই সব প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি এসে যাবে। তাই; আটঘাট বেঁধে, প্ল্যান করে আমি কোন কাজ করি না।

কর্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে এবং নিজেই নিজের কাজ সাধন করে থাকে। আমি শুধু বলি,—ওঠ, জাগো। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! এই আমার কাজ, এই আমার জীবন-ব্রত!'…

এই চিঠি। এই মর্মস্পর্শী চিঠির আবেদন মার্গারেটের জীবনে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের এক বিস্তৃত পটভূমি রচনা করেছিল। আর শুধু পটভূমি রচনাই বা বলি কেন,—সে পত্রের প্রত্যক্ষ আবেদনের ফলেই নিজ দেশ, আত্মীয়-পরিজন, সমাজ, কর্মভূমি—এক কথায় জীবনের আকাঙ্ক্ষিত যা-কিছু সব চিরদিনের মত পিছনে ফেলে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করবার চরম সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং দু'বৎসরেরও অনধিক কাল মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। সোনার বাংলার সরস মাটিতে সেই মার্গারেটের প্রথম পদার্পণ। ইতিমধ্যে অবশ্য পর পর আরও কতগুলি মহামূল্যবান চিঠি লিখেছিলেন স্বামীজী মার্গারেটকে। সে সব চিঠির ছত্রে ছত্রে কত আশীর্বাদ, কত অনাবিল স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল। মার্গারেটকে নিয়ে স্বামীজীর যে স্বপ্ন, যে দূর-প্রসারিত আশা—সে সব যেন স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে সব পত্রগুচ্ছে…আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ভারতের যে রূঢ় বাস্তব চিত্র, যে ক্ষুৎক্ষাম-পীড়িত বেদনার্ত ছবি—তাও উদ্ঘাটিত হয়েছিল নিখুঁত বর্ণনায়, পরিচ্ছন্ন চিত্রে। তাদের মধ্যে উৎসাহ-প্রেরণাও ছিল যেমনি অফুরন্ত—সতর্ক সাবধান বাণীও ছিল তেমনি প্রচুর।…সেজন্য, উদাহরণ হিসাবেই আরও একটি পত্র এখানে আমরা উদ্ধৃত করব। স্বামীজী লিখেছিলেন :

'তোমাকে খোলাখুলিভাবে একটি কথা বলছি। এখন আমার মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারতবর্ষের সেবায়, ভারতবর্ষের কল্যাণকল্পে তোমার ভবিষ্যৎজীবন চিহ্নিত হয়ে আছে।

আজ আমাদের দেশের জন্য, বিশেষ করে তার নারীসমাজের

জন্য একটি শক্তিমতী নারী চাই। পুরুষ নয়, নারী। যোগ্যা, মনস্বিনী নারী। সিংহিনী-সম মহিলা। ভারতভূমির ঊষরতা এখনো ঘোচেনি, যোগ্য নারীর উদ্ভব এখনো সেখানে বিরল। তাই অন্যদেশ থেকে ধার করা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।

তোমার শিক্ষা ও ঐকান্তিকতা, তোমার শুচিতা ও প্রেম,—সর্বোপরি, তোমার ধমনীমধ্যে প্রবাহিত যে কেল্টিক রক্ত, তারই জন্য তুমিই প্রকৃত সেই যোগ্যা নারী—যার প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষে অপরিহার্য। তবে, এর মধ্যে একটি কথা আছে। সেটিও তোমাকে খোলাখুলিভাবেই বলা দরকার।

মহৎ কর্মে পথের বাধা সর্বদাই দুরতিক্রম্য হয়ে থাকে। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। ··দেশের দুঃখ যে কত গভীর, কত মর্মান্তিক, মানুষের কুসংস্কার এবং দাসত্বের বদ্ধতা যে এখানে কত ব্যাপক তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। স্বাধীন দেশের পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা ধারণা করা সম্ভবও নয়! এ দেশে সত্যি যদি তোমার আসা হয়, তবে দেখতে পাবে অর্ধ-ভুক্ত, অর্ধ-উলঙ্গ, অশিক্ষিত নরনারীর এক অবিশ্বাস্য জনতা! জাতি-বিচার আর ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে এদের ধারণা বীভৎস। ভয়েই হোক আর ঘৃণায়ই হোক, শ্বেতাঙ্গদের স্পর্শ করতেও এরা সঙ্কুচিত হয়। শ্বেতাঙ্গগণও এদের অন্তর থেকে ঘৃণা করে। অথচ, এদেরই মধ্যে তোমাকে বাস করতে হবে, এদেরই জন্য কাজ করতে হবে।

তোমার স্বদেশবাসিগণ তোমার কাজ অত্যন্ত অপছন্দ করবেন। তাঁরা তোমাকে উন্মাদ মনে করবেন, সন্দেহের চোখে দেখবেন।

তার উপর, এদেশের জল-হাওয়াও তোমার পক্ষে প্রতিকূল হবে। গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশ। এখানকার শীতও তেমন তীব্র নয়—অনেকটা তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। আবার, দক্ষিণাঞ্চলে তো বারো মাসই যেন আগুনের হল্কা চলছে। শহরের বাইরে কোথাও ও-সব দেশের মত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন উপকরণ পাওয়া যায় না।

তথাপি, এসব জেনেও, যদি তুমি এদেশের কাজে ব্রতী হও, এদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গে কৃতসংকল্প হও,—তবে শতবার, সহস্রবার আমি তোমাকে স্বাগত আহ্বান জানাব।

তুমি এস। তোমার মত নারীর, তোমার মত কন্যার প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষে যে কত গভীর তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।···

কিন্তু আমি আবার বলছি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিশেষভাবে সব দিক ভেবে দেখো, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ধীরভাবে পূর্বাপর চিন্তা করে নিও। তারপর ঝাঁপ দিও। ফলের জন্য চিন্তিত হয়ো না। তোমার সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে যদি ব্যর্থ হও, যদি কর্ম-আবর্তে বিরক্তি বা অবসাদ আসে--তাতেই বা কি? আমার দিক থেকে সেজন্য কোন ভাবান্তর উপস্থিত হবে না।···আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার পার্শ্বে থাকব। তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর, আর না-ই কর, বেদান্তের ভাবধারা গ্রহণ কর অথবা বর্জন কর —কি আসে যায় তাতে?'

'I will stand by you unto death, whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it.'

'মরদ্‌কা বাত্, হাতীকা দাঁত—একবার বেরিয়ে এসে আর কি ফেরে? না, ফেরে না। পুরুষের বাক্যও ঠিক সেইরূপ জেনো।'

'The tusks of the elephant come out, but they never go back. Even so are the words of a man.'···

'ভারতবর্ষের কাজে সর্বতোভাবে তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারো পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া তোমার চলবে না।···

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥'

—এই শাস্ত্রবাক্যটি সতত স্মরণে রেখে কর্মের সংকট সংকুল পথে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে।' ইত্যাদি…

তবে, এসব চিঠি যে সময় মার্গারেটের হাতে পৌঁচেছিল তখন নিজের দিক থেকে তাঁর সংকল্প বহুলাংশেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে আসবেন মার্গারেট, এ-দেশের সেবায়ই আত্মোৎসর্গ করবেন তিনি। যদিও তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কর্মজীবন থেকে মার্গারেট অবসর গ্রহণ করেননি। স্নেহময়ী জননীর অনুমতিও প্রার্থনা করা হয়নি।…

ভারতবর্ষ, ভৌগোলিক বিচারে একটি উপ-মহাদেশের মত যার বিস্তৃতি—সেটিও তখন পর্যন্ত তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে। শুধু পুঁথির পাতায় আর স্বামীজীর জীবনের মধ্য দিয়েই তার অস্পষ্ট পরিচয় তিনি লাভ করেছেন। তথাপি তুর্নিবার আকর্ষণ আসছে সূক্ষ্ম চিন্তার পথে। স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক আহ্বান তাঁকে টানছে, সে মহা-পুরুষের যে অপার্থিব স্নেহ, সেও তাঁকে টানছে। টানছে তুর্নিবার শক্তিতে, বিরামহীন প্রক্রিয়ায়। আর তারই ফলে অন্তরের অন্তঃস্থলে সংকল্পের একটি সুদৃঢ় বুনিয়াদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক ঔদাসীন্যও যেন অন্তরকে দিনে দিনে আচ্ছন্ন ক. দিচ্ছে

এই তু'দিনের নশ্বর জীবনের সীমিত পরিধি অতিক্রম করে যে জীবন-মন্দাকিনী—কল্প থেকে কল্পান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে অবিশ্রাম প্রবাহে গতিশীলা, তারই আহ্বান যেন মার্গারেটের কর্ণে প্রবেশ করে তার অতীতকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতার বন্ধন শিথিল করে ফেলছে, আর ক্ষণে ক্ষণে, বিচিত্র রোমাঞ্চ নিয়ে নূতন জীবনের তীব্র, তীক্ষ্ণ আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে মর্মমূলে। ডাকছেন। স্বামীজী যেন ডাকছেন,—

'The world is burning in miseries. Can you sleep? Awake, awake, great soul!'

'চল তব বাধাহীন পথে,
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন গতি,
যতদিন ওই তব মহাত্যুতি প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর সর্বদেশে
সেই আলো নহে বিচ্ছুরিত, যতদিন
সকল মানব
তুলি উচ্চশির—নাহি হেরে টুটিল শৃঙ্খল,
নাহি জানে আনন্দেতে পরিতৃপ্ত
তাদের জীবন।'

তিন

আটাশে জানুয়ারী।

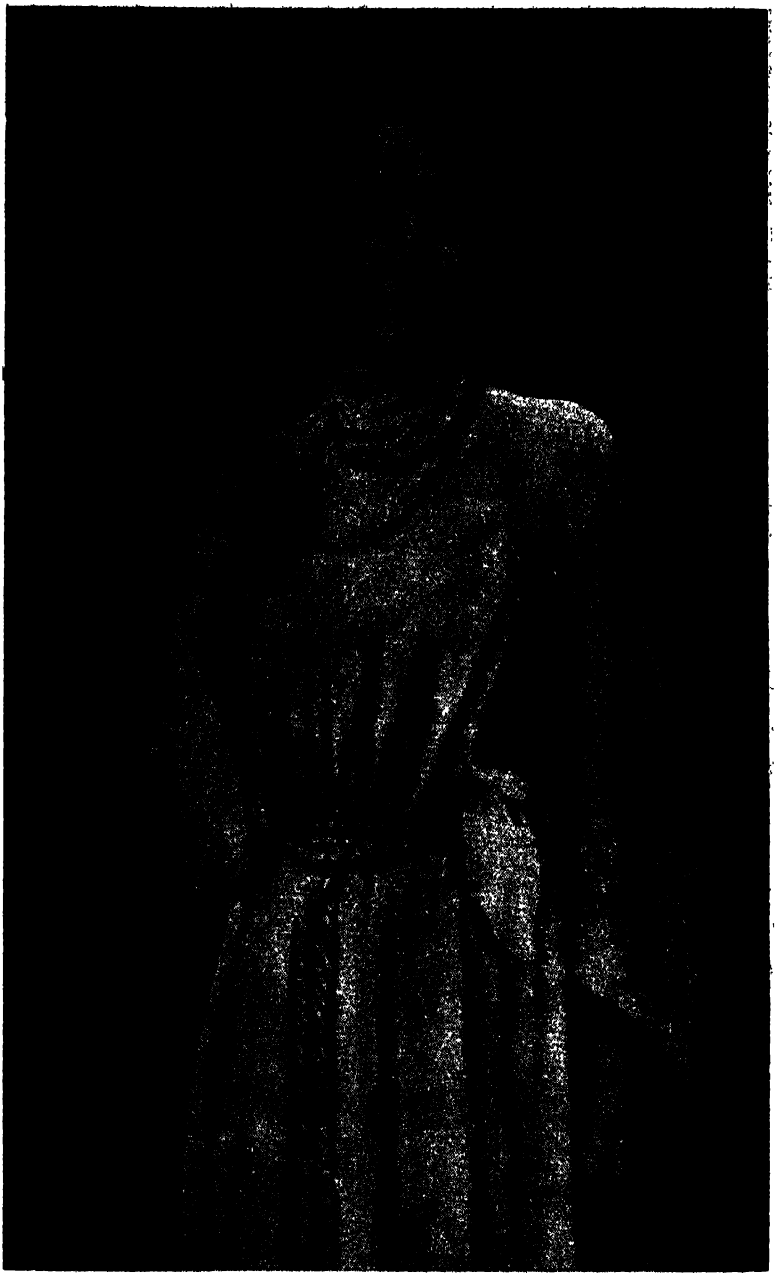
সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আটাশে জানুয়ারী।

সুখ-স্পর্শ শীতঋতুর সে একটি প্রসন্ন প্রত্যূষ ছিল। নীল, নির্মেঘ ছিল আকাশ, সরস স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল গঙ্গার শীকর সিক্ত বায়ু-প্রবাহ। আর তারই মধ্যে শত যোজন-বিস্তৃত মহাসমুদ্র অতিক্রম করে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেছিল মার্গারেট। অফুরন্ত আশা ছিল অন্তরে, অনাগত ভবিষ্যতের এক অবাচ্য কৌতূহল ছিল দৃষ্টিতে।

'বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণ দীপ্ত গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
ঘোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।'

নীলবর্ণ আয়তলোচন দুটিতে এই ছিল অনুক্ত ভাষা।···

আজ দীর্ঘ কালান্তরে সে বিদেশিনী নারীর ঋজু, শুভ্র তনুখানি কল্পনার চক্ষে আমরা দেখতে চেষ্টা করি। তাঁর দূর-বিন্যস্ত রহস্যাচ্ছন্ন দৃষ্টির নীরব ভাষাটি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়াসী হই এবং তারই ফলে যেন দেখি প্রভাতের সেই পূত, পরিচ্ছন্ন পটভূমিতে—জাহাজের একটি পার্শ্বে রেলিং-এ হাতটি রেখে পূর্বাস্য হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চারদিকে সবই নূতন,—কি প্রকৃতি, কি মানুষ সবই অপরিচিত। তবু বঙ্গ-প্রকৃতির সে অতুলনীয় শ্যাম-সৌন্দর্য, 'অশথগাছের কচি পাতার' সে



ভগিনী নিবেদিতা

অনবদ্য রঙিন আলো যেন মুহূর্তে মার্গারেটের চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিল, মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। উদয়দিগন্তে সদ্য-আবির্ভূত আলোকশিশুকে উদ্দেশ করে হয়ত তিনি বিনম্র প্রার্থনা জানিয়েছিলেন সেদিন—

হে প্রভু,

'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি।'

আমি তোমাকে প্রণাম করি।···

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

আর সে প্রণতি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল জেঠির উপর দণ্ডায়মান একটি অতি-পরিচিত, অতি-আকাঙ্ক্ষিত দিব্য মূর্তির দিকে। সে মূর্তি তদীয় আচার্যদেবের, স্বামী বিবেকানন্দের। স্বামীজী স্বয়ং মার্গারেটকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য জাহাজঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন।

একদিন, প্রায় তিনবৎসর পূর্বে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, বহুলাংশে দৈবচালিত হয়েই যেন মার্গারেট স্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন। আবার আজও যেন সেই একই দৈব-বিধানে ভারতের মাটিতে তাঁর প্রথম পাদ-বিক্ষেপ।

তিন বৎসর পূর্বেকার দিনটিতে গোধূলি লগ্নে এক সুপরিচিত পরিবেশে—এই তেজঃপুঞ্জ, মহাপ্রাজ্ঞ ভারতীয় ঋষিকে মার্গারেট প্রথম দেখেছিল। সে-কথা পূর্বে বলেছি। সেদিন, প্রথম দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় এ ভাবটিই মার্গারেটের মনে উদিত হয়েছিল যে সে অসামান্য ব্যক্তিটি এজগতের হয়েও যেন সর্বাংশে এ জগতের নন। তিনি এক স্বতন্ত্র পুরুষ, এক স্বতন্ত্র চরিত-মহিমা। মনে

হয়েছিল, যে অজ্ঞাত, রহস্যময় দেশ থেকে কালে কালে—'সম্ভবামি যুগে যুগে'-রূপ মহা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বুদ্ধ আসেন পৃথিবীতে, যীশু আসেন পৃথিবীতে সে-দেশেরই যেন তিনি এক চিরন্তন অধিবাসী। অথচ, আমাদের এই যে দুঃখ-সুখের সংসার, হাসি-কান্নার মায়ায় ঘেরা আমাদের এই যে পৃথিবী—তার সঙ্গেও তাঁর একটি নিবিড় যোগ রয়েছে—বত্রিশ নাড়ীর সংযোগের মত।

আর স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন অসামান্য দীপ্তিময়ী এক রমণীকে। কাঠিন্যে এবং দৃঢ়তায় ইস্পাতখণ্ডের মত হয়েও প্রেমে এবং ঔদার্যে একান্ত নমনীয়। পাশ্চাত্যের উদ্যান-বাটিকায় অনাঘ্রাত এক পুষ্পকোরকের মত বিকাশোন্মুখ হয়ে সে অপেক্ষমাণা। সুতরাং স্বামীজীর উৎসুক দৃষ্টিও যে স্বতই মার্গারেটের উপর নিপতিত হয়েছিল এবং স্বল্পকালেই তার উপর অশেষ প্রত্যাশা তিনি স্থাপন করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব-পর্যায়ে সে কথাও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতএব, আজ মার্গারেটের ভারতবর্ষে আগমন স্বামীজীকে যে বিশেষ পরিতৃপ্তি দান করেছিল, এ দেশের নারী সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি যে অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।...

সে যাই হোক, মার্গারেট নোবেল উপস্থিত হলেন ভারতবর্ষে, উপস্থিত হলেন মহানগরী কলিকাতায়। অর্থাৎ, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, স্বপ্নের সঙ্গে স্থূলের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হল। অথবা, আয়ার্ল্যাণ্ড-দুহিতা মার্গারেট—বিবেকানন্দের মানস-কন্যায়, ভারত-ভগ্নী নিবেদিতায় জন্মান্তর লাভের দুশ্চর তপস্যায় আত্ম-নিয়োগে ব্রতী হলেন। আর এ সময়ের পর থেকে, একেবারে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের দিনটি পর্যন্তই মার্গারেটের নূতন জীবনের দীক্ষাকাল, শিক্ষাকাল। এ-কালের মধ্যেই

বিবেকানন্দের নিকট-সাহচর্যে ও নির্দেশে, শিক্ষায় এবং আশীর্বাদে—তাঁর দুশ্চর জীবন-তপস্যা সিদ্ধ হয়েছিল, পূর্ণ সাফল্যে সার্থক হয়েছিল। দেহে ও মনে, চিন্তায় ও ধ্যানে, কর্মে এবং উপাসনায়,—এক কথায়, সর্ব ভাবে 'নিবেদিতা' সার্থক-নামা হয়ে বিকশিত হয়েছিলেন, কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন।

তবে স্বভাবতই সে জন্মান্তর-প্রক্রিয়া যেমন সহজ ছিল না, তার সিদ্ধিও তেমনি অনায়াস-লব্ধ বস্তুরূপে ধরা দেয়নি। সে জন্যই মার্গারেটের সে তপস্যাকে দুশ্চর এবং দুরূহ বলে আমরা অভিহিত করছি। নবজন্ম মাত্রেই অবশ্য কঠিন প্রসব-বেদনার অনুগামী হয়ে থাকে। কোন নিম্ন পর্যায়ের মিশ্রিত ধাতু যে উচ্চতর পর্যায়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করে সেও এক প্রচণ্ড অগ্নি-শুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। কাজেই, মার্গারেটের সেই যে মহারূপান্তর, সেই যে নবজন্মলাভ সেটিও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র বেদনা এবং দহন ভিন্ন সাধিত হয়নি। তবে নিবেদিতা নিজে এটিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি এবং মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে, উত্তরকালে তিনি নিজ আত্মকথায় এইরূপ লিখেছিলেন:

'যে কোন চিন্তানায়ক মহা-মনীষীর চারদিকে যে সব ব্যক্তি আকৃষ্ট হন তাদের সকলের সঙ্গেই সে মনীষীর একটি প্রগাঢ় ভাব-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস, এই প্রণালীর মধ্য দিয়েই যুগে যুগে মহাপুরুষদের চিন্তারাশি বহু-বিস্তৃতি লাভ করে, জনসমাজে গৃহীত হয়। কিন্তু সে ভাব-সম্বন্ধের কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ থাকে না। নানা রূপে, নানা সূত্রে সে গ্রথিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। দাসভাবে, ভ্রাতাভাবে, সখা বা বন্ধুভাবে এমন কি বাৎসল্যভাবেও সে অপার্থিব সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে যে এ জাতীয় ভাব-সম্বন্ধের মাধ্যম ভিন্ন কোন সাধারণ, প্রাকৃত মানুষ অপ্রাকৃত মহামানবের জীবনরহস্য বুঝতে পারে না, ধরতে

পারে না। এবং তা না পারলে জীবনে কোন মহৎ পরিণতিও আসে না, কোন সার্থক রূপান্তরও হয় না।···

আমার নিজের জীবনের কথায় বলতে পারি, আমি দিনে দিনে ও ধীরে ধীরে এমনি ভাবসম্পর্কের সহায়তায়ই মার্গারেটের অপরিণত অবস্থা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যার মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলাম। সে উন্নয়নটি একদিকে যেমন একটি দুর্লভ আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী ছিল, তেমনি অন্যদিকে পিতা-পুত্রীর মানস সম্পর্কেঅতি মধুর ছিল, পবিত্র ছিল। আর সে সম্বন্ধ-সূত্রের স্বীকৃতিতে স্বামীজীর জীবিতকালেই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের অগণ্য নরনারী আমাকে স্বামীজীর কন্যারূপে গ্রহণ করেছিল, তাদের একান্ত আপন জন বলে স্বীকার করেছিল।'···

সে যাই হোক, বঙ্গদেশের সরস মাটিতে, গাঙ্গেয় উপত্যকার সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ধারার মধ্যে মার্গারেটেব জীবনযাত্রার সূত্রপাত হল সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষারম্ভে। বস্তুতঃ, কলিকাতা পৌঁছাবার অব্যবহিত পরেই, মার্গারেট, মিসেস ওলিবুল এবং ভগ্নী জয়া প্রমুখ স্বামীজীর কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্যা বেলুড়ে, গঙ্গার তীরে, একটি ছোট কুটিরে, যাকে ইংরাজীতে 'কটেজ' বলে সে ধরনের বাড়ীতে বাস করেছিলেন, মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত। অধুনা যেখানে বেলুড়মঠের অগণ্য হর্মরাজি দণ্ডায়মান তাদেরই অনতিদূরে, শ্যাম-শষ্পাচ্ছাদিত একটি সমতল ভূখণ্ডে সে সুদৃশ্য, শান্ত কুটিরটি অবস্থিত ছিল। মার্গারেটের একাধিক গ্রন্থে সেই কুটির এবং সেখাকার অবিস্মরণীয় দিনগুলির অপূর্ব বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সেথায় জ্ঞানস্রোত এবং আনন্দস্রোত যেন নিত্য সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত ছিল। শান্তির প্রগাঢ়তা ছিল প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত।

অদূরে, সারিবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষের পত্রঝালরের ফাঁকে ফাঁকে

দিবসের নানা প্রহরে আলো-ছায়া বিচিত্র বর্ণে আন্দোলিত হত। আর তাদের শীর্ষে শীর্ষে নীলকণ্ঠ পাখীর কণ্ঠধ্বনি ঝঙ্কৃত হত দেবতার প্রসন্নতার মত, আশীর্বাদের মত। বড় সুন্দর ছিল মনোভাব, বড় পবিত্র ছিল পরিবেশ। আর সব কিছু জড়িয়ে অপার্থিব মাধুর্যে যেন পরিপূর্ণ ছিল সেই দিনগুলি।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো—
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।...

সবই যেন স্বর্গীয় মাধুরিমায় পরিপূর্ণ ছিল। আবার অপরাহ্ণের দিকে, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, বৃক্ষছায়া দীর্ঘতর হয়ে কুটিরের পূর্বদিকের চত্বরটিতে প্রসারিত হত, গঙ্গার তীরে অসংখ্য মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠত—তখন যেন অবর্ণনীয় এক ধ্যান-তন্ময়তা সমগ্র কুটিরটিকে গ্রাস করে ফেলত। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে 'বনরাজি-নীলা' ঘন রেখার মধ্যে, সমগ্র গ্রামখানি অবলুপ্ত হয়ে যেত।...

গ্রাম-প্রান্তের এই ছোট কুটিরটিতেই মার্গারেটের ভারতীয় জীবনের সূত্রপাত।

রামকৃষ্ণমঠ-মিশন তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং স্বামীজী স্বয়ং মঠের সদ্যোনির্মিত নিজস্ব বাটীতেই বসবাস করছেন। সুতরাং স্বামীজীর পক্ষে নিয়মিতভাবে সে কুটিরে আসা-যাওয়ায় কোন অসুবিধা ছিল না। স্বামীজী আসতেনও নিয়মিতভাবে। সে কুটিরজীবনের দৈনন্দিন কার্যসূচী অনেকটা এই ধরনের ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে, কোন কোন দিন আবার অপরাহ্ণকালেও অন্তত কিছুক্ষণ সময় স্বামীজী অবশ্য সেখানে যাপন করতেন। কোন কোন দিন আলোচনা-প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত হত। সে সব সময়ে সাধারণত কুটিরের সম্মুখস্থ অপরিসর সবুজ লনটিতে—স্মরণাতীত যুগের মত প্রাচ্য-গুরুর পদপ্রান্তে—প্রতীচ্যের বিদ্যার্থিবৃন্দ

শ্রদ্ধানতচিত্তে মণ্ডলাকারে উপবেশন করত। তারপর, এক একদিন, এক এক প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হত, উপদেশ এবং নির্দেশ প্রদত্ত হত। মনে হত, সে যেন অতীতকালের বেদ-বিদ্যালয়েরই এক আধুনিক সংস্করণ। সিদ্ধ আচার্যকে কেন্দ্র করে গুরুকুল আশ্রমেরই মত যেন এক অভিনব সাধনাশ্রম।

কোন কোনদিন অপরাহ্ণকালে, গঙ্গার বুকে নৌকাযোগেও সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন স্বামীজী।

উপরে নির্মেঘ, ঈষৎ-লোহিতাভ গোধূলি-লগ্নের আকাশ, নিম্নে প্রসন্ন-সলিলা, 'সুরেশ্বরী ভাগীরথী, কল্পলতামিব ফলদা।'

পতিতোদ্ধারিণি-জাহ্নবিগঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত ভঙ্গে।
ভীষ্ম-জননি খলু মুনিবর-কন্যে, পতিত-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে।—

সেই গঙ্গা। যুগে যুগে এমনি ভাবে সহস্র ছন্দগাথায় যিনি নিত্যবন্দিতা, পারাবার-বিহারিণী, সেই সনাতনী গঙ্গা।···

স্বামীজী মুহূর্তে গঙ্গার মহিমা-কীর্তনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। বলতেন, ভারতবর্ষের জীবনদর্শন এই পূত-সলিলা নদীটির প্রভাবে যুগে যুগে বহুভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এই নদীর সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর যে সংযোগ সে অতি নিগূঢ়, অতি নিবিড়।

এদিকে অনুকূল স্রোতে ধীরে ধীরে নৌকা এগিয়ে চলত, অদূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়া ক্রমশ দৃষ্টিপথে ধরা দিত। এক অব্যাহত স্বর্গীয় আনন্দধারায় অন্তর-বাহির শনৈঃ শনৈঃ পরিপূর্ণ হয়ে উঠত।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ রাপঃ শান্তিঃ···
বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ···

এ সুপ্রাচীন বেদমন্ত্র যেন অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস্তব হয়ে ধরা দিত।

আবার কখনো, যেদিন বাহিরের প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করত, 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অকস্মাৎ অন্ধবেগে ধেয়ে' আসত, সেদিন

মার্গারেটদের বেদ-বিদ্যালয়ের আসর আর বাইরে বসত পারত না। সেদিন আসর বসত কক্ষের অভ্যন্তরে ঈষদালোকিত একটি গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু যে অবস্থাতেই হোক আর যে কোন পরিবেশেই হোক, স্বামীজীর মুখ-নিঃসৃত নানা অমৃতকাহিনী তাদের সম্মুখে নিত্য নূতন স্বর্গদ্বার খুলে দিত। বাহ্য জগতের সর্ব কোলাহল বিস্মৃত হয়ে এক অজানিত, সূক্ষ্ম চিন্তাজগতের অপার্থিব ঐশ্বর্যে তারা তন্ময় হয়ে যেত, অভিভূত হয়ে পড়ত।...

সে-সব অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ও জীবনদর্শন—সব কিছুই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হত, বিশ্লিষ্ট হত। স্বামীজী তাঁর বহু-বিস্তৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে, স্বচ্ছ ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে সেই সব ইতিবৃত্তের উপর বিচিত্র আলোকপাত করতেন। তার ফলে এই হত যে কল্পলোকের আদর্শও যেমন একদিকে বাস্তবে মূর্ত হত, অপর দিকে স্থূল বাস্তব অভিজ্ঞতাও তেমনি মুহূর্মুহুঃ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অনুভূতি-গম্য আনন্দমণ্ডলে উন্নীত হত।

মার্গারেটের স্বকীয় উক্তিতে দেখা যায়:

'সেই সব দিনে, এমন সুদুর্লভ মুহূর্ত এসেছিল যা কখনো ভুলবার নয়, কখনো বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। এমন সব বাণী তখন আমরা শুনেছিলাম যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মর্মমূলে নিয়ত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে। অথচ, সে সকল অপার্থিব ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ বলে প্রতীত হলেও স্বামীজীর কাছে যেন অতি তুচ্ছ খেলার বিষয় ছিল, সহজ ও স্বাভাবিক জীবনচর্যার অঙ্গীভূত ছিল।

তখনকার আনন্দমুখর দিনগুলিতে এমন এক প্রেম-অভিব্যক্তি আমরা মুহূর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে-প্রেম অতি-ক্ষুদ্রকেও মহৎ করে থাকে, অতি-তুচ্ছকেও গ্রহণ করে থাকে। যে প্রেম একান্ত অজ্ঞানকেও নিবিড় আলিঙ্গনে একাত্ম করে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, প্রভাব স্বতন্ত্র। জগৎ-প্রপঞ্চের কোন

বাধা, কোন সীমা-সঙ্কীর্ণতা তার সম্মুখে মাথা উঁচু করে নেই। তার স্নিগ্ধ, অব্যাহত কিরণসম্পাতে মানস-লোকের সপ্তস্তর যেন নিত্য উদ্ভাসিত।...

বিরাট প্রতিভার সে এক বিচিত্র খেয়ালই বটে! সে খেয়ালের অদৃশ্য অথচ অপ্রতিহত পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা তখন যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এক অদ্ভুত কৌতুকের খেলা খেলেছিলাম। ক্ষণে ক্ষণে, মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলাম যেন বালরূপী ভগবান তাঁর শিশুশয্যা থেকে জাগ্রত হয়ে উঠছেন আর আমরা সেই মহাজাগরণটিকেই প্রত্যক্ষ করছি—দ্রষ্টারূপে, সাক্ষীরূপে।

...প্রারম্ভিক পর্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন,—শেষপর্যন্ত সেটি নিশ্চিতভাবেই অদ্বয়, অনন্তের বার্তায় পর্যবসিত হবে। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান যে-কোন তত্ত্ববিচারেই স্বামীজী প্রবৃত্ত হতেন সে-তত্ত্বই যে চরম অনুভূতির একটি নিদর্শন, একটি সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা—তা যেন অতি সুনিপুণ কৌশলে তিনি আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতেন। তাঁর ধ্যানসিদ্ধ জীবনের কাছে কোন জিনিষই ধর্মের এলাকা-বহির্ভূত ছিল না। তিনি বলতেন ধর্মের এলাকা সর্বব্যাপী, ধর্মের পরিধি নিত্য নিঃসীম অনন্তাভিমুখে প্রধাবিত। বন্ধনমাত্রেই তাঁর নিবিড় ঘৃণা ছিল, অপরিসীম বিতৃষ্ণা ছিল এবং বন্ধনের লৌহশৃঙ্খলকে পুষ্পাভরণে যারা রমণীয় করে তুলতে চায়, তাদের তিনি 'সাংঘাতিক লোক' বলে মনে করতেন, 'ডেন্‌জারাস মেন' বলে অভিহিত করতেন।...

এইভাবে বেলুড়ে, গঙ্গাতীরের ছোট কুটিরটিকে ঘিরে এক দিব্য পরিবেশের মধ্যে মার্গারেটের জন্য এক অভিনব শিক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন স্বামীজী।

সে শিক্ষার স্রোতধারা বহুমুখে প্রবাহিত হলেও তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ, মূল টার্গেট ছিল ভারতের জাতীয়-জীবন ও তার সর্বাবয়ব পরিচিতি। ভারতবর্ষ—ভৌগোলিক বিচারে উত্তর ও দক্ষিণের

দুই অন্তহীন নীল সীমারেখার মধ্য-ভূখণ্ডে যার অবস্থিতি; পুরাণবৃত্তে-ব্রহ্মর্ষিদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্যাবর্ত, জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি নানা পরিচয়ে যে-দেশ চিহ্নিত,—বিন্ধ্যপর্বত ও বিন্ধ্যারণ্যে উত্তর ও দক্ষিণার্ধে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে সেই দেশ কত যুগ, মন্বন্তর ধরে কত বিচিত্র চিন্তা ও সংস্কৃতিধারাকে প্রসব করেছে, পালন করেছে, বর্ধিত করেছে।

উত্তরখণ্ডে, হিমালয়ের বুকে ও সানুদেশে, নৈমিষারেণ্যে, গাঙ্গেয় উপত্যকার নানাতীর্থে জাত ও স্ফূর্ত হয়েছিল যে ঔপনিষদিক জীবন-দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যা বরুণ কর্তৃক প্রোক্ত এবং ভৃগু কর্তৃক জ্ঞাত হয়ে অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষে এসে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

'সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।'

অথবা, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বিরচিত মহাভারত, মহতী ভারতীকথা।

আবার, দক্ষিণাংশ জুড়ে—আদিকবির অমর রচনা বাল্মীকি-রামায়ণের অনবদ্য কালজয়ী মহাপ্রকাশ। অক্ষয় সে-মহাকাব্য মহাকালের সঙ্গে সমধারায় অনন্ত অভিমুখে নিত্য প্রবাহিত। মহাভারতেরই মত এ মহাকাব্যও

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাসন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমাং ভূবি।

পরবর্তীকালে, বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধোত্তর যুগে, কিংবা তারও পরে মুসলমান আমলে, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত গৌরবের দিনে এবং ইংরাজ শাসনাধীনে—ভারতবর্ষের জীবন-বিচিত্রা পতন-অভ্যুদয়ের ঋজু-কুটিল পথে যেভাবে অগ্রসর হয়েছে—তারই যথাযথ পরিচয় এবং বিশ্লেষণ ছিল স্বামীজীর মূল প্রতিপাদ্য, আশু এবং চরম লক্ষ্য। সেই জন্য, ভারতবর্ষের সাধনা ও আধ্যাত্মিক প্রয়াস, তাঁর অভিলাষ ও সঙ্কল্প যুগে যুগে যে ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে, যে ভাবে বাস্তব ভূমিতে

রূপায়িত হয়েছে, মুখ্যতঃ তারই নিখুঁত বিচার থাকত, বিশ্লেষণ থাকত স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে, তাঁর শিক্ষা-বিকিরণের ধারায়। এক একসময় এক একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রতি, এক একটি যুগ-সীমার প্রতি তাঁর অঙ্গুলি যেন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হত। মার্গারেটের জিজ্ঞাসু ও পিপাসু দৃষ্টির কাছে সে ইঙ্গিত কখনও ব্যর্থ হত না। বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে লক্ষ্য করতেন মার্গারেট যে লণ্ডনের প্রথম ও দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকালীন দিনগুলির সঙ্গে একালের দিনগুলির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য যেন বর্তমান রয়েছে। সেকালে, ঔপনিষদিক জীবনচর্যার কথাই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু, অন্য সব ছিল আনুষঙ্গিক উক্তিমাত্র, পরিপূরক তথ্য মাত্র।

'Know the nature to be Maya. And the mind, the ruler of this Maya, as the Lord Himself.···The Maya of the Vedanta, in its latest development, is a simple statement of facts—which we are, and what we see around us'···

যস্মাৎ পরং না পরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।···

এই ছিল প্রতিপাদ্য।

কিন্তু বেলুড়ের কুটিরবাসের দিনগুলিতে উত্তর যুগের ইতিহাস-অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের বহুবিচিত্র আখ্যায়িকাই যেন সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। গঙ্গাতীরের প্রসন্নপ্রভাত আর গোধূলি-মলিন সন্ধ্যাগুলি যেন ছিল তাদেরই একান্ত উপযোগী পটভূমি।···

সে পটভূমিতে—আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি দুরূহ অথবা অরুচিকর, প্রাচীন ভারতবর্ষের সেইসব দুর্বোধ এবং জটিল কাহিনীই বিশেষভাবে স্বামীজী বর্ণনা করতেন। শতযুগ মন্বন্তর পূর্বে ভারতবর্ষে যে জীবন-

ধারা প্রচলিত ছিল, যে জীবনাদর্শ গৃহীত ছিল—আধুনিক কালের পাশ্চাত্য মনের কাছে সেগুলি বহুলাংশে রহস্যময় হবে, অবাস্তব বলে প্রতিভাত হবে, একথা স্বামীজী জানতেন। কিন্তু তথাপি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলির যথাযথ উপস্থাপনেই তিনি বিশেষ ভাবে অগ্রসর হতেন। কঠিনকে নমনীয় করে দেখাবার কোন চেষ্টা তিনি করতেন না। সকল প্রসঙ্গকেই জড়িয়ে থাকত ভারতবর্ষ, সকল আলোচনার মধ্যেই অনুস্যূত থাকত ভারতবর্ষের জন্য এক ঐকান্তিক মর্মস্পর্শী আবেদন।

এমনি আলোচনাসূত্রে একদিন এক নিস্তব্ধ সায়াহ্নে, গঙ্গাতীরের এই কুটির প্রাঙ্গণেই মার্গারেটকে বলেছিলেন, পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত পত্রগুলির পুনরুক্তি করেই বলেছিলেন :

'মার্গারেট, শেষপর্যন্ত এই প্রাচীন, তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষের কোলেই তুমি উপস্থিত হয়েছ। এখন, এর পরবর্তী পর্যায়ে, যদি এ দেশের সেবাকার্যে সত্যই তোমাকে আত্মোৎসর্গ করতে হয়ে, যদি এই দীন-দরিদ্র ভারতভূমিকেই একান্ত আপন বলে তুমি গ্রহণ করতে চাও—তবে সর্বভাবে এর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে, একাত্ম হয়ে তোমাকে মিশে যেতে হবে। ভালো-মন্দে মিশিয়ে, দোষে-গুণে জড়িয়ে এদেশ ঠিক যেমনটি তেমনটি জেনেই একে সমগ্র অন্তর দিয়ে, মন-প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসতে হবে।...

ভাবে ও চিন্তায়, পোষাকে ও পরিচ্ছদে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে। সুপ্রাচীন এই বিশাল উপমহাদেশই এখন থেকে হবে তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি। আমার এ দেশের নারীশিক্ষার দুর্গম পথে যদি অগ্রসর হতে চাও, তবে হিন্দু বিধবার নিষ্ঠাপূত ব্রহ্মচারিণী-জীবন তোমাকে যাপন করতে হবে। প্রাতনিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুরমণীর রক্তে সতীত্বের যে নির্মল আদর্শ সংস্কারগত ভাবে নিহিত, সে ভাস্বর আদর্শটি তোমার জীবনেও দেদীপ্যমান হওয়া চাই,

শোভাময় হওয়া চাই।' এ প্রসঙ্গেই সীতার পুণ্য জীবনকথাও উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজী—বিবৃত করেছিলেন শবরীর বিচিত্র করুণ আখ্যায়িকা।...

জন্ম-দুঃখিনা জনকনন্দিনীর অনবদ্য চরিতগাথা স্বামীজীর প্রাণের বস্তু ছিল চিরকাল। তিনি বলতেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে নারীচরিত্রের এমন সর্বতোভদ্র মহিমা, এমন অমিতগৌরব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্ততঃ, আমি খুঁজে পাইনি। প্রেমে ও মাধুর্যে, ত্যাগে ও শুচিতায়, নীরব সহনশীলতা এবং প্রশান্ত ঔদার্যে—এমন পূর্ণ, এমন অকলঙ্ক চরিত্র কোন দেশের কোন কবি বা সাহিত্যিকের ধ্যান-কল্পনায় এমন ভাবে আর ধরা পড়েনি, ছন্দে-চিত্রে রূপায়িত হওয়া তো বহু দূরের কথা।

আদিকবি মহামুনি বাল্মীকি—সীতার পাতাল প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় সেই মহীয়সী নারীর চরিতমহিমা বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন:

আমি প্রচেতার দশমপুত্র বাল্মীকি। বহু সহস্রবৎসর বহু ব্রতানুষ্ঠান করেছি, কঠোরতম তপস্যা করেছি। কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুগমন করেছি, সত্যানুশাসন পালন করেছি।

মৈথিলী যদি সর্বভাবে অপাপবিদ্ধা না হন, যদি শুচি থেকেও তাঁর শুচিতা, অগ্নি থেকেও তাঁর চরিত-প্রভা উজ্জ্বলতর না হয় তবে আমার তপস্যার যাবতীয় ফল ব্যর্থ হবে। তাদের ফলভোগ থেকে আমি সর্বথা বঞ্চিত হব। আমি বুদ্ধিদ্বারা, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা সীতাকে শুদ্ধচারিণী, পতিব্রতা এবং একান্ত ধর্মশীলা বলে অবগত আছি। এই বিশালবিশ্বে এঁর সমতুল্য কেউ নেই। পূর্বেও কেউ ছিল না, ভবিষ্যতেও কেউ হবে না। সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বরূপে ইনি অনন্যা, ইনি অতুলনীয়া—।'

এমনি কত মধুর উপাখ্যান, কত বিচিত্র চরিত্র-মহিমায় সেকালের দিনগুলি অক্ষয় হয়ে উঠেছিল।

আবার, শবরীর অনবদ্য কাহিনীটিও একালেই মার্গারেটকে শুনিয়েছিলেন স্বামীজী।···বহুদিন-বিস্মৃত মহাকাব্যের সেই মহতী কথা স্বামীজীর কণ্ঠে যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বামীজী বলেছিলেন :

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে শবরীর অপার্থিব জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সীতাহরণের অব্যবহিত পরে—জনস্থান পরিত্যাগ করে ঋষ্যমূক পর্বতাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন দুই ভাই, শ্রীরামচন্দ্র আর তাঁর চির-বিশ্বস্ত অনুজ লক্ষ্মণ। পথে প্রকৃতির রম্যভূমি, পুরাণকথিত পম্পা সরোবর অবস্থিত ছিল। পম্পার পশ্চিমতীরেই ছিল শবরীর পবিত্র আশ্রম, বহু তপশ্চর্যার পীঠস্থলী। কবন্ধের- নির্দেশে এবং নির্বন্ধাতিশয়েই সে আশ্রমে তাঁরা গমন করেছিলেন।

মহাকবি তুলসীদাস তদীয় 'রামচরিত মানস' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ করে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা গান করেছিলেন,—

বিনষ্ট সীতান্বেষক রাম।
গৃধ্রাধিপগতিদায়ক রাম।
শবরীদত্ত ফলাশন রাম।
কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম। ইত্যাদি···

শ্রীরামচন্দ্র যখন সে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন বর্ষা অপগত হয়েছে। নির্মেঘ আকাশে শরতের প্রসন্নতা সূচিত হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর সর্বাঙ্গ ফলে ফুলে, পত্রগুচ্ছে শোভান্বিত হয়ে উঠেছে। পত্নী-বিরহে একান্ত শোকার্ত হযেও শ্রীরাম পম্পা এবং পম্পার তটপ্রদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :—

সৌমিত্রি, দেখ এই পুষ্পাকীর্ণ বনভূমির অবাচ্য সৌন্দর্যমহিমা। ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি যেমন তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর বুকে অকৃপণ ধারে জলবর্ষণ করে থাকে এই বনপ্রদেশের বৃক্ষরাজিও তেমনি নিয়ত অজস্র

পুষ্পবর্ষণ করছে। কত ফুল মাটিতে ঝরে গেছে দেখ। কতফুল বৃন্তচ্যুত হয়ে আছে,—এইবার মাটিতে ঝরে পড়বে। আবার, অসংখ্য ফুল এখনও বৃন্তলগ্ন হয়ে বৃক্ষসমূহেরই শোভা হয়ে ফুটে আছে। মৃদু বায়ুপ্রবাহে এদের কী বিচিত্র সঞ্চালন! মনে হচ্ছে ধীর সমীরে, পম্পাতীরে—নিসর্গের এক অমৃত-মধুর খেলা চলছে, লীলা চলছে।

পশ্য রূপানি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজন্তাং পুষ্পবর্ষানি বর্ষং তোয়মুচামিব।
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্।...

এমনি ছিল পম্পাসরোবরের তটভূমি। নির্জন প্রকৃতির সেই লীলাক্ষেত্রে অতি-বৃদ্ধা তাপসী শবরী তখনো তপস্যা-নিরতা ছিলেন। রাম তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। অতি বিনম্রবাক্যে তুষ্ট করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রশ্ন। জানতে চেয়েছিলেন,...তাঁর তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে কিনা, গুরুসেবা-ব্রত সার্থক হয়েছে কিনা। মনে পরিতৃপ্ত-আনন্দ সঞ্জাত হয়েছে কিনা।

তদুত্তরে, সেদিন বৃদ্ধা শবরী শ্রীরামচন্দ্রের পুরোভাগে এসে ব্যক্ত করেছিলেন জীবনের চরম আকুতি, শেষ করুণ নিবেদন:

অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধি স্তব সন্দর্শনান্ময়া।
অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ॥
অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।
ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ।
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়াঁল্লোকাং স্তৎপ্রসাদারিন্দম॥

আজ তোমার দর্শনলাভে আমার জন্ম সার্থক হল। তপস্যা পূর্ণ হল, গুরুসেবা সফল হয়ে গেল! হে রাম, তুমি এক, তুমি অনন্ত, তোমার পূজা করে আজ আমি স্বর্গলাভ করব। হে মানদ, তোমার

প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে আমি পবিত্র হয়েছি, অক্ষয়লোক লাভ করবার অধিকার অর্জন করেছি।...

শুধু এই নয়। শবরী আরও বলেছিলেন,—হে লোকেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র, আমার আরও একটি নিবেদন শ্রবণ কর। যে সকল তপস্বীদের আমি সেবা করতাম—তুমি চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁরা দিব্যবিমানে স্বর্গলোকে প্রস্থান করেছেন। তাঁদের মুখেই আমি শুনেছিলাম যে এই পুণ্য আশ্রমভূমিতে অচিরে তোমার শুভাগমন হবে এবং তোমাদের দুইভাইকে সম্বর্ধনা করলেই দেববাঞ্ছিত অক্ষয়লোক আমি লাভ করব।

ঐ দেখ রাম, সেই বহুখ্যাত, নিবিড় মাতঙ্গবন। ঘনবিন্যস্ত বিশাল মহীরুহে সমাকীর্ণ এই বনস্থল—অসংখ্য মৃগপক্ষীর আবাসভূমি। এখানেই শুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণ যথাবিহিতভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করে অগ্নিতে দেহ বিসর্জন করেছিলেন। ঐ সেই 'প্রত্যকস্থলী' নামে পুরাকথিত প্রসিদ্ধ পুষ্পবেদী। এরই উপব তাঁরা পুষ্পোপহার প্রদান করতেন। তাঁদেরই তপস্যা প্রভাবে এই ভূখণ্ডে সপ্তসমুদ্র উপস্থিত হয়েছিল। স্নান সমাপন করে যে বৃক্ষশাখে তাঁরা বল্কল রক্ষা করতেন, যে পুষ্পসম্ভারে পূজা নিবেদন করতেন—তারা এখনো সজীব রয়েছে, অম্লান রয়েছে, দেখ।...

রাম, আজ তুমি এই সুপ্রাচীন পুণ্য অরণ্যভূমি দর্শন করলে। আমার অশেষ সুকৃতিবশে আমার নিবেদনও শ্রবণ করলে, এখন প্রসন্ন হয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কর, আমি দেহত্যাগ করব।'

তখন রামচন্দ্র শবরীদত্ত ফুল, ফল প্রভৃতি দুই করপুটভরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে অভীষ্টলোকে প্রস্থান করবার অনুমতি প্রদান করে ধন্য করেছিলেন, কৃতার্থ করেছিলেন।

অতীতযুগের এই সব অপূর্বকাহিনী ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদরূপে গৃহীত। কালের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করেও যুগে যুগে এ-দেশের সর্বপর্যায়ের, সর্ববয়সের নর-নারীকে এরা মুগ্ধ করেছে,

অনুপ্রাণিত করেছে। তাই এদেরই মধ্য দিয়ে যথার্থ ভারতবর্ষকে চেনা যায়, ভারতাত্মার পুণ্যগৌরব উপলব্ধি করা যায়।...

মার্গারেট যেন এদের নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, এদের নিগূঢ় তাৎপর্য ধ্যান করে, মনন করে।...

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে, অন্য মানসিক অবস্থায় কখনো কখনো ভক্তি-প্রসঙ্গে উপস্থিত হতেন স্বামীজী। তখন ভক্তির আবেগে ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে এককালে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন,—যেমন যেত প্রাচীন বা মধ্যযুগের প্রেম-পাগল ভক্ত সাধকগণ। আর সেই সব দুর্লভ মুহূর্তে আবেশ-বিহ্বল তাঁর কণ্ঠ থেকে স্বতই উদ্গীত হত কূল-প্লাবী, মর্মস্পর্শী সঙ্গীতনির্ঝর, ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার কোমলাংশের পরিচয় বহন করে।...স্বামীজী গাইতেন...

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বল্‌ছেরে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই
কারু যেতে মানা নাই।
ডাক্‌ছে বাঁশী—আয় পিপাসী, জয় রাধে নাম গান করে।'

অথবা,

পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়,
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি বাঁকানয়ন গোপীর মন মজে,
পাণ্ডব-সখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয়হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়। ইত্যাদি...

সে সব স্বর্গীয় সঙ্গীত, সে সব ধ্যানময় সুর-সাধনা—শ্রোতৃবর্গের কানের ভিতর দিয়ে মুহূর্তে মর্মমূলে প্রবেশ করত এবং সঙ্গে সঙ্গে

এক অনির্বচনীয় আনন্দশিহরণ জাগ্রত করে দিত। অবিস্মরণীয় তাদের স্মৃতি, অব্যর্থ তাদের পুণ্যপরিণাম। আবার, মার্গারেটের কাছে তারা ছিল যেন অক্ষয় মূর্ছনার মত, অনন্ত জীবনেরই মধুর, অথচ, অপ্রতিরোধ্য আবাহনের মত।

মার্গারেট বলতেন,—সে সব সুদুর্লভ মুহূর্তগুলিতে স্বামীজীর অপার্থিব ভাবরাশি তাঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে যেত এবং তার ফলে, সে-সময়ের জন্য উর্জিত প্রেমের এমন উদ্দীপনা তাঁরা লাভ করতেন, যা কোন কারণে নির্বাপিত হত না, কোন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায়ও সংক্ষুব্ধ হত না। কারণ যাঁকে অবলম্বন করে এদের বহিঃপ্রকাশ তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ও অনিবার্য। নিবেদিতার ভাষায়ই বলছি ঃ

"One form and back and forth across our tiny stage ; one voice compassed all the players ; and the play that was acted before us was the love of the soul for God !···Till we, too caught the kindling, and loved for the moment with a fire that the rushing river could not put out nor the hurricane disturb.

Shall many, waters quench love, or the floods overwhelm it ?···

And before Prometheus left us, we knelt before him together and he blest us all."

এমনিভাবে দিনে দিনে, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমার্ধের দুই ভিন্নমুখী চিন্তা ও সংস্কৃতিধারার সার্থক সমন্বয়ের জন্য এবং তারই ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সেবাব্রতে মার্গারেটকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করবার জন্য তার উর্বর চিত্তভূমিতে একটি সুপরিসর আয়তক্ষেত্র শনৈঃ শনৈঃ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন এবং যথাকালে নিজ সক্ষম দক্ষিণহস্তের

সুনিপুণ পরিচালনায় সারগর্ভ অক্ষয় বীজও সেথায় বপন করেছিলেন। পরে, সে বীজকোষ থেকে শুধু যে দৃঢ়মূল ও উর্ধ্বশীর্ষ একটি অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল তাই নয়, পরন্তু ফুলে, ফলে ও পর্যাপ্ত পত্রগুচ্ছে-সমৃদ্ধ এক বৃহদাকৃতি মহীরুহে পরিণতি লাভ করে সে বীজ এদেশের সমাজক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাবও বিস্তার করেছিল। অবশ্য, সেটি অনেক পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের দীর্ঘ, প্রতীক্ষারত দিনগুলিতে মার্গারেটের জীবনে একটি কঠিন সংকট উপস্থিত হয়েছিল এবং তার চরম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল নৈনিতাল-আলমোড়ার নিভৃত পরিবেশে, মার্গারেটের আত্মনিবেদনের ঐকান্তিক প্রয়াসের পটভূমিতে। বলা বাহুল্য, আচার্য এবং শিষ্যার, পিতা এবং পুত্রীর ভাবগত সংঘর্ষ নিয়েই তার উদ্ভব ও জটিলতা।

কথাটি একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

জীব-বিজ্ঞানের মতে মাতৃগর্ভের দশমাসের জঠর জীবনের যে-কাল সেটি জন্ম-প্রস্তুতির পূর্ণকাল নয়। পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হবার পর আরও কিছুদিন সে প্রস্তুতির কাল প্রসারিত থাকে। তারপর প্রসারিত-কালের অসহায়তার বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করে নবজাতকের জীবনযাত্রা শুরু হয়। জৈব প্রকৃতির বাস্তব ভূমিতে এ-নিয়ম অপ্রতিরোধ্য, এ-নিয়ম অলঙ্ঘ্য। আর সম্ভবতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ম-প্রস্তুতির ক্রমবিকাশেও এ নিয়মের ক্রিয়া আছে, বিস্তার আছে।

তাই, ভাবগত যে সংঘর্ষের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তা কতকাংশে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত হলেও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ছিল না এবং মার্গারেটের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাছে সে রহস্য অজ্ঞাত ছিল না।…যথাস্থানে সে ইতিহাসও আমরা বিবৃত করব। এখানে প্রসঙ্গত সে সংকটের উল্লেখমাত্র করেই বেলুড়ের দিনগুলির কথায়

আমরা ফিরে যাচ্ছি।

বড় শান্তিময়, মধুময় এবং মহাজীবনের অমেয় প্রভাবে জ্যোতির্ময় ছিল সে দিনগুলি। তখন সর্বদাই মনে হত যেন,

এক মহাযোগী করুণা কাতর—
'পীড়িত ভুবন লাগি
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ নিখিল লুপ্ত
অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী,
দেখিছেন বিশ্বের মুক্তিপথ।'

শ্রুতিপথে ক্ষণে ক্ষণেই ভেসে আসত ঃ

'সভ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি—
বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

এমনি বিচিত্র অনুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা বেলুড়ের পর্ণকুটিরবাসের দিনগুলির সঙ্গে যেন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

ইতিমধ্যে শীত অপগত হল। বাংলার আকাশে ও শ্যাম-সমতল অঙ্গটিতে বসন্তের চঞ্চলতা দেখা দিল, রূপান্তর সূচিত হল। সেই নৈসর্গিক রূপান্তরের মধ্যে ঐ বৎসরের মার্চমাসের শেষ দিকে, ২৫শে তারিখ, মার্গারেটকে দীক্ষা প্রদান করলেন স্বামীজী।—

সেদিনটি ছিল শুক্রবার। প্রভাতে মঠের মন্দির-প্রকোষ্ঠে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর সে দীক্ষাকার্য উদ্‌যাপিত হয়েছিল। মার্গারেটের দেহ-মন-প্রাণ, তার জীবন-যৌবন-কামনা, তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, এক কথায় তার সর্বাবয়ব সত্তাটিকে, দুই করপুটভরে দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন করে তদীয় দীক্ষাগুরু তার নূতন নামকরণ করলেন নিবেদিতা, ভারত-ভগিনী নিবেদিতা।…

সেদিন, দীক্ষার সেই শুভ-মুহূর্তে আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা মার্গারেটের নিঃশেষ বিলুপ্তি হল, আর তার দেহ-মনের সকল দুর্লভ উপকরণ নিয়ে নিষ্কম্প হোম-শিখাটির মত উর্দ্ধমুখে দেখা দিল,—

ভারত-মাতার হস্তে
অর্ঘ্যরূপে চিরসমর্পিতা,
শুচিস্মিতা, ভগ্নী নিবেদিতা।—

ভারতবর্ষের স্বকীয়তা থেকে, তার নিজ উর্বর মাটি থেকে উদ্ভূত হলেই হয়ত স্বাভাবিক হত, আপাতদৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয়ও হত। কিন্তু দীর্ঘ পরাধীনতার বিষ-জর্জর সামাজিক ঊষরতায় তেমন সতেজ ও সম্ভাবনাময় অঙ্কুরের উদ্গম সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, ভাবজগতের সমরসভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সমন্বয়েরও সে-ই ছিল অনুকূল উষাকাল।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।

ঋগ্বেদের এ শাশ্বতমন্ত্রের বাস্তব রূপায়নের সেই ছিল শুভারম্ভের যুগ। স্বামীজী সম্যক অবগত ছিলেন সে রহস্য। তাই স্বাধীন দেশের সরস মাটি থেকেই এ অনাঘ্রাত পুষ্প-কোরকটিকে আহরণ করে তিনি একদিকে যেমন দেশমাতৃকার অলক্তরাগ-রঞ্জিত পাদযুগে তাকে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে এক অপার্থিব মহাপ্রেমের সুধানিঃস্যন্দিনী ধারায় শুচিস্নাত করে তাকে কন্যারূপে ও কল্যাণী নারীরূপে পরম সার্থকতা দান করেছিলেন। অবশ্য নিবেদিতার কাছে সে তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল। তবে, তাঁর দিক থেকেও বলা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-বহ্নির প্রখর আলো ও উত্তাপ লাভ করে তার হৃদয়কুসুমটিও অভাবনীয় বিকাশে সার্থক হয়েছিল এবং এদেশের সমাজে ও সাধনায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে সে বিকাশের সৌন্দর্য-সুষমা তিলে তিলে সঞ্চারিত করে নিজ আত্মোৎসর্গকে সে পূর্ণ করেছিল, মহিমান্বিত করেছিল। সে আত্মোৎসর্গের অসামান্যতা লক্ষ্য করেই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন:

'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে নিবেদিতার

নিজের মধ্যে যেন কোন বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পন করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।'—ইত্যাদি···

সে যাই হোক, আনুষ্ঠানিক দীক্ষালাভে মার্গারেট নিবেদিতায় রূপান্তরিত হলেন। কিন্তু সে দীক্ষাদিবসের ঠিক পূর্বদিনের একটি ঘটনাও প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হবে।

নিবেদিতার ঘটনা-বহুল বিচিত্র জীবনে সেও এক অবিস্মরণীয় দিন, স্বর্ণ-লেখায়-লিখিত এক অক্ষয় স্মৃতিদিবস, দীক্ষার প্রাক্-দিবস হিসাবেও বটে, নিজ অমেয় মহিমার প্রোজ্জ্বলতায়ও বটে। ঐদিনটির বহু-বিস্তৃত প্রভাব ও প্রেরণা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাতের বিশেষ দিনটির সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

প্রত্যুত, উত্তরজীবনে সমুদ্র-মেখলা এই ভারতভূখণ্ডের সঙ্গে নিবেদিতার যে নিবিড় পরিচয় সাধিত হয়েছিল, এর ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনাদর্শের প্রকৃত মর্মকথাটি অনুধাবন করতে তিনি যে সক্ষম হয়েছিলেন, সর্বোপরি এদেশের নারী-সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তৎসেবায় সর্বথা আত্মনিয়োগ করতে তাঁর যে সামর্থ এসেছিল, ঐদিনটির অক্ষয় স্মৃতিকথার সঙ্গে তার একটি অচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে।

সে কথার বিস্তারিত আলোচনা অবশ্য আমরা যথাস্থানে করব। এখানে শুধু ঘটনাটিই বলছি।

সেদিন বৃহস্পতিবার, মার্চ মাসের ২৪ শে তারিখ। মার্গারেটের দীক্ষা হয়েছিল ২৫ শে তারিখ শুক্রবার। সে কথা পূর্বে বলেছি। শ্রীশ্রীমা সেদিন বেলুড়ের মঠ-বাটীতে শুভাগমন করবেন। সে-সংবাদ পূর্বাহ্লেই অবগত হয়েছিলেন মার্গারেট এবং সেজন্য তাঁর অধীর

আগ্রহেরও অবধি ছিলনা। মা'র অনুপম চরিতকথা অল্প অল্প তিনি শুনেছেন, কিন্তু তাঁর দর্শনলাভের সুযোগ তখনও হয়ে ওঠেনি। কাজেই, ঔৎসুক্যও ছিল যেমন প্রবল, আকাঙ্ক্ষাও ছিল তেমনি গভীর। তারপর, যথাসময়ে মা এসে যখন পৌঁছালেন, তখন সে কমনীয় দেবীমূর্তির অসামান্যতা মার্গারেটকে যেন মুহূর্তে অভিভূত করে দিল। তাঁর মনে হল—সে শ্যামল-মাধুর্যের, সে সরস-সজীবতার আর তুলনা হয় না। চকিতে, সে মাতৃ-প্রতিমার পাদমূলে নিজ অন্তরের সকল আকুতি নিঃশব্দে নিবেদন করে দিয়ে মার্গারেট মনে-প্রাণে যেন কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেল।

ভাব-ভক্তির নিরুদ্ধ আবেগে অবশ হয়ে মার্গারেট ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেছিল মাকে—যথাযথ ভারতীয় প্রথানুসারে। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল একবিন্দু করুণা লাভের প্রত্যাশা নিয়ে।···

আর মা ?

মা সেই গৌরী, দীর্ঘাঙ্গী কন্যার উজ্জ্বল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, শুচিসুন্দর মুখখানার মধ্যে ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনা লক্ষ্য করে, প্রাণভরে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কল্যাণ-কোমল হাত দু'খানি তার মস্তকে ও পৃষ্ঠে স্থাপন করে বোধহয় মনে মনে এই কামনাই ব্যক্ত করেছিলেন,—তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক, তোমার হৃদয় প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হউক। তোমার গুরুর অভীপ্সা তোমার মধ্যদিয়ে সর্বভাবে সার্থক হোক, পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করুক।···
সংজ্ঞানসূক্তের প্রার্থনারই অনুরূপ ছিল যেন সে মঙ্গলকামনা···

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

*　　*　　*

এ ঘটনার ঠিক ছয়বৎসর পরে, মিস্ ম্যাক্‌লিয়ডকে লিখিত

একখানি পত্রে এ-দিনের স্মৃতিকথার বিবৃতি প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছিলেন :

'ছয় বৎসর আগে ঠিক এই দিনটিতে আমি প্রথম শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হয়েছিলাম। সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। আর, তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ পরবর্তী শুক্রবার দিন আমার দীক্ষা হয়েছিল। আমি 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত হয়েছিলাম। কালপ্রবাহে সে মধুময় দিনগুলি কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আর তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বর্ষচক্রের পূর্ণ আবর্তনে আবার তাদের সুখ-স্মৃতিটুকু আজ আমি স্মরণ করছি। তুমিও সেদিন আমার সঙ্গে ছিলে—সে কথা তোমারও মনে আছে আশাকরি।...'

বলা বাহুল্য, মা স্বয়ং নিবেদিতাকে একান্ত আপন বলে গ্রহণ করাতে সেদিন স্বামীজীর মনেও তৃপ্তির অবধি ছিলনা।...

এরপর আবার অন্য একদিন স্বামীজীর গর্ভধারিনী জননীকে দর্শন করতেও গিয়েছিলেন নিবেদিতা। সেদিনও স্বামীজীই নিজ দুহিতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। জননী ভুবনেশ্বরী তখন বৃদ্ধা। বিশ্বগৌরব পুত্রের আপ্ত-কামা গরীয়সী মাতারূপে তিনি তখন কৃতার্থা।...

একদিন যৌবনযুগে, বীরেশ্বর শিবের কাছে যে পুত্র কামনায় তিনি ধ্যানস্থ হয়েছিলেন আজ সেই ধ্যান সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে। বরলব্ধ-পুত্র সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে তাঁকে চরিতার্থ করেছে। সেই পুত্রের মানস-কন্যা স্বভাবতঃই তাঁর স্নেহের ও সমাদরের পাত্রী। অতি প্রসন্ন অন্তরেই তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী।

এমনি ভাবে, দুই মহীয়সী লোকমাতার স্নেহ ও আশীর্বাদে সিক্ত হয়ে নিবেদিতার বিদ্যার্থিজীবনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছিল বেলুড়ে।...

কিন্তু ঠিক একালেই, বহুলাংশে প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

হয়েই, আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নিবেদিতার জীবনে। বেলুড়ের দিনগুলির কথা শেষ করবার পূর্বে প্রাসঙ্গিক হিসাবে তাদেরও একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।...

প্রথম ঘটনা,—তদানীন্তন বিদগ্ধ বঙ্গসমাজের সম্মুখে মার্গারেটের প্রথম আত্মপ্রকাশটি নিয়ে। ষ্টার থিয়েটারের প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশ্য সভায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা নিয়ে। সে সভার বক্তব্য বিষয় ছিল, 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব।' সভাপতি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং।

বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করে স্বামীজী সেদিন মার্গারেটের এইরূপ পরিচয় প্রদান করেছিলেন:

'She is the finest flower of my work in England' আমার ইংলণ্ডের কাজের সর্বোত্তম পুষ্পটি এই, এই মার্গারেট।... এরপরই দাঁড়িয়েছিলেন মার্গারেট।

সে-দিনের সেই প্রথম ভাষণ নানাদিক দিয়েই সার্থক হয়েছিল। বিষয়বস্তুতেও সে যেমন সমৃদ্ধ ছিল, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার অভিব্যক্তিতেও তেমনি মর্মস্পর্শী হয়েছিল। মার্গারেটের অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা ও শক্তি শ্রোতৃবর্গকে সেদিনই গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, প্রভাবিত করেছিল। স্বামীজী স্বয়ং অত্যন্ত প্রীতি হয়েছিলেন সেই ভাষণ শুনে এবং মার্গারেটের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন:

'এর পর মার্গারেটের কার্যশক্তি আরও বর্ধিত হবে, আরও প্রসারিত হবে। তার মহত্ত্বের কি তুলনা আছে? সে যেমনি উদার তেমনি পবিত্র। নাম, যশ বা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা থেকে সে মুক্ত। এদেশের সেবার জন্য আত্মবলি দিতেই সে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আসেনি'।—ইত্যাদি

ইতিমধ্যে, ঠিক এ-কালেই, কলিকাতা মহানগরীতে আর একটি আকস্মিক বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতার প্লেগ-মহামারীর কথা আমরা বলছি। সে মহামারীর কাহিনী আজ

অবশ্য সর্বজন বিদিত। কিন্তু সেদিন, নিবেদিতার কাছে সে মহামারী এক বিচিত্র মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল, এক দৈব-নির্দিষ্ট ঘটনারূপে উপস্থিত হয়েছিল।

স্বামীজীর কাছে দীক্ষিতা হয়ে নিবেদিতা তখন কর্মযোগের দুর্গম পথে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে, সবেমাত্র তখন তাঁর সাধ্যবস্তুতে পরিণত হতে চলেছে এই বাণী—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

ঠিক সে-সময়ই সে দুরন্ত কালব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিল। সুতরাং, নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে সে ঘটনার একটি নিগূঢ় কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল বৈকি?…

স্বামীজী তখন দার্জিলিংএ। প্লেগের সংবাদ পেয়েই তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং মহামারীর নিরসন কল্পে সেবাকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতাও অপেক্ষা করেছিলেন শুদ্ধমাত্র গুরুর নির্দেশের জন্য এবং সে নির্দেশ লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই প্লেগ-নিবারণকার্যে সর্বাংশে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বামীজীর নূতন যে কর্মযোগ, 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা', সে কর্মযোগে এভাবেই নিবেদিতার প্রথম এবং প্রত্যক্ষ আত্মনিবেদন।

সেদিন, বহুকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজের কাছে নিবেদিতার দৃষ্টান্তটি যেন এক নূতন শিক্ষা ছিল, এক অপ্রত্যাশিত অনুপ্রেরণা ছিল। নিবেদিতার অক্লান্ত ও নির্ভীক সেবিকামূর্তি সকলের চক্ষে সত্যই এক বিস্ময়ের মত প্রতিভাত হয়েছিল। মনে হয়েছিল, তেমন দৃশ্য বহুদিন দেখা হয় নি, বহুকালের অভিজ্ঞতায় আসে নি।…

প্লেগে আক্রান্ত অপরিচ্ছন্ন পল্লীর পথে পথে তখন স্তূপীকৃত

আবর্জনা। কাঁচা নর্দমাগুলিতে বিষাক্ত পাঁক ও ক্লেদ জমে আছে মাসাবধি কাল ধরে। আর তারই মধ্যে অকস্মাৎ দেখা গেল এক বিদেশিনী নারী সম্মার্জনী হস্তে আবর্জনা অপসারিত করছেন, বুরুষ দিয়ে ঠেলে ঠেলে নর্দমার বদ্ধ ক্লেদ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। তাঁর দীর্ঘ, ঋজু দেহটিকে ঘিরে এক অনমনীয় দৃঢ়তা। গৌরবর্ণ মুখখানিতে অনাবিল এক প্রসন্ন হাসি। মৃত্যু-আতঙ্কে পলায়নপর কলিকাতার নাগরিকদের কাছে সে-দৃশ্য এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার ছিল বৈকি ? ৺যদুনাথ সরকার, যাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পরে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব, তখন এইরূপ লিখেছিলেন ঃ

'১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলকাতার সে কি আতঙ্ক! সে মহামারীর সঙ্গে কলকাতার সহরবাসীর কোন পরিচয় ছিল না। কলকাতার রাস্তা ঘাটের আবর্জনা সাফ করবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠেছিল। তারপর একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখলাম ঝাড়ু এবং কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করতে নেমেছেন। তাঁর সে দৃষ্টান্তে লজ্জা বোধ করে অবশেষে বাগবাজার পল্লীর যুবকরাও ঝাড়ু হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। পরে শুনলাম ঐ বিদেশিনীই ভগ্নী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ এঁকে লণ্ডন থেকে নিয়ে এসেছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বনের প্রথম পাঠ আমরা এই ভাবে ভগ্নী নিবেদিতার নিকট থেকেই লাভ করেছিলাম।'

স্বামীজী নিজেই খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলেন। নিবেদিতার নির্ভীকতা ও নিষ্ঠার কথা তিনি জানতেন কিন্তু তাদের পরিমাণ যে কত সেটা হয়ত সম্যক জানতেন না। আজ তাই নিবেদিতার সাহসের দুর্জয়তা আর তাঁর নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে তিনি আনন্দ এবং বিস্ময় দুই-ই যুগপৎ অনুভব করেছিলেন।

নিজ শিষ্যস্থানীয় কোন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে এমন কথাও বলেছিলেন,—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও এদেশের সেবায়

নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিল, দিতে পারল। আর তোরা, এদেশের সন্তান হয়েও সেটা পেরে উঠলি না!'

স্বামীজীর মুখের সে উক্তি নিরর্থক ছিল না। প্লেগের দিনের দু'একটি বিশেষ ঘটনা অনুধাবন করলেই সেটি উপলব্ধি করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ছোট কাহিনী উল্লেখ করছি। কাহিনীটি অবশ্য নিবেদিতার একাধিক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।...

বাগবাজার অঞ্চলে প্লেগ তখন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। গৃহে গৃহে বাহু প্রসারিত করে প্রবেশ করছে মৃত্যু। এমনি সময় একদিন রোগাক্রান্ত একটি অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে জীর্ণ, প্রায়ান্ধকার এক কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন নিবেদিতা। এক দরিদ্র প্রৌঢ়া বিধবা তার একটি মাত্র সন্তানকে নিয়ে সে কুটিরে বাস করত। আজ সেই শিশু সন্তানটিই প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে পূর্বাহ্ণে সংবাদ পেয়েই নিবেদিতা প্রবেশ করেছিলেন ঐ কুটিরে।

কুটিরে প্রবেশ করে তিনি দেখেছিলেন,—স্যাঁতস্যাঁতে মেঝের একাংশে অতি অপরিচ্ছন্ন একটি জীর্ণ শয্যার উপর একেবারে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে সন্তানটি। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন অনন্তকালের মহানিদ্রায় সে অভিভূত, যেন মৃত্যুপথের এক অসহায় যাত্রী সে।...

নিবেদিতা প্রথমে যথাসম্ভব গৃহটির সংস্কার সাধন করলেন এবং তারপর নিজহস্তে শিশুর শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করলেন। ক্ষীণদেহ জননীর আর সে শক্তিই ছিল না। দু'দিন পর নিবেদিতার ক্রোড়েই শিশুটির মৃত্যু হয়। মৃত্যু এবং ব্যাধির অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যে নিবেদিতাকেই আপন জননী জ্ঞানে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে—'মা,' 'মা' সম্বোধন করে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। মৃত্যুর পূর্বদিনও নিবেদিতাকেই মা মনে করে 'মা' ডেকে তাঁর হাতখানি স্পর্শ করে সে যেন পরম শান্তি বোধ করেছিল। নিবেদিতা সেই নিষ্পাপ, মৃত্যু-পথযাত্রী শিশুর মর্মস্পর্শী আবেদনে এককালে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। অন্তর্বেদনার তাঁর আর পরিসীমা ছিল না।...

নিজ গ্রন্থে এ-কাহিনীর উল্লেখ করে বালকের জননীর কাছে নিজ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে লিখেছিলেন উত্তরকালে,…

'Sweet unknown mother forgive me these gifts of love, that rent the veil from a graciousness so perfect, an adoratian so deep.'

আজ বহুদিনের ব্যবধানে, বাংলার কীটদষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দাঁড়িয়ে সে স্বর্গীয় ভাবটির মধ্যে যে করুণ আবেদন নিহিত, তা যেন আমরা আর সম্যক উপলব্ধি করতেও ভরসা করি না। কারণ, স্বামীজীর সেবাধর্মের ও স্বাদেশিকতার যে গুরু উত্তরাধিকার বহন করে নিবেদিতা সার্থক-নামা—সে উত্তরাধিকার আমাদের জীবনে, আমাদের কর্মে ও প্রয়াসে আমরা আর রক্ষা করতে পারিনি। কাজেই, কল্পনার সহায়তায় সে সকল বিচিত্র সেবাব্রতের কাহিনী, সে সব গভীর সমবেদনার ইতিহাস—ঠিক ঠিক বিবৃত করাও যেমন আমাদের পক্ষে আর সহজ হয় না, তাদের তাৎপর্য উপলব্ধিও তেমনি সম্ভব হয় না। তথাপি, নিবেদিতার চরিতকথায় সে-সব বিগত দিনের অনুপম স্মৃতিকাহিনী আমরা আলোচনা করি, অনুধাবন করতে প্রয়াসী হই—কারণ, শুদ্ধমাত্র নিবেদিতার ক্রম-অভিব্যক্তির পরিচায়ক হিসাবেই নয়, তদানীন্তন বাংলার সামাজিক ও নাগরিক জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রথম, এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ঘটনা হিসাবেও এদের মূল্য অপরিমেয়।

এদিকে, বেলুড়ের গঙ্গাতীরের কুটির-জীবনের তখন প্রায় সমাপ্তি-কাল উপস্থিত হয়েছে। কারণ প্লেগ-আতঙ্ক প্রশমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী, নিবেদিতাকে এবং আরও কয়েকজন শিষ্য-ভক্তদের নিয়ে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হবেন স্থির করেছিলেন। নিবেদিতার স্মৃতিকথায়ও আছে :

'The plague passed away, and those happy days of

Belur with it, and the time came that we shall go'…

বস্তুতঃ, বেলুড়ের শিক্ষাকালের সমাপ্তি সূচীত করেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের একটি রহস্যঘন আহ্বান যেন স্বামীজীর ঐকান্তিক ইচ্ছার মধ্য দিয়েই সহসা নিবেদিতার কর্ণে এসে পৌঁচেছিল। সে এক গম্ভীর আহ্বান,—হিমালয়ের বক্ষ থেকে, অসংখ্য স্মৃতি-বিজড়িত তীর্থভূমি থেকে, আর যাঁরা নানা-যুগের নানা ধর্ম-সাধনার পথিকৃৎ তাঁদের পদধূলিপূত পীঠস্থান থেকে।—

আচার্যদেবের অন্তরের অভিলাষ যেন একালে এ-ভাবেই তাঁর মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ঃ

'প্রাচীন এ উপমহাদেশের অতীত আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে এর জীবনদর্শনের পূর্ণ তাৎপর্য তুমি উপলব্ধি কর। আর তারই সূত্রানুসরণে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হও। পূর্ণ হও, ধন্য হও।

ঐ দেখ হর-পার্বতীর চিরন্তন লীলাভূমি, ঐ হিমশীর্ষ হিমগিরি—

'কঠিন প্রস্তর কলেবর
মহান-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হের তার অঙ্গে অঙ্গে একি লীলা করেছে বেষ্টন,
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল-নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামল শোভা নিত্য নব পল্লবে কুসুমে
ছায়া রৌদ্র মেঘের খেলায়।'—

চল, এই ভারত-তীর্থের মহা-পরিক্রমায় এগিয়ে চল।

চার

নৈনীতাল ও আলমোড়া।

কিঞ্চিদধিক চারমাসকাল বেলুড়ে, গঙ্গাতীরে এক অপার্থিব জীবন যাপন করে মার্গারেট প্রমুখ স্বামীজীর শিষ্য-ভক্তগণ উত্তরভারতের তীর্থ দর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। পূর্বাধ্যায়ে সে-কথা আমরা বিবৃত করেছি।

সুতরাং তীর্থযাত্রার বিশেষ দিনটি থেকেই বর্তমান অধ্যায়ের সূচনা।···

সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে।

তীর্থযাত্রার সেই ছিল পুণ্যদিন। সেদিন, এক বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া রেলস্টেশন থেকে যাত্রা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, সে ভক্ত-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। আর ছিলেন ধীরামাতা ও জয়া নাম্নী পাশ্চাত্য মহিলাদ্বয় এবং আরও কতিপয় অনুরাগী ভক্ত ও গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দ।—

স্বামীজীর এবারের তীর্থযাত্রার পশ্চাতে অবশ্য কয়েকটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল, লক্ষ্য ছিল। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিনের বিশ্রামহীন কর্মানুষ্ঠানের পর চির-আকাঙ্ক্ষিত হিমালয়ের শ্যামল অঙ্কটিতে ধ্যানস্থ হবেন, এ বাসনা স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগ্রত হলেও সেটিই এ-যাত্রায় স্বামীজীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আর একটি। বেলুড়ে, ভাগীরথী তীরে, পাশ্চাত্য ভক্তবৃন্দের, বিশেষ করে নিবেদিতার, যে শিক্ষার সূত্রপাত তিনি করেছিলেন উপদেশ, নির্দেশ এবং দীক্ষাদানের মাধ্যমে—আজ হিমালয়ের শতস্মৃতি-জড়িত পুণ্যতীর্থে, ঐতিহাসিক কাহিনী মণ্ডিত নানা জনপদে—সে শিক্ষারই সর্বাঙ্গীন সফলতা এনে দেবেন, প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার সাহায্যে, এইটিই ছিল প্রধান পরিকল্পনা। তাই সংস্কার-মুক্তির একটি দুরূহ প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের জীবনের দৃঢ়মূল সংস্কাররাশি দু'টি একটি সরল সূত্রে গ্রথিত থাকে না। ব্যক্তিগত শত সংস্কারের সঙ্গে পরিবারগত, সমাজগত, জাতিগত নানা সংস্কারও বংশানুক্রমে রক্ত ধারায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কঠিন জটিলতার সৃষ্টি করে। আবার তারও উপর থাকে ধর্মসংস্কার, ভাষা-স্বাতন্ত্র্য ও গোষ্ঠীপ্রেম। এরা নানা সূত্রে মানুষের শিরা উপশিরায় অনুস্যূত হয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে, যেন আবিষ্ট করে রাখে।

মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে তাই এত বিভেদ, এত বিচ্ছিন্নতা স্মরণাতীত কাল ধরেই চলে আসছে। এদের জটিলবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনাসক্ত স্বাধীনতা লাভ সাধকমাত্রেরই চির আকাঙ্ক্ষিত জীবন-স্বপ্ন। ধর্মের পরিভাষায় সে স্বাধীনতার নামই মুক্তি, সে স্বাধীনতার নামই পরিনির্বাণ।

স্বামীজী চেয়েছিলেন—নিজ মানসকন্যাকে সেই কঠিন সংস্কার বন্ধন থেকে সর্বথা মুক্ত করে ভারতবর্ষের সেবাযজ্ঞে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিতে, তার 'নিবেদিতা' পরিচয়টিকে সর্বমহিমায় সার্থক করে দিতে।

অতএব, অত্যন্ত জটিল এবং বিঘ্নসংকুল জেনেও অপরিহার্য কর্তব্যজ্ঞানেই সে দায়িত্ব নিজ হস্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এইকালে, এবং তার অনুকূল পরিবেশ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই হিমালয়ের সুপ্রাচীন তীর্থসমূহে নিবেদিতাদের নিয়ে তাঁর এবারের যাত্রা। তবে নানা কারণে এবারের তীর্থভ্রমণের কালটি খুব দীর্ঘ-বিস্তৃত হয় নি। মাত্র চারমাস, ১১ই মে থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সে-কালের বিস্তৃতি ছিল।

সে-কাল মধ্যে, প্রথমে নৈনীতালে ও আলমোড়ায়, পরে কাঠগুদামের পথে, বারমুল্লা হয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে এবং তারও পরে, বিতস্তাতীরে—

অমরনাথে, ক্ষীর ভবানীতে তাঁদের সুখ দুঃখের স্মৃতিতে ভরা অবিস্মরণীয় দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। আর তীর্থশেষে, বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন পথে, পুনর্বার কাশ্মীর হয়ে প্রথমে স্বামীজী ফিরে এসেছিলেন কলিকাতায় এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরে, পাঞ্জাব এবং উত্তরভারতের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করে নিবেদিতাও কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেছিলেন।

তীর্থ ভ্রমণের এই অল্প কয়েকমাসের দিনগুলি নিবেদিতার জীবনের নিভৃত ইতিহাসে, বেলুড়ের অমূল্য দিনগুলিরই মত, অথবা তার চাইতেও অধিকতর তাৎপর্যে পূর্ণ ছিল, অধিকতর গুরুত্বে সমৃদ্ধ ছিল। কারণ, এইকালে নানা অপার্থিব আনন্দানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীনও তাঁকে হতে হয়েছিল, এক মর্মভেদী বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েও দীর্ঘ পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল।—

সে কথাই বর্তমান পর্যায়ে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করতে আমরা চেষ্টা করব।...

হিমালয়ের প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে—যেখানে,

'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।'

যেখানে,

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে শৃঙ্গানি যস্যা তপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥

সেইখানে,—সেই স্বর্গীয় তপস্যাপূত পরিবেশে, স্বামীজীকে কেন্দ্র করে অতিন্দ্রীয় অনুভূতির এক স্বপ্নময় ও আনন্দময় জীবন তাঁরা যাপন করেছিলেন। নৈনীতালে উপনীত হতেই অবশ্য প্রায় তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং সে কালটিও কম মূল্যবান ছিল না।

সে পথের বর্ণনায় নিবেদিতা এইরূপ লিখেছিলেন :

'প্রাচীন পাটলিপুত্র থেকেই আমাদের শিক্ষা শুরু হয়েছিল।

রেল যোগে পূর্ব দিক থেকে কাশীতে প্রবেশ করবার মুখে গঙ্গার ঘাট আর দশাশ্বমেধের রাণার যে দৃশ্য চোখে পড়ে, জগতের যে কোন রম্য দৃশ্যাবলীর সঙ্গেই তাদের তুলনা হতে পারে। স্বামীজী সাগ্রহে তাদের অজস্র প্রশংসা করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দুই প্রাচীনা নগরীর অতীত সমৃদ্ধি এবং মহিমার কথাও সবিস্তারে উল্লেখ করতে থাকলেন,—তারপর আমরা লক্ষ্ণৌতে পৌঁছালাম। মুসলমান আমলের অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত নগরী-প্রধানা লক্ষ্ণৌ। সেখানে সূক্ষ্ম শিল্প-কলার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, নিদর্শন রয়েছে অনবদ্য স্থাপত্যের। স্বামীজী সে ইতিহাসেরও বিশদ আলোচনা করেছিলেন।···

আর্যাবর্তের দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্রখামার, গ্রামবহুল সমতলভূমি, জানা ও অজানা কত জনপদ অতিক্রম করবার কালে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর দেশপ্রেম এমনভাবে জাগ্রত হয়েছিল যে তিনি এককালে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশটি একটি অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যসত্ত্বা নিয়ে যেন তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছিল।···

তখন, ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়েছিল যেন স্বদেশের অতীত মহিমাই স্বামীজীর ষোল আনা মন-প্রাণ অধিকার করে বসেছে।···

একদিন অপরাহ্নে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আমাদের বাষ্পীয় শকট তরাই প্রদেশ অতিক্রম করেছিল। আর সেদিন তিনি আমাদের যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিলেন—ভগবান তথাগতের অক্ষয় লীলামাধুর্য। অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন—ঐ দেখ, ঐ সেই ইতিহাস-প্রখ্যাত ভূমি—যেখানে ভগবান বুদ্ধের কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল, বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হয়েছিল। বিশাল ভারতের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি বৃক্ষলতা, এমন কি অতি তুচ্ছ প্রাণীটি পর্যন্ত বুদ্ধদেবের মনে দেশপ্রেমের গভীর আবেগ জাগিয়ে তুলত।

সে বিরাট পুরুষের হৃদয়বত্তার কোন তুলনা নেই, কোন পরিমাপ নেই দেশে কালে।

এই ভাবে, প্রায় তিনদিন ট্রেণযাত্রার পর, ১৩ই মে তারিখে যাত্রীদল নৈনীতালে উপস্থিত হয়েছিল। নৈনীতাল থেকে আলমোড়া এবং আলমোড়া থেকে পরবর্তী পথে তাদের যাত্রা ছিল।

*　　　*　　　*

স্বামীজী বলতেন, অনেক সময় আক্ষেপ করেই বলতেন,—এ জীবনে আমি শুধু একটি জিনিষেরই কামনা করেছি। আর কিছু কামনা করিনি। সে কামনা হিমালয়ের একটি নির্জন, নিভৃত কন্দর—যেখানে আপনভাবে গভীর ধ্যানে আমি ডুবে যেতে পারব, নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে পারব। কোন কর্মভার আমাকে বিরক্ত করবে না, কোন দায়-দায়িত্ব বাধা দেবে না।...

'Oh, I know I have wandered over the whole earth, but in India I have looked for nothing save the cave in which to meditate.'...

এই তাঁর জীবনের অন্যতম নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর সে আকাঙ্ক্ষার আংশিক পরিপূর্তির কালও ছিল এইটি।

তাই দেখা যায় যে এ সময়টির প্রায় সর্বক্ষণই স্বামীজী একটি দিব্য ভাবাবেশে মগ্ন হয়ে থাকতেন। যেন নিজ প্রাণ, মন এক বিরাট পুরুষের অব্যাহত চিন্তাধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দ্রষ্টারূপে, সাক্ষীরূপে জগৎ প্রপঞ্চের একেবারে শেষ সীমারেখার উপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছেন। যেন,

'দিগন্তের পথে, শূন্যদৃষ্টি—
এক রিক্তবিত্ত শুভ্রমেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরী শঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।'...

—এই-ই স্বামীজীর তৎকালীন মানসিক অবস্থা ছিল।

*　　　*　　　*

একদা, কতিপয় বৎসর পূর্বে, আমেরিকার এক বিদ্বদ্‌জন সমাবেশে স্বামীজী এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়েছিলেন,—

—স্বামীজি, বেদান্ত আপনাদের দেশের এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক আবিষ্কার। বেদান্তদর্শন আপনারও স্বকীয় জীবন-দর্শন। তথাপি আপনারা, হিন্দুরা,—পৌত্তলিক কেন? মূর্তিপূজা করেন কেন?

তদুত্তরে সেদিন স্বামীজী এক অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন:

কারণ, আমাদের দেশের উত্তর সীমানায় দেবতাত্মা হিমালয় বিরাজিত।

Because, we have got the Himalayas.

অর্থাৎ, হিমালয়ের তুষারমৌলী শিখরদেশের অপ্রাচ্য সৌন্দর্য যে দর্শন করেছে, তার অন্তহীন, অটল গাম্ভীর্য যে অনুভূতির মধ্যে আহরণ করতে পেরেছে—তার পক্ষে সীমার মধ্যে অসীমের বিচিত্র প্রকাশ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সাকার-বিগ্রহ ভগবান তার অন্তরের মণিপ্রকোষ্ঠে চিরদিনের সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেছেন। আর্যাবর্তের জনপদবাসীরা সভ্যতার আদিকাল থেকে অনন্তের ঐ অচল, বিশাল মূর্তিটি দর্শন করে আসছে এবং তারই ফলে অসীম, অরূপ ভগবানকে রূপের মধ্যে চিত্রিত করতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, তাঁর সান্ত অভিব্যক্তিতে অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

বস্তুতঃ, এই বিপুলা পৃথিবীর অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিমালয়ের মত ধ্যানতপস্যার এমন অনুকূল ভূমি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানকার উর্দ্ধশীর্ষ মহামহীরুহগুলির পত্র-মর্মরে যে রোমাঞ্চ থাকে, পাহাড়ের গাত্রবাহী নির্ঝরিণীর কলধ্বনিমুখরতায় যে স্বপ্ন জড়িত থাকে—তার তুলনা কি কখনো, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে?

আজ জীবনে প্রথম সেই হিমালয়ের পাদমূলে উপস্থিত হয়ে, 'শুভ্র হিমরেখাঙ্কিত মহা নিরুদ্দেশের' সেই নিঃসীমতা লক্ষ্য করে নিবেদিতাও যেন বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

এমন বিপুল মৌন-মহিমা, এমন স্তব্ধ গাম্ভীর্য—নিবেদিতা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেন নি।

কলিকাতা মহানগরীর প্রচণ্ড কলকোলাহল আর নিদারুণ অপরিচ্ছন্নতার আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে, সমতল ভূমির শত-যোজন বিস্তার অতিক্রম করে অকস্মাৎ যেন এক উদার অভ্যুদয়ের সম্মুখে এসে তাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সে আকস্মিক প্রকাশের অসামান্যতাও কম বিস্ময়কর ছিল না।

নিবেদিতার স্বকীয় বর্ণনায় এই কালের এবং এই পারিপার্শ্বিকের পরিচয় আছে ঃ

'Beautiful have been the days of the year. In this the Ideal has become the Real.··· We have learnt something of the mood in which new faiths are born, and of the persons who inspire such faiths.'

বৎসরের সে দিনগুলি বড় বিচিত্র ছিল, বড় মধুময় ছিল। দুর্জ্ঞেয় জীবনদর্শন যেন বাস্তব হয়ে আমাদের হাতে এসে ধরা দিয়েছিল। এমন একটি জাগ্রত দিব্যজীবনকে প্রত্যক্ষ করবার দুর্লভ সুযোগ তখন আমরা লাভ করেছিলাম যার কৃপায় ধ্রুব-বিশ্বাস অন্তরে জাগ্রত হয়, অপ্রত্যক্ষ বস্তুও ধ্যানপথে অনুভূতির মধ্যে এসে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

গিরিপ্রদেশের তমসাচ্ছন্ন নিশিথিনীর যে সুদীর্ঘ প্রহরগুলি, তাদের অভিজ্ঞতাও কী কম বৈচিত্র্যময় ছিল? অবিশ্রাম প্রবাহিত হচ্ছে বায়ু, অবিশ্রাম পত্রমর্মরে ধ্বনিত হচ্ছে একটানা একটি অনাহত ধ্বনি···

মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!

সে অভিজ্ঞতার তুলনাও দুষ্প্রাপ্য, মুল্যায়নও অসম্ভব।

আর সেই তুলনাহীন, অনবদ্য পরিবেশের মধ্যেই নৈনীতালে ও আলমোড়ায় প্রায় একমাস কাল,—১৩ই মে থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত, তাঁরা যাপন করেছিলেন। এবং সেই সময়টুকুর মধ্যেই কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল।

প্রথমতঃ, এই সময়টিতেই খেতড়ির মহারাজ অজিতসিং-এর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল। আর পরিচয় হয়েছিল শ্রীমতী আনিবেশান্তের সঙ্গে এবং স্বামীজীর মেট্রোপলিটন স্কুলের অন্যতম সহপাঠী বাল্যবন্ধু—যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে। আবার, এখানেই একদিন জনৈক মুসলমান ভক্ত স্বামীজীকে 'অবতার' বলে বন্দনা করে বলেছিল,—'যদি ভবিষ্যতে কেউ কখনো আপনাকে অবতার বলে দাবী করে, তবে স্মরণ রাখবেন, আমি মুসলমান হয়েও তাদের সকলের অগ্রণী।'

খেতড়ির মহারাজের কথাও এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করছি। খেতড়ির রাজা অজিতসিং স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী শিষ্য ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে নিজ যুগব্রত সাধনের অন্যতম সহকারী বলে অভিহিত করতেন। তাঁরই আশীর্বাদে অজিতসিং একদা একটি পুত্রসন্তান লাভে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে খেতড়ির রাজদরবারে এক নৃত্যপরা নর্ত্তকীর প্রতি কঠিন উপেক্ষা, হয়ত-বা ঘৃণা-মিশ্রিত উপেক্ষা, প্রদর্শন করেছিলেন স্বামীজী। এবং তারপর সে নর্ত্তকীরই করুণ, মর্মস্পর্শী আবেদনে বিচলিত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিন স্বামীজীর উপেক্ষায় ব্যথিত হয়ে গভীর আকুতি জানিয়ে সে এই গানটি গেয়েছিল। আজ এ গানটির কথা সর্বজন বিদিত।

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তুম্হারো,
চাহে তো পার করো।

ইক লোহা পূজামেঁ রহত হৈ
ইক রহে ব্যাধ ঘর পরো,
পারশকো মন দ্বিধা নহীঁ হৈ,
তুহুঁ এক কাঞ্চন করো।
ইক নদী ইক নহর বহত মিলি নীর ভরো।
জব্ মিলো দোনো এক বরণ হোয় সুরসুরি নাম পরো ;
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

এই আলমোড়ার দিনগুলিতেই সে অতীত কাহিনীটি বিবৃত করে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ

'সেদিন সহসা যেন আমার চোখের সম্মুখ থেকে একটি আবরণ অপসারিত হয়েছিল, একটি বিশ্বব্যাপ্ত অদ্বৈতানুভূতিতে সহসা সকল ভেদাভেদ অন্তর্হিত হয়েছিল। সেদিন থেকে জগতের কালকে আর মন্দ বলে, ছোট বলে আমি ভাবতে পারি না, চিন্তা করতে পারি না।'···

এই নৈনীতাল আলমোড়াব, বিশেষ করে আলমোড়ার, দৈনন্দিন কার্যসূচীও অনেকাংশে বেলুড়ের কার্যসূচীরই অনুরূপ ছিল। প্রতিনিদ অতি প্রত্যূষে, দিবারম্ভের বহুপূর্বে নিবেদিতাদের তাঁবুটিতে স্বামীজী উপস্থিত হতেন এবং প্রাতরাশেব সময় পর্যন্ত সেখানে যাপন করতেন। কোন কোনদিন অপরাহ্নকালেও তিনি সেখানে গমন করতেন। এক একদিন এক এক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হত, এক এক বিষয় আলোচিত হত।···

প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সভ্যতার ঋজুকুটিল গতিপথেব অনুসরণ ব্যপদেশে তাদের তুলনা করা হত, সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করা হত।

কখনো ভক্তির কথা হত, কখনো প্রেমের কথা হত। কখনো আবার শিব-উমার অনবদ্য লীলামাহাত্ম্যে স্বামীজী উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, আত্ম-বিস্মৃত হয়ে যেতেন।

একদিন প্রভাতসূর্যের স্বর্ণ-কিরণ হিমালয়ের রজত-শুভ্র শিখর-চূড়ায় প্রতিফলিত হয়ে এক অবাচ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিবেদিতাকে এবং অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যাগণকে সম্বোধন করে গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন :

ঐ দেখ, ঐ বরফঢাকা আকাশস্পর্শী শৃঙ্গগুলি। ঐ শিব, ঐ মহেশ্বর।

আর তাদের আলিঙ্গন করে ঈষৎ গৌরবর্ণের যে আলোক-সম্পাত ঐ উমা, ঐ লোকমাতা পার্বতী।

'হিমাচল, ভারতের অনন্ত সঞ্চিত তপস্যার মত।
স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে।'...

দেখ, চেয়ে দেখ।...

এ সব আবেগময় বর্ণনার সূত্র ধরেই আবার মুহূর্তে মুহূর্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মহারণ্যেও তিনি প্রবেশ করতেন ঠিক পূর্বেরই মত, বেলুড়জীবনের দিনগুলিরই মত।...

নিবেদিতার ভাষায়ই বলছি :

একদিন অপরাহ্নকালে, তখন আমরা দারুণ গুমটের মধ্যে একটি তরাই অতিক্রম করছিলাম, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের অতীত মহিমায় এককালে আত্মহারা হয়ে স্বামীজী বলেছিলেন,—এই সেই ইতিহাস-প্রোক্ত প্রাচীন প্রদেশ।

এখানকার বন্য ময়ুর-ময়ূরী রাজপুত জীবনের অসংখ্য আখ্যায়িকার কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। দেশপ্রাণ চারণগণের অবিস্মরণীয় গীতধ্বনি শ্রুতিযন্ত্রে ধরিয়ে দেবে। এখানে দেখতে পাবে ক্বচিৎ কোন হস্তী প্রাচীন যুগের যুদ্ধকাহিনীর বিচিত্র স্মৃতি বহন করে নিয়ে বিচরণরত। আবার পাঞ্জাবের রুক্ষ মাটি, বিতস্তা চন্দ্রভাগা প্রমুখ পঞ্চনদ-বিধৌত শিখদের মাতৃভূমি, সেও স্বামীজীর পক্ষে চিরদিনই প্রেরণার এক অপূর্ব উৎসস্বরূপ ছিল।

একটি পাঞ্জাবী পল্লীবালার হাতের চরকার ঘর্ঘর শব্দ তাঁর কর্ণে 'শিবোঽহং, শিবোঽহং'-মন্ত্রের অনাহত-ধ্বনি জাগিয়ে দিত এবং তাদের বিশদ বর্ণনার অপরিসীম আনন্দে তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।···কখনো কখনো এমন হত যে তাঁর মুখে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা শুনে অপরে তাঁকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেই সিদ্ধান্ত করে বসত। হয়ত সরাসরিই বলত—'স্বামীজি, আমি জানতাম না যে আপনি বৌদ্ধ।'

আর সে মহামানবের নামটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে, চকিতে স্বামীজী অভিভূত হয়ে পড়তেন। বলতেন,···'আমি ভগবান তথাগতের দাস, দাসানুদাস।

তাঁর সমকক্ষ কোন ব্যক্তি কোনদিন কি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছিলেন, অথচ নিজের জন্য কোন কাজ করেন নি। কী অপরিসীম করুণা, কী প্রেমময় বিশাল হৃদয়! একটি ছাগশিশুর জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন বলি দিতে তিনি উদ্যত হয়েছিলেন। একটি ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য স্বকীয় দেহটিকে দান করতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। জীবনের শেষ পর্যায়ে এক চণ্ডালের জন্য আত্মাহুতি দিয়েও তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি।···

আমার অশেষ সৌভাগ্য, একদা আমার শৈশবজীবনে তিনি সহসা একদিন, একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, আমার প্রকোষ্ঠটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আমি তাঁকে আভূমি প্রণাম জানিয়ে ধন্য হয়েছিলাম।'

* * *

আবার অন্য একদিন।

এই আলমোড়াতেই, এক ঝিল্লীরব মুখরিত উদাসীন সন্ধ্যালগ্নে মহামতি শুকদেবের অনবদ্য উপাখ্যানটি বিবৃত করেছিলেন স্বামীজী। এ সবই নিবেদিতার স্মৃতিকথা থেকে আমরা বিবৃত করছি।···মহর্ষি

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পুত্র মহামতি শুকদেব। পরমহংসগণের অগ্রগণ্য পুরুষ ছিলেন তিনি।

পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে এক ষোড়শবর্ষীয় বালকরূপে তিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। প্রাক্তন শুভ-সংস্কার বশে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং জন্মমুহূর্তেই সংসার বর্জন করেছিলেন। কিন্তু পিতা মহাপ্রাজ্ঞ হয়েও সে তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং অকস্মাৎ এক গিরি-সঙ্কটের অন্তরালে পুত্র অদৃশ্য হলে বেদনা-জর্জর কণ্ঠে 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলে করুণ বিলাপ করেছিলেন।

আরও কথিত আছে যে পিতার সে আর্ত-ক্রন্দনে বিগলিত হয়ে শুকদেব পুনর্বার দেহধারণ করেন এবং পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রর্থনা করেন ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু পিতা নিজ অসামর্থ্য চিন্তা করে মিথিলাধিপতি জনকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন পুত্রকে।

জনকের রাজগৃহে শুকদেবের অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিচিত্র। সেখানে প্রথম তিনদিন ও তিনরাত্রি রাজ-বাটীর বহির্ভাগে নিদারুণ তাচ্ছিল্য এবং উপেক্ষার মধ্যে তাঁর অতিবাহিত হয়। চতুর্থ দিনে অকস্মাৎ মহাসমারোহে তাঁকে রাজ-সকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে, ভোগ-বিলাসের প্রচুর উপকরণের মধ্যে প্রশান্তচিত্ত শুকদেব সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে উপবিষ্ট রইলেন বহুক্ষণ।

তারপর এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবতী সভামধ্যে উপস্থিত হল। তার অসামান্য সৌন্দর্য-ছটায় সভাস্থ সকলের দৃষ্টি যেন মুহূর্তে মোহাবিষ্ট হয়ে গেল। তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবার নিঃসঙ্কোচতাও কারুর রইল না, বাক্যালাপ তো বহুদূরের কথা। কিন্তু শুক তরুণবয়স্ক হয়েও একান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাকে আহ্বান করে নিজ আসনের একান্তে উপবেশন করালেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ব্যাপৃত হলেন। পরমহংসাগ্রণী শুকদেবের কাছে সবই ব্রহ্মময় ছিল, তাঁর আত্ম-দৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষ ভেদ ছিল না।···

তখন রাজর্ষি জনকের প্রধান অমাত্য রাজাকে সম্বোধন করে বললেন,—রাজন্, যদি আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষের অন্বেষণ করে থাকেন—তবে স্থির জানবেন তিনি এখন আপনারই সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন।'···

শুকদেবের জীবনকাহিনী অবশ্য বহুলাংশেই রহস্যাবৃত। সে বিষয়ে খুব বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটুকু নিঃসংশয়ে জানা যায় যে তিনি পূর্ণ পরমহংস অবস্থা লাভ করেছিলেন। মনুষ্যকুলে একমাত্র তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জল এক গণ্ডুষ পান করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। অতি উচ্চ অধিকার-সম্পন্ন সাধকগণেরও অধিকাংশ বহুদূর থেকে সে সমুদ্রের তরঙ্গগর্জন শ্রবণ করেছেন মাত্র, অল্প দু'চার জন শুধু দর্শন করেছেন তার সৌন্দর্য মহিমা। আর মুষ্টিমেয়, অতি মুষ্টিমেয় দু'একজন কঠিন তপস্যায় তার কণামাত্র আস্বাদনে সমাধি-সম্পদ লাভ করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু শুকদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব।

একমাত্র তিনিই সে আনন্দ-জলধির বারিরাশি গণ্ডুষ ভরে পান করে আধ্যাত্মিক জগতে এক অপরাজেয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

নিবেদিতা বলতেন,—বাস্তবিক শুকই স্বামীজীর মতে আদর্শ যোগী ছিলেন। তাঁর কাছে তিনিই ছিলেন সেই সর্বোচ্চ অপরোক্ষানুভূতির মূর্ত প্রকাশ যাঁর দৃষ্টিতে এই স্থূল জগৎ, এই নশ্বর জীব-জীবন শুধু ছেলেখেলা, শুধু ছেলেখেলা।···

'অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি—ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা,'—আমি জানি আর শুক জানে। ব্যাস জানতেও পারে, নাও জানতে পারে।

শিবমুখে উচ্চারিত এই বাক্য, স্বামীজী কখনো কখনো ভাবস্থ হয়ে আবৃত্তি করতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বদনমণ্ডলে এমন একটি ভাব প্রকাশিত হত যেন নিঃসীম আনন্দ সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত তাঁর নিজেরই সম্মুখে মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি।

সে স্মৃতি অক্ষয়, সে স্মৃতি অবিস্মরণীয়।

* * *

কোন কোনদিন আবার ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়েও আলোচনা শুরু হত। রাজপুতকাহিনী বা মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, শিখদের বীরত্ব বা মুসলমান গৌরব, এক একদিন এক এক প্রসঙ্গের অবতারণা হত, কোন প্ল্যান করে নয়, কোন পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা নিয়ে নয়। তবে অতীত ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠাই স্বামীজীর কাছে অর্থপূর্ণ ছিল, তাৎপর্য পূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেই তাঁর মানসপটে বর্ণবহুল চিত্ররাজি প্রতিফলিত হত। তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন, নব নব বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠতেন।

বলতেন,—ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই বর্ণ-প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শনৈঃ শনৈঃ গড়ে উঠেছে। সহসা আপাতদৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে অসুবিধা হলেও, সেটিই প্রকৃত অবস্থা। কারণ, ঐ দুই বর্ণের সভ্যতার আদর্শই যে শুধু স্বতন্ত্র ছিল তাই নয়, কতকাংশে তারা পরস্পর-বিরোধীও ছিল। একটি ছিল প্রাচীন-পন্থী, বংশপরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি অতি নিবিড় ভাবে শ্রদ্ধাশীল। আর অপরটি ছিল স্পর্ধিত, চঞ্চল কিন্তু তার দৃষ্টি পুরোভাগে প্রসারিত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসক্ষেত্র যাঁদের জীবনালোকে আলোকিত হয়েছিল—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষ,—তাঁরাও সবাই ছিলেন ক্ষাত্র-কুলোদ্ভব। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব নয়।

ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষে সেও এক বিস্ময়কর বিচিত্র অভিজ্ঞতা।···

নিবেদিতার পিপাসু এবং জিজ্ঞাসু মনের সম্মুখে এ-সব মৌলিক আলোচনা যেন ক্ষণে ক্ষণে চিন্তাজগতের সিংহতোরণ খুলে দিত। তাঁর মনে হত যেন দিগন্তের সীমারেখা স্নিগ্ধ আলোক ধারায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

কিন্তু ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস নিয়ে স্বামীজীর যেমন মমত্ব এবং গৌরব বোধ ছিল—তার বর্তমান নিয়ে আবার ছিল তেমনি এক মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ বেদনা। আর তা থেকে উদ্ভূত ভবিষ্যতের জন্য যে ভাবটি, সেটিও ছিল গভীর উৎকণ্ঠায় ভরা, বিপুল দায়িত্বে আকীর্ণ।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা দীর্ঘ যুগ পরিব্যাপ্ত। আর সেই পরাধীনতার বিষ-জর্জরতা স্বামীজীর পক্ষে এককালে যেন দুঃসহ ছিল। সে তিনি সইতেই পারতেন না। তারও উপর আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র দেশে যে অত্মবিস্মৃতি এসেছিল, যে হীন অনুকরণ-স্পৃহা মাথা তুলেছিল সেও ছিল স্বামীজীর অন্তর-বেদনার অন্যতম হেতু। কখনো কখনো সে বেদনা কঠিন সমালোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত, তীব্রতম আঘাতের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হত। সে সব ক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, কোন কম্প্রোমাইজ তিনি গ্রহণ করতেন না।

নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর যে ভাবগত সংঘর্ষের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি এবং যার সংকটময় পরিণতি এইকালে ঘটেছিল—তার সূত্রপাত অনেকাংশে এই অবস্থা থেকে, এই পটভূমি থেকে। নিবেদিতা যদি সাধারণ হতেন, তাঁর মানসিক গঠন ও জীবনদর্শন যদি অপর দশজনেরই মত বৈচিত্র্যহীন ও মামুলি ধরণের হত তবে হয়ত এমনটি হত না। হয়ত, সমগ্র ব্যাপারটিই একটি স্বতন্ত্র-রূপ ধারণ করত। কিন্তু বিধির বিধানে নিবেদিতার গঠন ও প্রকৃতি—বহুলাংশে তদীয় আচার্যদেবেরই মত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য ছিল, অসাধারণ ছিল। জিজ্ঞাসু এবং গ্রহণেচ্ছু হয়েও সে মন অদ্ভুতভাবে কঠিন ছিল, অতন্দ্র ছিল। তাঁর ধমনী-বাহিত কেল্টিক রক্ত তাঁকে অতি উগ্রভাবে নিজ জাতীয়তা সম্পর্কে স্পর্শ-কাতর করে রেখেছিল। বলাবাহুল্য, সে তথ্য স্বামীজীর একবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তার গভীরতা সম্পর্কে প্রথমেই তিনি সম্যক অবহিত হয়ত

ছিলেন না। নানা ঘটনায় ক্রমশঃ সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

নিবেদিতার দীক্ষার অব্যবহিত পরের একটি ঘটনাও এ-প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। নিবেতার স্মৃতিকথায় একথার উল্লেখ আছে যে দীক্ষান্তে নিবেদিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজী—'এখন, অর্থাৎ দীক্ষার পর, তুমি কোন্ জাতির অন্তর্ভূক্ত?' মূহূর্ত চিন্তা না করেও নিবেদিতা সেদিন নিজ মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন যে তিনি ইংরাজ জাতির অন্তর্ভূক্ত।

সুতরাং ইংরাজ-শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরূপ-প্রভাব সম্পর্কে স্বামীজীর রূঢ় মন্তব্য ও কঠিন সমালোচনা নিবেদিতার পক্ষে যে ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠবে, ক্রমশঃ তাঁর মানসক্ষেত্রে একটি ব্যাপক বিপ্লবের সূচনা করবে তাতে বৈচিত্র্য কিছু নেই। সেটা অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু যেটা অপ্রত্যাশিত. সেটা ছিল আঘাতের পৌনঃপুনিকতা, আর তার মর্মছেদী প্রদাহ। তাছাড়া, একালে যুগপৎ আরও একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিবেদিতা। সে পরীক্ষা ছিল তাঁর আদর্শনিষ্ঠার সূক্ষ্ম-মূল্যায়ন নিয়ে, তদীয় ব্যক্তিগত আকর্ষণকে নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা নিয়ে। আর সে পরীক্ষাও খুব সরল বা সহজ ছিল না।

কথাটি আরও একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

নিবেদিতা যেদিন নিজের জন্মভূমি, সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি সব কিছু পশ্চাতে ফেলে এক অজ্ঞাত, অনিশ্চিত পথ-যাত্রায় বের হয়েছিলেন সেদিন স্বামীজীর দিব্য জীবনের অনিবার্য আকর্ষণই তাকে অন্য সব বিষয়ে উদাসীন করে রেখেছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখবার, খুব বেশী বিচার-বিশ্লেষণ করবার তখন সময়ও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। শুধু ছিল এক রহস্যময় ভবিষ্যতের অলক্ষ্য আহ্বান আর তারই ইঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার অদম্য প্রেরণা।

কিন্তু আজ?

আজ কঠিন বাস্তবভূমিতে, আচার্যের কম্প্রো মাইজ হীন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিজকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে গিয়েই জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররাশি যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে মাথা তুলেছিল, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আর তা থেকেই হয়েছিল দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

নিবেদিতার স্বকীয় উক্তি এ-প্রসঙ্গে এইরূপ ছিল ঃ

'My relation to our Master at this time can only be described as one of the clash and conflict. I can see now how much there was to learn, and how short was the time for learning to be, and the first lesson doubtless is the destroying of Self-Sufficiency in the mind of the taught.'

এবং এই 'destroying of the self-sufficiency' নিয়েই উদ্ভূত হয়েছিল সংকট।

একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্ম-বিসর্জনের দৃষ্টান্ত আছে। নাম, যশ, অর্থ, ভোগ-বিলাস এমন কি, নিজের অমূল্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে অমরত্ব অর্জন করেছিলেন, এমন মহৎ জীবনও কোন দেশেই একেবারে দুর্লভ নয়। আর্যাবর্তের বিচিত্র ইতিহাসে আবার ধর্মের জন্য, আত্মোপলব্ধির জন্য চরম ত্যাগের নিদর্শন দেখা যায় প্রচুর ঃ

'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্রবেশ,'—এই তো এদেশের চিরন্তন কথা।

'ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখ-সুখে
সংসারে রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।'

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের এই তো মর্মকথা। কিন্তু, এসব ত্যাগের কোনটিই এককালে কেন্দ্রচ্যুত নয়। নিজের দেশ, নিজের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি—সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করে উল্কার মত লক্ষ্যহীন পথে তার গতি নয়। তার সীমারেখাও চিহ্নিত, তার বিধানও সুনির্দিষ্ট।

কুল রক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রাম রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে পৃথিবীও ত্যাগ করবে।

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥···

এ-নির্দেশ মহাভারতের পৃষ্ঠায় নিহিত। কিন্তু মার্গারেটের জীবনে যে ত্যাগ ও ব্রতধারণের আহ্বান এসেছিল—সেটি ছিল এককালে কেন্দ্র বিচ্যুতির কঠিন আহ্বান। নিজ দেশ, নিজ ভাষা, পরিবার, পরিজন এক কথায় সব কিছুর বন্ধন ও সীমারেখা অতিক্রম করে একেবারে এক মহাশূন্যতার মাঝখানে যেন তাঁকে দাঁড়াতে হবে এমনি ছিল অনুশাসন। তথাপি, স্বামীজীর জীবনের অসামান্য প্রভাবই তাঁকে সে অনিশ্চয়তার মধ্যে টেনে এনেছিল। ঐ একটি মাত্র জীবনের আশ্রয়ই ছিল আশা, একটি মাত্র পদ-ছায়াই ছিল ভরসা।

ভারতবর্ষের জন্য, বিশেষ করে তার নারী-সমাজের জন্য তিনি আহূত হয়েছিলেন, সে কথা সত্য। আমরা ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু তথাপি, সেটি ছিল গৌণ। মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের বিচিত্র চরিত্র আর তাঁর অভিনব জীবন-গীতা। তাঁর স্পর্শে সব প্রাণময়, তাঁরই প্রেমে সব মধুময়। তিনি যা প্রমাণ করবেন আমি তারই অনুগমন করব।

'তাঁহারি লাগিয়া সব তেয়াগিয়া' আমি বৈরাগী হব,— এই ছিল মার্গারেটের সেদিনের সকল প্রেরণার মূল অনুভূতি।

'Love me and love my dog'—স্বামীজীর এ নির্দেশই ছিল তাঁর সব কিছুর নিয়ামক। একথাও পূর্বে বলেছি। তবু মনে হয় নিবেদিতার অনন্য চরিতকথা যথাযথ অনুধাবন করতে হলে এর পৌনঃপুনিক উল্লেখের প্রয়োজন আছে। সেজন্য বারম্বার একই কথা আমরা নানাভাবে প্রকাশ করতে চাইছি। পুনরুক্তি দোষে দোষী হয় জেনেও চাইছি। কারণ, এরই মধ্যে সে জীবনের সকল রহস্য নিহিত।…

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এক সার্বভৌম মানব-ধর্মের প্রবক্তা রূপেই স্বামী বিবেকানন্দ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সে রূপ তাঁর অক্ষয়।…

শুচি হও, নিঃস্বার্থ হও। পরম পুরুষের সঙ্গে একাত্ম অনুভূতিতে জীবনের অখণ্ডতা উপলব্ধি কর। ব্রহ্মই সর্বব্যাপ্ত। এই মহাবিশ্বে ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তু নেই।…

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং॥…

এই নিগূঢ় আবেদন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি কর। স্থির জেনো, যে-ব্যক্তি অন্তর্নিহিত দেবত্বের সম্যক অনুভূতিতে যথার্থ প্রশান্তি অর্জন করতে পেরেছে, স্থিত-প্রজ্ঞা লাভে সমর্থ হয়েছে—

'তেষাম্ শান্তিঃশাশ্বতী, নেতরেষাম্।'
তাঁদেরই শান্তি অব্যাহত থাকে, অপরের নয়।—
প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।

এই ছিল সে বিবেকানন্দের বাণীর মর্মকথা।

কিন্তু ভারতবর্ষে পদার্পন করবার পর থেকে ধীরে ধীরে আর এক বিবেকানন্দের সম্মুখীন হলেন নিবেদিতা। পূর্ব-পরিদৃষ্ট ব্যক্তিই যেন এ নয়।…

'It was not Ramakrishna Paramhansa, nor even the ideas which were connected with him that formed a strange revelation here. It was the personality of my Master himself in all the fruitless torture and struggle of a lion caught in a net'···
এই হল এখনকার বিবেকানন্দের বহিঃপ্রকাশ। এখন তাঁর ধ্যানে-জ্ঞানে, কথায়-ইঙ্গিতে, ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে শুদ্ধমাত্র একটি চিন্তাই অনুক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে। সে চিন্তা ভারতবর্ষের বর্তমানকে নিয়ে, ভবিষ্যৎকে নিয়ে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে দানবীয় শক্তি দুর্বল জাতিগুলির উপর দীর্ঘকাল ধরে একটানা অত্যাচার ও শোষণ চালিয়ে নিজে সম্পদশালী হয়েছে তার প্রতি কঠিন এবং নির্মম কশাঘাত।—

স্বামীজী বলতেন,—বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞানে ও শিল্পোৎকর্ষে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছে, অদ্ভূত মৌলিকতা প্রদর্শন করেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তার ফলে, একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে নিজের ভোগ-বিলাসের মাত্রাই শুধু সে বর্দ্ধিত করেছে। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সমগ্রভাবেই মানুষের দুঃখ বেড়েছে, হাহাকার বেড়েছে। অভাব-বোধের যেন আর অবধি নেই।

অনুন্নত দেশগুলির অবস্থা হয়েছে আরও মর্মান্তিক। পরাধীনতার নিষ্পেষণে একদিকে যেমন তাদের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদাবোধ নষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে দারিদ্র্যে এবং উপেক্ষায়, কুসংস্কারে এবং শিক্ষাহীনতায় তাদের মনুষ্যত্বও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু ভারতের প্রাচীনসভ্যতা একদিকে যেমন মানুষকে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি তার ঐহিক ভোগ-লিপ্সাকেও সংযমের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল।

নহি ভোগং ভোগেন উপশাম্যতি,— এই শিক্ষাটিকে তার জাতীয় জীবনে সে রূপায়িত করেছিল, সার্থক করেছিল।'

স্বামীজীর এইসব ভাবাবেগের মুখেই নিবেদিতার তীক্ষ্ণ জাত্যাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ত। অতি নির্মমভাবেই স্বামীজী বলতেন—'তোমার যে দেশপ্রেম, সে তো একটি যুক্তিহীন গোঁড়ামি। সে তো একটি অপরাধ, ক্রাইম।' এই যেমন একদিক, অপর দিকে তেমনি—যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-সূত্রের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—সেটিও সৃষ্টি করেছিল এক গভীর জটিলতা এবং হয়ত সেজন্যও প্রয়োজন হয়েছিল আঘাতের, প্রয়োজন হয়েছিল তপস্যার।··· নিবেদিতার কথাই পুনর্বার উদ্ধৃত করছি ঃ

'এই কালটিতে আমার আজন্মপোষিত যা-কিছু ধারণা ও মতামত, যা-কিছু সংস্কার বা সুখস্বপ্ন, সব কিছুরই উপর প্রচণ্ড আঘাত এবং বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছিল। সে আঘাতের তীব্রতাও যেমন দুঃসহ ছিল, তার ব্যাপকতাও তেমনি অভাবিত ছিল।'

পাশ্চাত্যের পরিচিত পরিবেশে স্বামীজীর যে প্রশান্ত, আনন্দঘন-মূর্তি আমাকে আকর্ষণ করেছিল— আজ সহসা সে মূর্তিটি যেন কোথায় অন্তর্হিত হল। আর তার স্থলে যে-মূর্তিটি প্রকাশিত হল তার রুক্ষতাও যেমন মর্মদাহী, ঔদাসীন্যও তেমনি নির্মম।···

ফলে, আমার অন্তরের ক্ষোভ এবং অশান্তির যেন আর পরিসীমা ছিলনা। হতাশা এবং আশ্রয়শূণ্যতার সে কী মর্মদাহী পীড়া!

আলোহীন, বায়ুহীন, তমসাবৃত জীবনপথের সে এক বদ্ধ নিঃসঙ্গতা। প্রকাশ করা যায় না, বলে বোঝান যায় না।

একদিকে তিক্ততা ও অবিশ্বাস, bitterness and distrust; অন্যদিকে বিরক্তি ও ঔদ্ধত্য, irritation and defiance—আর তারই মধ্যে অভাগিনী নিবেদিতা।···

'Suffering is often illogical and I cannot attempt to justify by reason the degree of unhappiness which I experienced at this time, as I saw the dream of a friendly and beloved leader falling away from me,

and the picture of one who could be atleast indifferent and possibly silently hostile, substituting itself instead.'…

এই ছিল অবস্থা, এবং সে অবস্থাটি ক্রমশঃ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে নিবেদিতা প্রায় ভেঙ্গেই পড়েছিলেন। সহযাত্রী যাঁরা ছিলেন—জয়া, ধীরামাতা প্রভৃতি, তাঁরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নিবেদিতার সে অগ্নিপরীক্ষায় তাঁদেরও উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। সেজন্য, শেষপর্যন্ত তাঁরাও স্বামীজীর কাছে বিনম্র আবেদন জ্ঞাপন করেছিলেন।

এর পরই এসেছিল সেই বিচিত্র মধুর শুভলগ্ন। যে লগ্নটিকে নিবেদিতা বলেছেন,

'…assuredly a moment of wonderful sweetness of reconciliation.'

সেদিন, সেই শুভলগ্নে, ঈষৎ চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল। তখন দিনান্তের প্রায়ান্ধকার প্রদোষকালে নির্জন বাংলোটির মুক্ত বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়েছিলেন অভাগিনী নিবেদিতা। সমস্ত অন্তর যেন পুঞ্জীভূত বেদনা ও হতাশায় নিশ্চল হয়ে গেছে। অসাড় হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়টিতে স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হলেন। ঊর্দ্ধে নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে শুক্লপক্ষের অর্ধচন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অতীত দিনের সেই বিস্মৃত-প্রায় মধুর কণ্ঠে বললেন :

'মার্গারেট, দেখ, ইসলাম ধর্মমতে চন্দ্রই শান্তির প্রতীক। মুসলমানগণ শতমুখে চন্দ্রের মহিমা কীর্তন করে। অর্ধ-চন্দ্রশোভিত ইসলামের জাতীয় পতাকা সে মহিমারই সাক্ষ্য বহন করে থাকে।

এস, আজ আমরাও ঐ নবোদিত চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ-ধারার স্পর্শ নিয়ে নূতন জীবনের সূত্রপাত করি।'…

এই বাক্য কয়টি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ দক্ষিণ করতল মস্তকে স্থাপন করে পরিপূর্ণ আশীর্বাদে ও প্রেমের অভিষেকে ধন্য করলেন নিজ বিদ্রোহিণী মানসকন্যার জীবন। নিবেদিতা ততক্ষণে নতজানু হয়ে তাঁর পাদমূলে অপেক্ষমানা।···

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির কণ্ঠনিঃসৃত অমোঘবাণী আর তাঁর দিব্যস্পর্শ মুহূর্তে এক অভাবিত রূপান্তর আনয়ন করল নিবেদিতার মানস জীবনে।

সমস্যা ও হতাশা চকিতে অন্তর্হিত হল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অব্যক্ত যন্ত্রণা চিরদিনের মত অপসৃত হয়ে গেল। আনন্দের জ্যোতি-ধারায় উদ্ভাসিত হল অন্তর্লোক। তখন,

অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায়—
যেন দিগন্তের
নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি,
ব্যগ্র এই মনের আকূতি?
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে
খুঁজিয়া বাণীরূপ—
করে থাকে চুপ।
বলে, আমি আনন্দিত।'

—এমনি একটি অবস্থা।

আলমোড়ার তীর্থজীবনের এই হল, তুই-অধ্যায়-বিভক্ত, অপূর্ব ফলশ্রুতি।

নিবেদিতার সেদিনের বিচিত্র অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে ৺মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন,—'সেদিন তিনি প্রাণে যে কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত মানুষের পক্ষে ধারণা করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র, আমি চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই।

আমার মনে হইয়াছে সে প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়—প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে অশুচি করা হইবে। বোধহয়, তাহা জগতে একটি মাত্র কবির কাব্যকল্পনায় কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে ; সেখানে দেহ ও মনের সমস্ত মলিনতা মুক্ত হইয়া, অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল রোদনরবে বন্দিত হইয়া, সেই প্রেম অতি ঊর্দ্ধলোক হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে।

বিয়াত্রিচের প্রতি মহাকবি দান্তের সেই যে প্রেম, তাহার নাম কি? তাহা ভগবদ্ভক্তির নীচে, না উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় অন্যরূপ বটে, কিন্তু ঐরূপ প্রেমে কি নারী-পুরুষ ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রয় মাত্রেই নারী জাতীয় ; তাহা হইলে দান্তেও সেখানে পুরুষ নহেন—নারী।

আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক মমতা কোন্ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার একটা অক্ষম, অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি ; মানুষের ভাষায় তাহার অধিক অসম্ভব ; আবার, আমার মত মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার মত মহীয়সী নারীর তপোবীর্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ লাভ করি!'···

এ উক্তি স্বর্গীয় লেখকের পক্ষে যতখানি সত্য আমাদের পক্ষে ততোধিক সত্য, ততোধিক প্রযুজ্য। এর একটি বিশেষ কারণ এই যে নিবেদিতার যে দিকটি একান্ত নিজস্ব, একান্ত ব্যক্তিগত—সে দিকটি তিনি নিরতিশয় সংগোপনে আপনার মনকুট্টিমেই রক্ষা করেছিলেন—অপরের কাছে কিছুই প্রকাশ করেন নি। তবে, ঐ শুভদিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি সম্পর্কে উত্তর-জীবনে অবশ্য কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন। বলেছিলেন, 'অনেকদিন পূর্বে একদা আমার গুরুর গুরু, পরমগুরু পরমহংসদেব নিজ শিষ্যবর্গের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন এমন

সময় আসবে যখন নরেন্দ্র স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে দেবে, মানুষের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ভূমার অবন্ধন অমৃতলোকে তাকে উত্তীর্ণ করে দেবে।...

আর আমার অশেষ সৌভাগ্যবশে, পাহাড়ঘেরা আলমোড়ার সেই নির্জন, নিস্তব্ধ বংলোটিতে, সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যালগ্নটিতে—আমারই জীবনে সে ভবিষ্যদ্বাণী মূর্ত হয়েছিল, সার্থক হয়েছিল।

আমি আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে সেই প্রথম অনুভব করেছিলাম যে জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পার্থিব সীমারেখা অতিক্রম করে অপার্থিব সম্বন্ধসূত্রে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রটি কী সুকৌশলে উন্মিলিত করে থাকেন।...

'I understood, for the first time, that the greatest teachers may destroy in us a personal relation, only in order to bestow the Impersonal vision in its place.'

দ্বন্দ্বাতীত জীবনের প্রবেশ মুখের এই অনুভূতি নিবেদিতার অন্তর জীবনের অন্যতম অমূল্য অভিজ্ঞতা। এরই ফলে, অর্ধস্ফুট হৃদ্‌পদ্মটি সর্বমহিমায় বিকশিত হয়েছিল। দেহ, মন, বুদ্ধি—সবই যেন অব্যাহত আনন্দস্রোতে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি।—

এই ছিল অভিভূতচিত্তের অকুণ্ঠ প্রণতি।...

আর ও একটি কথা।...

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও কালের বিচারে—এখানেই তার উল্লেখ করে আমরা নৈনীতাল-আলমোড়ার অধ্যায়টি শেষ করব।...

সে ঘটনাটি স্বামীজীর সাংকেতিক লেখক গুড্‌উইনের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে রচিত। এই আলমোড়ায় বাসকালেই সেই চির-অনুগত ও বিশ্বস্ত মানুষটির মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন স্বামীজী এবং নিরতিশয়

ব্যথিত চিত্তে তাঁর আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করে ইংরাজীতে একটি ভাব-গম্ভীর কবিতাও রচনা করেছিলেন।

পর সে রচনাটি গুড্‌উইনের শোকার্ত জননীর কাছে পাঠান হয়েছিল।

কবিতাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের জন্য এ পর্যায়ের উপসংহারে তার বঙ্গানুবাদ সবটাই আমরা উদ্ধৃত করছি।···

চল আত্মা, শীঘ্রগতি, নক্ষত্র-খচিত তব পথে,
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে ;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ !
সার্থক তোমার সেবা পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমের আসনে হোক তব চির অধিষ্ঠান।
তব স্মৃতি মধুময়—দেশ-কাল দিয়েছে মিলায়ে,
পুষ্পঢাকা বেদীতলে রেখে গেছে সৌরভ বিছায়ে।
টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপ যিনি তাঁর সাথে হ'লে একপ্রাণ,
তুমি তো সহায় ছিলে, স্বার্থহীন ছিলে পৃথিবীতে,
ধীর-গতি, এবে চল সংসারে ঢাকিয়া নিতি,
প্রেমের আলোতে।

পাঁচ

নৈনীতাল-আলমোড়া বাসের একটি মাসের স্মৃতি-কথা পূর্ব পর্যায়ে আমরা বিবৃত করেছি।

সে পর্যায়ের অন্তে, সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন, আলমোড়া পরিত্যাগ করে, কাঠগুদামের পথে, কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেছিল যাত্রীদল। গুড্‌উইনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর থেকেই আলমোড়া ছাড়বার জন্য স্বামীজী যেন ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অধীর হয়েছিলেন একটি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এবং একক জীবনের জন্য।

ফলে, কতকটা স্বতন্ত্র ধরণের কার্যসূচীর মধ্যে তীর্থভ্রমণের পরবর্তী দিনগুলিও তাঁদের অতিবাহিত হয়েছিল। নিবেদিতার মানসিক অবস্থাও এখন প্রসন্নতায় ভরা। বিরাটের স্পর্শ-প্রভাবে অন্তর্মুখিণ। বহিঃপ্রকৃতির বহু-বিচিত্র সৌন্দর্য অবশ্য পূর্বেও ছিল কিন্তু এখন সে সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরের আনন্দ-নির্ঝর মিলিত হয়ে তাকে অত্যন্ত উৎফুল্ল করে তুলেছিল। আর স্বামীজী হয়ে উঠেছিলেন যেন শিবময়।

শিবের চিরন্তন লীলাভূমি হিমালয়, স্বামীজীও শিব-অংশে আবির্ভূত বলে কথিত। তাছাড়া, মৃত্যুর আঘাতের মধ্যদিয়ে অকস্মাৎ যেন জাগ্রত হয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব। এদিকে, যাত্রা পথের দুই পার্শ্বে ক্রোশের পর ক্রোশ ছিল শুধু বিস্তৃত অরণ্যানীর নিশ্ছিদ্র নিবিড়তা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছোট বড় নানা গাছপালায় তারা আকীর্ণ, আর তাদের মধ্যে নেমে-আসা চির-বিস্ময়কর ভারতবর্ষের স্বপ্নভরা রাত্রিগুলি।

তাদের প্রভাব অনতিক্রম্য, তাদের স্মৃতি ভুলবার নয়। শ্রীনগরের পথে—কাঠগুদামের একটি হ্রদের উপরিভাগে একখণ্ড সমতল ভূমিতে একটি দিন যাপন করেছিল যাত্রীদল। সেদিন অপরাহ্ণকালে শিষ্যবর্গের জন্য স্বামীজী রুদ্র-স্তুতিটির অনুবাদ করেছিলেন,—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্মএধি॥
রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥

আমাদিগকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে যাও, তম থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।

হে রুদ্র, আবির্ভূত হও, আমাদের কাছে আবির্ভূত হও।

তোমার যে দক্ষিণমুখ সেটি দিয়ে নিত্য আমাদিগকে রক্ষা কর।

আবিরাবীর্ম এধি—এ-অংশের অনুবাদ করতে গিয়ে স্বামীজী সেদিন অনেকক্ষণ যেন ইতস্ততঃ করেছিলেন। তারপর কতকটা সঙ্কোচের সঙ্গেই যেন বলেছিলেন ঃ

'হে রুদ্র, হে স্বপ্রকাশ তুমি কেবল তোমার নিজের কাছেই প্রকাশিত আছ, এখন আমাদের কাছেও আত্মপ্রকাশ কর।'

উত্তরকালে এই অনুবাদটিকে নিবেদিতা একটি সমাধিকালীন অনুভূতির দ্রুত এবং প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ বলেই বিবৃত করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যেন সে অনুবাদটি সংস্কৃতের দুর্বোধ্যতা থেকে সজীব ভাব-সম্পদটিকে পৃথক করে নিয়ে তাকেই ইংরাজী ভাষায় পুনঃ প্রকাশ করেছিল। এবং সেজন্য এই বিশেষ অনুবাদটি নিবেদিতার কাছে একটি নিগূঢ় তাৎপর্য নিয়েও দেখা দিয়েছিল। আর শুধু উত্তর ভারতের তীর্থভ্রমণের দিনগুলিতেই নয়, সমগ্র পরবর্তী জীবনেও, এই বিশেষ মন্ত্রটির অর্থ উপলব্ধি এবং

বাস্তবক্ষেত্রে তার রূপায়নের সাধনাই নিবেদিতার জীবন-সাধনায় পরিণত হয়েছিল।

'আবিরাবীর্ম এধি'—আবির্ভূত হও, প্রকাশিত হও। হে সর্বব্যাপী পরমাত্মন! আমার অন্তঃস্থলে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হও। আমাকে পূর্ণকর, সার্থক কর।

বায়ু আমার অনুকূল হোক, নদী সকল অনুকূল হোক, ওষধি অনুকূল হোক। অনুকূল হোক রাত্রি ও ঊষা, অনুকূল হোক পৃথিবীর ধূলি। সূর্য, দ্যৌরূপী পিতা, বনস্পতি সবই আমার অনুকূল হোক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু! ·

এই তার প্রার্থনা ছিল, অকুণ্ঠ আবেদন ছিল।

স্বামীজীর ভাবজীবনটিও তখন থেকে যেন এই-মন্ত্রটিবই মূর্ত্য প্রকাশ-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বাক্যে ও আচরণে, ধ্যানতন্ময়তায় ও প্রশান্তিতে তিনি এখন অদ্বৈতভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। দূর অতীতের বৈদিক যুগটি অদ্বৈততত্ত্বের ঐশ্বর্য নিয়ে মুহুর্মুহুঃ স্বামীজীর ধ্যানে এসে যেন ধবা দিচ্ছে। দেবাদিদেব মহাদেবের আহ্বান আসছে হিমালয়ের গিরিগুহাব প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে। ডাক্‌ছেন মহেশ্বর, ডাক্‌ছেন পবমেশ্ববী মহামায়া।···

আর সে ভাব-প্রবাহের অমৃত-আস্বাদ নিয়ত গ্রহণ করছেন সকলে। তাতে অবগাহন কবে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন নিবেদিতা। এমনি ছিল শ্রীনগরের পথেব স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনগুলি।

একদিন গোধূলির স্তিমিত আলোকধারার মধ্যে পার্বত্য-ভূখণ্ডের কোন ঐতিহাসিক স্থান অতিক্রম করবার কালে—স্বামীজীর মনে বিচিত্র পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হয়েছিল। বলেছিলেন:

বহুদিন পূর্বে আমার পরিব্রাজক জীবনের যদৃচ্ছা ভ্রমণের দিনগুলিতে এ-সব নির্জন ভূখণ্ডেরই কোনস্থানে বৈদিক মন্ত্রের

অপ্রাকৃত সুর-তরঙ্গ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। সে এক বিচিত্র শ্রুতি, বিচিত্র অনুভূতি। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। অস্তদিগন্তে সূর্যরশ্মির শেষ স্বর্ণাভা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর্যগণ যে-যুগে সিন্ধুনদ-তটে পদার্পণ করেছিলেন—এ সেই যুগের সন্ধ্যা।···

আমি দেখেছিলাম—সেই অপূর্ব উদাসীন-সন্ধ্যায় বিশাল সিন্ধুনদ-তীরে এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। নিঃসঙ্গ, একাকী। ধীরে ধীরে গাঢ় তমিস্রা যেন তরঙ্গাকারে এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিল। আর তারই মধ্যে, সেই ঘনান্ধকারের নিবিরতার মধ্যে, বিশুদ্ধ সুর-সংযোগে তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছেন। সে সুর নিখুঁত বৈদিক সুর। আর আমিও যেন সেই সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করছি ঃ

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ।

এবং তৎক্ষণাৎ, মন্ত্রাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছিল যে একদিন আচার্য শঙ্করও হয়ত আমারই মত কোন অতিন্দ্রীয় দর্শনের মধ্য দিয়েই বেদের যথার্থ বাচন-ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।···

এ-সব দিব্য ভাবরাশী নিবেদিতার উর্ব্বর মানসক্ষেত্রে কত গভীর ভাবে প্রবিষ্ট হত, কত ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করত—তা বলা যায় না। কারণ, তার পরিমাপই সহজ নয়।

বাহ্য স্থূলজগতের যে ইতিহাস, সেটি সাধারণতঃ ঘটনা-নিরপেক্ষ হয় না, বস্তু-নিরপেক্ষও থাকে না। কোন-না-কোন কার্য-কারণ সম্পর্কে সে ইতিহাস গ্রথিত থাকে। সুতরাং, তার উত্থান-পতনও বোঝা যায়, গতি-প্রগতিও অনেকটা অনুধাবন করা চলে।

কিন্তু, অন্তর জগতের ইতিহাসের ধারা স্বতন্ত্র। সে ইতিহাস অদৃশ্য চিন্তাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে রচিত হয় : সূক্ষ্ম ভাব-বিনিময়ের ভিতর দিয়ে সে গড়ে উঠে। কাজেই, তাকে ধরা যায় না, তার সঠিক

পরিমাপও করা চলেনা। অনুভূতি-হীন সাধারণ মন সে-ইতিহাসের রহস্যাবৃত কক্ষের রুদ্ধ দ্বার-প্রান্ত থেকে ব্যর্থ হয়ে—'বারে বারে আসে ফিরে ফিরে।'

তথাপি সে ইতিহাস অক্ষয়, সে ইতিহাস চিরন্তন।

গুরু-শিষ্য-সংবাদের পুণ্য-আখ্যায়িকার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে এই ইতিহাসই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত থাকে। কাজেই, স্বামীজীর জীবন ও চরিত্র-প্রভাবে এইকালে নিবেদিতার অন্তর জীবনে যে রূপান্তর অতি দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল তার সঠিক পরিমাপ আমরা করতে পারিনা, করা সম্ভবই নয়। শুধু তার একটি মোটামুটি পরিচয় আমরা লাভ করি নিবেদিতারই আত্ম-কথা থেকে, নিবেদিতারই স্বহস্ত-অঙ্কিত নানা বর্ণবহুল জীবন-চিত্র থেকে।...

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষত্ব ও মহাপুরুষ সংশ্রয়—একান্ত দুর্লভ বলে বর্ণনা করেছেন আচার্য শঙ্কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয় পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ এ-প্রসঙ্গে বলতেন,—প্রথম দু'টি বস্তু, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব এবং মুমুক্ষত্ব দুর্লভ হলেও সুদুর্লভ নয়। কারণ, তারা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম-প্রয়াসের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু যথার্থ দুর্লভ বস্তু সংসারে যদি সত্যিই কিছু আছে, যাকে সু-দুর্লভই বলা যায়, সেটি মহাপুরুষ সংশ্রয়। কারণ, সেটি দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করে, শুভ ভাগ্যফলের উপর নির্ভর করে। যথার্থ অধিকারিক পুরুষ কিছু যখন-তখন আবির্ভূত হন না। তাঁদের সংশ্রয় বা প্রসাদও সেই হেতু সুলভ সম্পদ হতে পারে না। অশেষ সুকৃতিবশে কচিৎ কখনো কারো ভাগ্যে তেমন সম্পদ লাভ হয়ে থাকে। এবং হলে,—'যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—এমনি একটি পরম কাম্য অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন জানার মধ্যে অজানার সন্ধানে সমগ্র সত্ত্বা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, বহুর মধ্যে একের অস্তিত্ব উপলব্ধিতে আনন্দ-উৎস খুলে যায়।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনান—
মেকো বহূনাং যে বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।

তখন বিস্ময়, মহা-বিস্ময় জাগে ধ্যানে, জাগে গানে, জাগে রক্তের তরঙ্গ দোলায়। তখন মনে হয়,…বিশ্বকবি যেমন বলেছেন…

'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'…

অনুভূত হয় এই সত্য যে—

'ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধারার বুকে প্রাণ ঢেলেছি—
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।'

নিবেদিতার পুণ্য জীবনেও একালে এমনি এক মহাবিস্ময় জাগ্রত হয়েছিল,—যে বিস্ময় সকল দর্শনের মূল, অক্ষয় আনন্দ-লোকে প্রবেশ করবার শাশ্বত পাথেয়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

আমরা কাঠগুদাম ও বারমুল্লার বিচিত্র-মধুর দিনগুলির কথা বলছিলাম। বলছিলাম যে এই বারমুল্লা এবং শ্রীনগর বাসের দিনগুলিতেই অব্যাহত সমাধিপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসপতি মহেশ্বরের ধ্যানে স্বামীজীর মন বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল। হিমালয়ের শিখরে শিখরে, নানা গুহা ও গহ্বরে, হ্রদে ও নির্ঝরে মৃত্যুঞ্জয় সে দেবতার শত পুণ্য-আখ্যায়িকা লুক্কায়িত রয়েছে। এই তাঁর লীলাস্থল, এই তাঁর চিরন্তন বিহারভূমি। সুতরাং, এস্থানে এসে স্বামীজীর মন স্বতঃই মহাদেবের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া আরও একটু রহস্য এর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

বারমুল্লার পথে কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী নিজেই সে রহস্য বিবৃত করেছিলেন নিবেদিতা প্রমুখ শিষ্যবর্গের কাছে।

একদা বীরেশ্বর শিবের কাছে বর প্রার্থনা করে জননী ভুবনেশ্বরী নরেন্দ্রনাথকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতে সে কাহিনী বর্ণিত আছে। তারই সূত্রানুসরণ করে বলেছিলেন ঃ

'শৈশব-জীবনে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলাম বলে আমার মা অত্যন্ত বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত হতেন। কখনো কখনো আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি হতাশার ভাবও হয়ত তাঁর মনে উদিত হত। সে সব মুহূর্তে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে বলতেন,—এত জপ উপবাসের ফলে শিব কোথায় একটি শান্ত, ধর্মভীরু পুত্র পাঠাবেন, তা না করে কিনা, তোকে,—একটা ভূতকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন।' ...একথা শৈশবজীবনের সেই কল্পনা-মুখর দিনগুলিতে পুনঃ পুনঃ শুনতে শুনতে এ বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যে আমি সত্য সত্যই শিবের ভূত। হয়ত কোন কারণে, কোন ভুলের জন্য সাময়িকভাবে শিবলোক থেকে নির্বাসিত হয়েছি। অতএব আবার আমাকে সে লোকেই ফিরে যেতে হবে। সেই আমার স্ব-স্থান, আমার আপন নিকেতন।...

আমার শৈশব-জীবনে আরও একটি ব্যাপার হত। কেউ আমাকে বাধা দিলে আমি একেবারে দুর্বার হয়ে উঠতাম। প্রচণ্ড ক্রোধ যেন আমাকে গ্রাস করত। সে এক উৎকট ব্যাধির মত উপসর্গ ছিল। আমার মা সে ব্যাধিরও একটি অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন। আমি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলে—'শিব, শিব' উচ্চারণ করতে করতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল তিনি আমার মাথায় ঢেলে দিতেন। কেন জানিনা, সে ঔষধ আমার জীবনে কখনো ব্যর্থ হয়নি। সে বারিস্পর্শে মুহূর্তে আমার বিজাতীয় ক্রোধ অন্তর্হিত হত। আমি শান্ত হয়ে যেতাম। তখন কেবলই

নির্বাসনের কথাটি আমার মনে উদিত হত, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি সঙ্কল্প ধ্বনিত হয়ে উঠত, 'আর নয়, আর কখনো নয়।'

কোনদিন আবার হিমালয়ের খরস্রোতা পার্বত্য নদীগুলির প্রসঙ্গে স্বামীজী কথা তুলতেন। বলতেন, ঐ উচ্ছল, নৃত্যচপল জলধারাগুলির কলধ্বনিতে কোন্ কথা, কোন্ মন্ত্র নিহিত তা কি কেউ জানে? তার গাত্রবাহী অজস্র নির্ঝরিণী কোন্ মহতী বার্তা প্রচার করতে নিয়ত ব্যাপৃত থাকে,—সে তথ্য কি কেউ অবগত আছে? স্বামীজী স্বয়ং আজীবন পর্বতগাত্রে কান পেতে পেতে ঐ তথ্য জানতে চেয়েছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন। আর তারই ফলে তিনি অনুভব করেছিলেন যে সে ধ্বনি আর কিছু নয় শুধু অনাদি কালের এক অনাহত ধ্বনি, এক মহানাদ, মহামন্ত্র 'হর, হর বোম্ বোম্, হর হর বোম্ বোম্।'

স্বামীজী বলতেন, হ্যাঁ, 'তিনিই দেবাদিদেব—তিনিই মহেশ্বর।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া তত বিশ্বমনন্তরূপ।

তিনি সান্ত, তিনি চির সুন্দর, মহামৌনী।'

বলতেন,—'আমি তাঁর দাস, দাসানুদাস। তাইতো আমি কৃতার্থ, আমার ধন্য জীবন।'

ভাবাবেশে তন্ময় হয়ে কখনো কখনো অনবদ্য সুর-সংযোগে আবৃত্তি করতেন শিবস্তোত্র···

'কস্তূরিকা চন্দন লেপনায়ৈ
শ্মশান ভস্মাঙ্গ বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।
মন্দারমালা পরিশোভিতায়ৈ
কপাল মালা পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।'

সে অপার্থিব অমৃত-মধুর সুর-তরঙ্গ হিমালয়ের স্তব্ধ নিরবতায় স্পন্দিত হত। মুহূর্তে সকলের ধ্যানমানসে জাগ্রত হতেন মহেশ্বর, জাগ্রত হত গভীর বৈরাগ্য প্রেরণা। নিবেদিতার সমগ্র সত্তা, সমগ্র চেতনা যেন ধ্যানের অবাচ্য-মহিমার আস্বাদ পেয়ে ধন্য হত, কৃতার্থ হত।···

এই শিব-তন্ময়তা থেকেই, শ্রীনগরবাসের কালে, তুষার-তীর্থ 'অমরনাথ' দর্শনে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন স্বামীজী।

কঠিন, দুর্গম তীর্থ অমরনাথ। তার পৌরাণিক ইতিবৃত্তও বিচিত্র। সেকথা যথাস্থানে বলব।

ইতিমধ্যে, অমরনাথ যাত্রার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার পূর্বে, আরও কয়েকটি অবিস্মরণীর দিন যাপিত হয়েছিল শ্রীনগরে, কাশ্মীর-উপত্যকায়। সেই দিনগুলিতে স্বামীজীর সঙ্গীরূপে—অরণ্যশোভিত বিতস্তা নদীর তীরের দীর্ঘ পাদচারণের প্রভাত ও অপরাহ্নগুলি নিবেদিতার জীবন যেমন অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছিল, তেমনি পণ্ড্রেস্থান মন্দির কিংবা অবন্তীপুর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কী বিচিত্র ছিল পরিবেশ, কী তুলনাহীন ছিল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ!

পণ্ড্রেস্থানের মন্দিরটি ভগবান বুদ্ধের জীবন-স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। সুতরাং, সে মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বামীজী স্বতঃই অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধ-প্রসঙ্গ চিরদিনই তাঁর অতি প্রিয়বস্তু ছিল এবং সেজন্য এক কথার পুনরাবৃত্তি করেও যেন অনেক সময় তাঁর তৃপ্তি হত না। পণ্ড্রেস্থান মন্দির প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে বলেছিলেন:

দেখ, পৃথিবীতে যুগে যুগে যত মহামনীষী জন্ম গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে বুদ্ধদেব নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এত প্রেম, এত নিঃস্বার্থপরতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজের জন্য কখনো একটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেন নি।

কোন বিশেষ মর্যাদার উপর তাঁর দাবী ছিলনা। দেবতা বলে বা অবতার বলে মানুষ তাঁকে পূজা করবে এমন ধারণাও তিনি পোষণ করতেন না। জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সার্থক সমন্বয়ে তাঁর জীবনটি শোভান্বিত ছিল।

বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, কোন আধিকারিক পুরুষ নন। বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা বিশেষ। সে অবস্থায় পৌঁছাবার পথটিও তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। আর তাঁরই কণ্ঠ থেকে সর্বকালের, সর্বদেশের মানুষের জন্য উদ্‌গীত হয়েছিল এই মহা আহ্বান,—

'হে মানব, বুদ্ধত্বলাভের নিশ্চিত পথ আমি তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিলাম। এস, যাত্রা কর। মহাশান্তিময় বুদ্ধত্ব-লাভ করে ধন্য হও।'...

এ-সব বলতে বলতেই, স্বামীজীর যা চিরন্তন স্বভাব, সেই স্বভাব বশে মুহূর্তমধ্যে তিনি বুদ্ধময় হয়ে উঠতেন। তাঁর অন্তর-বাহির শ্রীবুদ্ধের ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে যেত। আর অদৃশ্য অনুভূতির পথে তারই শক্তি-তরঙ্গ নিবেদিতার চিন্তা-মানসে সৃষ্টি করত ব্যাপক উদ্দীপনা, জাগ্রত করত গভীর রোমাঞ্চ, এবং তার প্রভাবও ক্ষণস্থায়ী ছিলনা।...

আবার একদিন, এক অপরূপ সূর্যাস্তের সময়টিতে, মুক্ত-আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বলেছিলেন :

মন্দির স্থাপনের ব্যাপারে হিন্দুপ্রতিভা চিরদিনই অদ্ভুত উৎকর্ষ দেখিয়েছে। মন্দিরের জন্য স্থান নির্বাচনেও সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল। প্রকৃতির অতি শোভাময় ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কোথাও মন্দির স্থাপনে সে অগ্রসর হত না।

এখানেই দেখ, এই তক্ত থেকে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাটি দেখতে পাওয়া যাবে। নীল বারিরাশীর মধ্য থেকে লোহিতাভ হরপর্বত উর্দ্ধ-আকাশে উঠে গেছে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটি সিংহ অর্ধশায়িত ভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করছে। আর মার্তণ্ডের

পাদমূলে একটি বিস্তৃত উপত্যকা নিথর হয়ে, শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ধর্ম-সাধনার এমন অনুকূলভূমি অত্যন্ত দুর্লভ। এমনি দেখতে পাবে সর্বত্র।···

ফলকথা, একালের অতি উচ্চ চিন্তাধারার অব্যাহত স্রোতে, যে-স্রোত স্বামীজীর জীবন-গোমুখী থেকে নিরন্তর উৎসারিত হত, সেই স্রোতে অবগাহন করে ক্ষণে ক্ষণে নবজন্মের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন নিবেদিতা, অগ্রসর হচ্ছিলেন অপরাপর সহযাত্রীগণ।···

আবার, এ-সময়েই নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাও ধীরে ধীরে রচিত হতে শুরু করেছিল। একটি প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা নিবেদিতাই প্রথম রচনা করেছিলেন।···

ভারতীয় নারীর শিক্ষা-প্রয়াসকে ধর্মভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। যুগ-মানব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতঃ জীবনটি হবে আদর্শ এবং সে আদর্শটিকে ঘিরেই হবে সমগ্র পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন।···

স্বামীজী শুনে শুধু বলেছিলেন,—'ভাল! তুমি অগ্রসর হও। এ-সম্পর্কে কোন সমালোচনা আমি করবনা। সেটা সঙ্গত হবে না। আমি জানি, তুমি ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েই কর্মে ব্রতী হচ্ছ। অতএব, তুমি যে পথটিকে সবচেয়ে ভাল বিবেচনা করবে সে পথেই কাজে অগ্রসর হবে। আমার কাজ হবে শুধুমাত্র তোমাকে সাহায্য করা। সে সাহায্য আমি করব। সাধ্যমত করব, সর্বভাবে করব।'

এসব কথার অব্যবহিত পরে, অকস্মাৎ আর একদিন, পূর্বকথার সূত্র ধরে, নিবেদিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আশীর্বচন উচ্চারণ করতে করতেই যেন বললেন:

'তবে হ্যাঁ, আরও একটি কথা এ-প্রসঙ্গে বলতে হবে। আমি জানি, তোমার বিশ্বাস আছে, অনুরাগ আছে। কিন্তু সে বিশ্বাসের সঙ্গে উৎসাহ চাই। সে উৎসাহ জ্বলন্ত অগ্নির মত তেজোময় হবে,

দীপ্তিময় হবে। আমি আশীর্বাদ করি তুমি 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্'—অবস্থা লাভ কর। ওঁ শিব, শিব।'···

কাশ্মীর-উপত্যকার শেষ রজনীর সেই শেষ আত্মগত আশীর্বাদ।

সেদিনের তারিখ ছিল ২৪শে জুলাই।

নিবেদিতার জীবন-পঞ্জীতে এ দিনটির কথা এইভাবে উল্লিখিত আছে ঃ

পরদিন প্রাতঃকালে একটি তাবুর মধ্যে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে আমরা আচ্ছাবল পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেদিন আমাদের মধ্যে একজন একটি স্নুন্দর স্বপ্ন-দর্শনের কথা বিবৃত করেছিলেন।

আর স্বামীজী বলেছিলেন,···'আহা, অমন স্নুন্দর স্বপ্নের কথা কি বলতে আছে?'

ঐ আচ্ছাবলেই একাধিক মনোহর উদ্যান আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের সে-সব উদ্যান। তাদের চারদিকে অপূর্ব উৎসাহে আমরা ভ্রমণও করেছিলাম।···

পরে প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করেছিলাম। তারপরই ইসলামবাদ। অপরাহ্ণে অশ্বপৃষ্ঠে আচ্ছাবল থেকে আমরা ইসলামবাদ নেমে আসি।'···

আচ্ছাবলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের টেবিলেই স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে অমরনাথ গুহামন্দিরে যাওয়ার জন্য এবং সেই তীর্থে মহাদেবের শ্রীপাদপদ্মে উৎসৃষ্ট হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নিবেদিতার আত্মকথায় আছে যে—সে আহ্বানে ধীরামাতা আন্তরিক সম্মতিজ্ঞাপন করবার পর প্রায় আধঘণ্টাকাল বিশেষ উল্লাসের মধ্যে তাঁদের অতিবাহিত হয়েছিল। পরে, সেদিনই সন্ধ্যায় নৌকায় জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে, চব্বিশ ঘটার মধ্যেই বওয়ানার পথে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন।

অমর কথা। কিন্তু দৈববিধানে, অনতিকাল মধ্যে দেবী নিদ্রিত হয়ে পড়লেন, অথচ গুহার বহির্ভাগ থেকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসতে থাকল,—হুঁ, হুঁ শব্দ, এক অদ্ভুতদর্শন তোতা-পাখীর কণ্ঠ থেকে।

সেও এক বিচিত্র কাহিনী। পুরাবৃত্তে সে-কাহিনীও উল্লিখিত আছে। উল্লিখিত আছে যে একদা এক অপরাধী নরপতি ব্রহ্মশাপে তোতাপাখী হয়ে জন্মেছিল।

অভিশাপগ্রস্ত নরপতির একান্ত কাতরতায় শান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অবশ্য বলেছিলেন:

'হিমালয়ে গমন কর এবং ধৈর্যের সঙ্গে সেখানে প্রতীক্ষা কর যথাযথ কালের জন্য। দূর ভবিষ্যতে, সেথাকার এক নির্জন প্রদেশে, দেবাদিদেব স্বয়ং পার্বতীর কাছে অমরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবেন। সে ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।'

এদিকে উপদেশ শেষ করে মহাদেব চোখ খুললেন। খুলে বিস্মিত হয়ে দেখলেন,—ঘুমিয়ে আছেন পার্বতী।

অবশ্য পার্বতীও সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হয়ে উঠলেন। তখন শিব তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,—

'অমর উপদেশ কি তুমি শ্রবণ করেছ?'

লজ্জিত হয়ে স্বীকার করলেন পার্বতী। না, তিনি শুনতে পান নি। বিজাতীয় ঘুম তাঁকে পেয়ে বসেছিল।...তবে হুঁ-শব্দ মধ্যে মধ্যে কে উচ্চারণ করেছিল, কে সংগোপনে বসে শ্রবণ করল সেই নিগূঢ় তত্ত্ব?—স্বাভাবতঃই এ-প্রশ্ন উদিত হল শিবের মনে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখে পড়ল—গুহার মুখে উপবিষ্ট সেই তোতাপাখী।

শিব তৎক্ষণাৎ পাখীটিকে ধরবার জন্য ধাবিত হলেন। কিন্তু তোতা অতি দ্রুত গতিতে উড়ে গিয়ে তর্পণরতা ব্যাসপত্নীর মুখের মধ্যে আশ্রয় নিল।

সতী নারীর আশ্রয় লাভ করেছে দেখে শিব প্রত্যাবর্তন

করলেন। নিস্তার লাভ করল তোতাপাখী। যথাকালে ঐ তোতাপাখীই ব্যাসপুত্র, পরমহংস শুকদেবরূপে জগতে আবির্ভূত হয়েছিল।…

ভৌগলিক বিচারে অবশ্য পুণ্যতীর্থ অমরনাথ এক বিপুলয়াতন পর্বতগুহা। অভ্যন্তর ভাগটি আলোক বর্জিত। এক নজরে সবটা দেখাই যায় না।

গুহার শেষ প্রান্তটিতে তুষার নির্মিত শিবলিঙ্গ, তুষার ঢাকা গৌরীপট। প্রকৃতির স্বকীয় রচনা, স্বতঃসৃষ্ট মহাতীর্থ। শিবলিঙ্গের পার্শ্বেই সর্বসিদ্ধি গণপতি।

বাস্তব জগতের কলকোলাহল থেকে দূরে, বহুদূরে সে এক অতুলনীয়, রম্য-নিকেতন। মহামৌন পর্বতশ্রেণীর মধ্যদিয়ে চড়াই-উত্‌রাই এ· কঠিন পাক্‌দণ্ডী বিসর্পিত। চারদিকে অন্তহীন তুষার পুঞ্জ স্তব্ধ উর্মিমালার মত যুগ-যুগান্তের নিরব সাক্ষ্য বহন করে অবস্থিত রয়েছে। সে নিবিড় গাম্ভীর্য ও বিশালতা,—শত পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত সে অনবদ্য তীর্থ-মহিমা—সর্বকালে অক্ষয় ও তুলনাবিহীন।

কত সন্ন্যাসী, কত যোগী-ঋষি, কত ভক্ত নরনারী যুগে যুগে এ পুণ্যতীর্থ দর্শন করতে এসেছে। এ পথেই এসেছে। আবার, প্রাণের ভক্তি ও আকুতি নিঃশেষে নিবেদন করে ধন্য হয়ে ফিরে গেছে, অথবা এখানেই দেহরক্ষা করেছে। দশ, বিশ বা শতবৎসরেরও এ ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন। ভারতবর্ষের ধর্মেতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সে জড়িত।…

আজ সেই দুর্গম অমরনাথের পথেই চলেছেন ভস্মাবৃত-তনু কৌপীন-সম্বল আচার্য বিবেকানন্দ। পশ্চাতে তদীয় মানসকন্যা বিদেশিনী, ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা। জাতিগত ও ধর্মগত গোঁড়ামির মাপ-কাঠিতে সে পুণ্যতীর্থে নিবেদিতার প্রবেশ বাঞ্ছিত ছিল না। পহল্‌গামের ছাউনীতে সেজন্য গোঁড়াপন্থী সন্ন্যাসীদের অনেকের

মধ্যে আপত্তির গুঞ্জনও যে না শোনা গিয়েছিল তাও নয়। কিন্তু আঞ্চলিক ধর্মের কূপমণ্ডুকতার ঊর্দ্ধে যে মানবধর্ম,—সে ধর্মের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সে আপত্তি মাথা তুলতে পারে নি। তাই, গুরুর পশ্চাতে ভক্তিবিনম্রচিত্তে, বদ্ধাঞ্জলি নিবেদিতাও পায়ে হেটে হেটে চলেছেন, তুষার লিঙ্গরূপী মহাশিব সন্দর্শনে। নিবেদিতার সমগ্র অন্তর তখন এক অব্যক্ত, আনন্দ-চেতনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে পর্বতগাত্রে ধ্বনিত হচ্ছে শিব-সঙ্গীত, নির্ঝরিণীর কলমর্মরে শব্দিত হচ্ছে অস্ফুট জপ-মন্ত্র—শিব, শিব। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত তপোফল মূর্ত হয়ে যেন নিবেদিতার ধ্যানে ও চিন্তায় অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, - এই প্রাচীন মহাতীর্থ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিস্মৃতির অন্তরালে হাবিয়ে যাবাব মত হয়েছিল। তারপর দৈবনির্দেশেই বোধকরি— •কদল পার্বত্য মেষপালক আকস্মিক ভাবে এ স্থানটিকে আবার আবিষ্কার করে।

একদিন গ্রীষ্মকালে নিজ নিজ মেষযূথেব সন্ধান করতে করতে এই অমরনাথ গুহার মধ্যে তারা প্রবেশ কবেছিল" এবং অদ্রব তুষাররূপী সাক্ষাৎ 'ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধিতে ধন্য হয়েছিল। তাবপর, তাদেরই মুখে ক্রমে ক্রমে এই বাণী প্রচাব লাভ কবে যে---

ভোলানাথ নিয়ত এ গুহা-মন্দিরে সমাধিমগ্ন আছেন এবং এখানে কোন মানুষ রাত্রিবাস করবার অধিকাবী নয়।···

সে যাই হোক, গুরুর পশ্চাদ্বর্তিনী হয়ে নিবেদিতা প্রবেশ করলেন গুহামন্দিরে। তারপব? তাঁর সে দিনের অনুভূতির স্মৃতিকথা?··· সে কথা আমার জানিনা, হয়ত কেউ-ই জানেনা। তবে, স্বামীজীর অনুভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী অবশ্য আছে। তাতে দেখা যায়,-

গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সময়টিতে স্বামীজীর মুখে এক অলৌকিক দিব্য আভা দীপ্তিমান ছিল। গুহায় প্রবেশ করে প্রথমে অর্ধবৃত্তের একপ্রান্তে, অতঃপর অপর প্রান্তটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে

তিনি প্রণাম করেছিলেন। স্থানটি ছিল সুপ্রশস্ত, একটি ছোট ধরণের গীর্জার স্থান হতে পারে তার মধ্যে।

প্রায়ান্ধকার গহ্বরের অভ্যন্তরস্থিত সেই শিবলিঙ্গটিকে যেন নিজ সিংহাসনে সমারূঢ় মহা-মহেশ্বর বলেই অনুমিত হচ্ছিল।

স্বামীজীর দৃষ্টির সম্মুখে যেন স্বর্গের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল অকস্মাৎ। তিনি সদাশিবের পাদস্পর্শ করে পরমানন্দের অতল সমুদ্রে অবগাহন করেছিলেন। অথচ ভাবাবেগ যাতে অত্যন্ত প্রবল হয়ে তাঁকে এককালে অভিভূত না করে ফেলে সেজন্য সাবধানতাও ছিল যথেষ্ট। বেশীক্ষণ আর তিনি মন্দিরে অপেক্ষা করেন নি। অল্প সময় পরেই বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর, মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার কিছুক্ষণ পর, প্রাতরাশের টেবিলে বসে নিজেই নিজ বিচিত্র উপলব্ধির আভাস দিয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে। বলেছিলেন,—'আজ যে কী গভীর আনন্দ উপভোগ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব, মহা-আবির্ভাবে পূর্ণ সাক্ষাৎ মহেশ্বর। আজ জীবন্ত হয়ে তিনি আমার আছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। প্রতিকূল কিছু ছিল না, চিন্তার ব্যাঘাত ঘটবে—এমন কিছু ছিলনা। কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবে, ধ্যানের ভাবে পূর্ণ ছিল পরিবেশ। আর কোন তীর্থে এমন অফুরন্ত আনন্দ আমি কখনো উপভোগ করিনি।'

সেদিন, সেই দুর্লভ লগ্নটিতে সকল কর্মৈষণা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করে মহাসমাধি লাভের আকাঙ্ক্ষাও কি স্বামীজীর মনে জাগ্রত হয়েছিল? কর্ণে কি পশেছিল ডাক---'মন চল নিজ নিকেতনে?'

হয়ত হয়েছিল, অন্ততঃ নিবেদিতার মনে তেমনি একটি ধারণা যে রূপ নিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, তদীয় স্মৃতি-কথায় উল্লিখিত আছে:

—'স্বামীজীর গুরুদেবের যে ভবিষ্যদ্বাণী,—ও যেদিন নিজকে জানতে পারবে সেদিন আর ওর শরীর থাকবেনা—সেটি অতি বিচিত্ররূপে সেদিন প্রায় পূর্ণ হয়েছিল।' তুষারদেহ অমরনাথ সেদিন সত্য সত্যই তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বরদানে কৃতার্থ করেছিলেন। স্বামীজী স্বয়ং পরে নিবেদিতার কাছে প্রকাশও করেছিলেন সে রহস্য।···

আর নিবেদিতা?

তাঁর অভিজ্ঞতার অবশ্য কোন সাক্ষ্য নেই, সেকথা পূর্বেই বলেছি। তবে, এটাও সত্য যে নিবেদিতাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন —এক সচল, জীবন্ত শিবকে। নিরবচ্ছিন্ন জপ-পরায়ণ, ধ্যান-স্তিমিত লোচন, ভস্মাবৃত-তনু স্বামী বিবেকানন্দকে।

অমরনাথের অপ্রাকৃত দর্শন হয়ত সেদিন তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। অথবা, স্বামীজী ইচ্ছা করেই সে সৌভাগ্য তখনই তাঁকে দান করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে দেবাদিদেবের দুর্লভ দর্শন নিবেদিতার ভাগ্যে সেদিন ঘটত—নিবেদিতার অবচেতন মনে এমন একটি বিশ্বাস ছিল এবং সেজন্য অভিমানও হয়ত কিছুটা ছিল। নচেৎ, তীর্থ-দর্শনের অব্যবহিত পরেই নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজী একথা বলতেন না,—

'নিবেদিতা, অমরনাথের তীর্থযাত্রা তোমার সুসম্পন্ন হয়েছে। ঠিক এখনই হয়ত তার ফল তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না। কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্ক অনিবার্যভাবে ফলপ্রসূ হবে। যথা সময়ে সে তত্ত্ব উপলব্ধি করবে তুমি। এ তীর্থদর্শনের ফল ব্যর্থ হবার নয়।'

স্বামীজীর সে আশীর্বাদ নিবেদিতার উত্তর জীবনে সর্বাংশে সত্য হয়েছিল। ধর্মের যে জীবন্ত, জাগ্রত প্রত্যক্ষানুভূতি—তার একটি কালজয়ী প্রভাব আছে। দুঃখে-সুখে, বিষাদে-প্রসাদে নানা

অনুকূল-প্রতিকূল আবর্তের মধ্য দিয়েই সে সার্থক হয়, পূর্ণ হয়। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের সর্বরিক্ততার আদর্শে ও পুণ্যে নিবেদিতার উত্তরকালের সকল সাধনা এবং কর্ম-প্রয়াস, এক কথায়, সমগ্র উত্তর জীবনটিই অভিষিক্ত হয়েছিল।

কারণ, নিবেদিতার নিজের ভাষায় বলতে গেলে,—'সে কালটি যেন একটি প্রত্যক্ষ ভাগবৎ-সান্নিধ্যে পরমানন্দে দিন যাপনেরই কাল ছিল আমাদের।

জাগতিক সকল বিক্ষেপের ঊর্দ্ধে ও বাহিরে সে ছিল এক শান্ত অতিন্দ্রীয় জীবন। তখন, মানুষ থেকে ঈশ্বর, স্থূল বাস্তব থেকে অপ্রাকৃত ধ্যানজগৎ হয়ে উঠেছিল অধিকতর প্রত্যক্ষ, অধিকতর জীবন্ত।'...

এমানভাবে, অমরনাথের তুষার-তীর্থ দর্শন সমাপ্ত হয়েছিল।

রাখী-পূর্ণিমার সময় বলে তীর্থযাত্রীদের অনেকে লাল ও পীতবর্ণের রাখী বেঁধে দিয়েছিল তাঁদের হাতে। তারপর, পুনঃ যাত্রা করেছিলেন যাত্রীদল।

প্রত্যাবর্তন পথে,—পহল্‌গামে পৌঁছাবার অব্যবহিত পূর্বে 'হাতিয়ার তলাও' বা লেক অব্‌ ডেথ-এর প্রান্তবাহী পথটিরই বা কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল!

* * *

সে এক অপরিসর পাগ্‌দণ্ডী পথ। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে চলে এসেছে পথটি।

শোনা গেল, বৎসর কাল পূর্বে, সেই পথ ধরে, হাতিয়ার তলাওর পাশ দিয়ে এক বৃহৎ যাত্রীদল নেমে আসছিল। কণ্ঠে তাদের সম্মিলিত স্তোত্র-ধ্বনি। প্রাণের উল্লাসে মহাদেবের মহিমা সমস্বরে কীর্তন করতে করতে তারা নেমে আসছে। কিন্তু অকস্মাৎ, স্তোত্র পাঠেরই কম্পনে বিশালাকৃতি একটি তুষার-প্রবাহ, যাকে এভালাঙ্ক্‌ বলে, স্থানচ্যুত হয়ে যাত্রীদলের এক বৃহৎ অংশকে,

সংখ্যা হিসাবে প্রায় চল্লিশজন যাত্রীকে, ঐ উচ্চ শিখরদেশ থেকে একেবারে নীচে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে দেয়।···

আজ সেই পথে, সে করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে নিবেদিতা প্রমুখ যাত্রীদলও এগিয়ে চলেছেন নিম্ন উপত্যকার উদ্দেশ্যে, শ্রীনগরের পথে।

ক্রমে ঘনিয়ে এসেছিল রহস্যময় পার্বত্য সন্ধ্যা। নিবেদিতার স্মৃতি-পঞ্জীতে সে সন্ধ্যার মধুর চিত্র অঙ্কিত আছে ঃ

'পহল্‌গামের জ্যোৎস্নালোকিত শেষ রাত্রিটি ছিল অনন্ত রহস্যে আবৃত। সেদিন সন্ধ্যাকালে পহল্‌গামের ঠিক ঊর্দ্ধ প্রদেশটিতে পাইন কাঠের সাহায্যে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে মাটির উপর আচ্ছাদন বিছিয়েই আমরা উপবেশন করেছিলাম। আর শত মনোহর কাহিনী ও প্রসঙ্গের আলোচনায় আমাদের সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

নির্মেঘ আকাশে চাঁদের প্রকাশ ও শোভা ছিল যেন অতুলনীয়। খরস্রোতা পার্বত্য নদীগুলি জ্যোৎস্নালোকে স্নাত হয়ে অশ্রান্ত প্রবাহে প্রবাহিত, --নিম্নগা অপগা।

তপস্যারত ঊর্দ্ধবাহু মুনিঋষির মত দাঁড়িয়ে আছে—'ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃকম্পিত দেবদারু।'--কালের সাক্ষীর মত। তপোমগ্ন ধরিত্রীর প্রাণ-বহ্নির নিষ্কম্প ঊর্দ্ধশিখার মত। সে গাম্ভীর্যের তুলনা নেই, সে প্রশান্তির শেষ নেই।'

পহল্‌গামের পরই ইসলামবাদ হয়ে তাঁদের শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন। ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে, এবং মাত্র কয়েক দিন, ৯ই থেকে ১৩ই আগষ্ট পর্যন্ত, এবার শ্রীনগরে অবস্থান।

এ সময়েই একদিন—কাশ্মীর উপত্যকার অনবদ্য নৈসর্গিক পটভূমিতে—নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতে করতে—ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। আর প্রসঙ্গতঃ, দেশের অগণিত নর-নারীর ব্যাপক দুর্গত

অবস্থার কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন ধর্ম-সমন্বয়ের আশা ও স্বপ্নের কথা।

সমুদ্রের মত গভীর হও বিশ্বাসে, আকাশের মত উদার হও প্রেমে, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হও ধৈর্যে—এই তো ধর্ম।

কর্মকুশলতা বা ঐক্যবোধ—এর কোনটিই আজ ভারতবর্ষে নেই। ভারতবর্ষের দুর্বলতা এইখানে, তার যাবতীয় আধিব্যাধির উৎসও এরই মধ্যে নিহিত।

সুতরাং, এদিক দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেই তাকে পুনর্জীবিত করতে হবে, নূতন করে গড়ে তুলতে হবে।

রাজস্থানের এক পরম ভক্তিমতী রাজবধূর অপরূপ কাহিনী শ্রবণ কর। সমগ্র মধ্য যুগটিকে আলোকিত করে এই মনস্বিনী মহিলার অনুপম চরিতকথা অক্ষয় হয়ে আছে। 'চেনার তলে' ছাউনি ফেলে সে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন স্বামীজী।

মীরাবাঈ-এর জীবনকথা স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ছিলেন স্বামীজীর ভক্তিমন্ত্রের অন্যতম মুখ্য পৃষ্ঠপোষিকা।

কুখ্যাত দুই দস্যুর আকস্মিক স্বভাব পরিবর্তন আর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁকে গ্রাস করবার যে-সব অপরূপ কাহিনী নানাসূত্রে লোক মধ্যে প্রচলিত আছে,—সেগুলির উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন—এগুলিও মীরাবাঈ-এর জীবনাখ্যায়িকারই অন্তর্গত।···

কৃষ্ণপ্রেমে অহর্নিশি গর্গর মাতোয়ারা থেকেও মীরাবাঈ মহা-তেজস্বিনী ছিলেন, অতি উচ্চ অদ্বৈত বিজ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন।

পরিব্রাজক জীবনে—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী মীরা একদা পথ চলতে চলতে বৈষ্ণবের মহাতীর্থ শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

—শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, গিরিগোবর্ধন
মধুর মধুর বংশী বাজে,
এই তো বৃন্দাবন!···

কথিত আছে—

সেই নিত্যধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য ভক্ত-প্রবর সনাতন গোস্বামীকে তিনি নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সন্ন্যাসীর নীতি-বিরুদ্ধ এবং বৃন্দাবনেরও রীতি-বিরুদ্ধ—এই অজুহাতে সনাতন গোস্বামী মীরাবাঈ-এর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। পর পর তিনবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিস্মিত মীরাবাঈ—'বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীমাধব—আর কোন পুরুষ এখানে আছে বলে তো আমার জানা ছিল না।'—এমনি স্বগতোক্তি করতে করতে নিজেই গিয়েছিলেন সনাতন গোস্বামীর আশ্রমে।

তারপর উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তেজস্বিনী মীরাবাঈ সাক্ষাৎ মাত্র কঠিন ভাষায় সে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভর্ৎসনা করে ছিলেন। বলেছিলেন ঃ

'নির্বোধ, এই বৃন্দাবনধামে নিজকে পুরুষ বলে অভিহিত করবার ধৃষ্টতা তুমি পোষণ কর ? এতো এক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।'

এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজ মুখাবরণ উন্মোচন করে সনাতন গোস্বামীর একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিলন তিনি।

সিদ্ধ-সাধিকার দিব্য আভাময় মুখমণ্ডল দর্শন করবার সঙ্গে সঙ্গে ভীত ত্রস্ত হয়ে আভূমি প্রণত হয়েছিলেন সনাতন এবং মীরাবাঈও বাৎসল্যভাবে, পুত্রজ্ঞানে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।...

* * *

এই কাশ্মীরবাসের দিনগুলির স্মৃতিকথায় আরও একটি ঘটনা অন্যদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

ঘটনাটি ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের তৎকালীন একান্ত অসহায় অবস্থার এক সকরুণ ছবি। নিবেদিতার পক্ষে সে ছবির বিশেষ তাৎপর্য ছিল, প্রয়োজনও ছিল। সে যাই হোক, ঘটনাটি এই—

কাশ্মীর উপত্যকায় একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় বা মঠ স্থাপনের জন্য স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

সেজন্য, কাশ্মীরের মহারাজা একটি পার্বত্য নদীতটে, তিনটি চিনার বৃক্ষছায়ে প্রশস্ত একখণ্ড জমিও দান করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর বড় মনোমত হয়েছিল সে স্থানটি। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, নিবেদিতা প্রমুখ ভক্তগণ ঐ স্থানটিতে ধ্যানে বসতেন, স্বামীজীকে বেষ্টন করে। ফলে, দু'চারদিন মধ্যেই একটি নিবিড় আগ্রহ যেন সে স্থানটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিবাদী হলেন ইংরাজ-সরকার। সরকারী কর্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দেকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই শেষপর্যন্ত, কাশ্মীররাজের সম্মতি-সত্ত্বেও আকাঙ্খিত ভূমিখণ্ড পাওয়া গেল না।

শুধু তাই নয়। এ-সময় স্বামীজীর কার্যকলাপের উপর নজর রাখবার জন্য গুপ্তচরও নিযুক্ত করেছিল ইংরাজ-রাজ।

নিবেদিতার পক্ষে এ অভিজ্ঞতা যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি মর্মান্তিক ছিল। এ তিনি দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। গভীর দুঃখে সে মর্মবেদনা তিনি একাধিক ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেছিলেন। এক বান্ধবীকে এ-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,—জাতি-বিদ্বেষ বলতে কি বুঝায়—ইংলণ্ডে বসে সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আজই সকালবেলায় একজন সাধু এসে সংবাদ জানালেন যে স্বামীজীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হয়েছে। স্বামীজী নিজে অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দিলেন সংবাদটি। কিন্তু আমি এর উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পারছি না। কারণ, আমার মনে হচ্ছে—স্বামীজীর কাজের উপর যে রাজ-সরকার হাত দেবে সে সরকার উন্মাদ। এর ফলে, দেশে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে, এবং আমার মত, যারা স্বভাবতঃই সরকারের অনুগত, তারাও সরকারের বিরুদ্ধবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

তবে আশা করছি, হয়ত আশু এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।···

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পরের মধ্যে একটি মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে—এ আমার বহু-আকঙ্খিত স্বপ্ন।—কিন্তু সে-স্বপ্ন সফল হবে কোন্ পথে?

ইংলণ্ডের দিক থেকে চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতে হবে যে ইংরাজ কর্মচারী এবং রাজ প্রতিনিধিগণ নানাদিক দিয়েই দক্ষতার সঙ্গে ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার মধ্যে এমন কিছু থেকে যায় যার ফলে ভারতের দিক থেকে কোন প্রীতি বা বন্ধুত্বের সাড়া পাওয়া সম্ভব হয় না।

তাছাড়া, কালেরও পরিবর্তন হচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। এখন পরাধীনতার অসম্মান আর কোন জাতিই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। ইটালী অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত চাইছে, গ্রীস চাইছে তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করতে, আর ভারতবর্ষও ইংরাজ শাসনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে।'…

এমনি কত কথা, কত চিন্তার প্রকাশেই না এই কালটি সমৃদ্ধ হয়েছিল, এবং তা হয়েছিল বলেই উত্তর ভারতের তীর্থ-পরিক্রমার চার মাস কাল নিবেদিতার জীবনেও এক অক্ষয় এবং অবিস্মরণীয় অধ্যায় যোজনা করেছিল বলা যেতে পারে।…

আরও একটি কথা, এবং এ পর্যায়ে সেটিই আমাদের শেষ কথা। ক্ষীর ভবানীর ইতিহাস-খ্যাত জীর্ণ মন্দির দর্শন নিয়েই সে কথার আরম্ভ ও সমাপ্তি।

অমরনাথ তীর্থে দেবাদিদেবের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁরই হাত থেকে 'ইচ্ছামৃত্যু' বরলাভের অব্যবহিত পরেই যেন কোন অদৃশ্য শক্তির খেলায় স্বামীজীর মন অতি দ্রুত শক্তি-মহিমায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। তখন চোখের সামনে শুধুই ভাসছিল মহামায়ার অনন্ত লীলাবিলাস।

'যে দিকে ফিরছি কেবলই দেখছি মায়ের রূপ, মায়ের অনবদ্য প্রকাশ। ছোট শিশুটির মত তিনি আমার হাত ধরে ধরে নিয়ে চলেছেন। আমি তাঁর স্নেহের দুলাল, আমি তাঁর হাতের পুতুল।'—এই-ই তখন হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর মনোভাব। এখন আর 'শিব' মন্ত্র নয়, শিব-নাম জপ নয়। শিব কীর্তনও শোনা যায় না। এখন শুধু কালী নাম, কালীকীর্তন। শুধু মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীর অব্যাহত ধ্যান ও চিন্তা। শুধু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিয়ে তাঁর যে অনন্ত লীলাবিলাস তারই রহস্যোদ্ঘাটনের ঐকান্তিক প্রয়াস। আর ক্ষণে ক্ষণে অতিন্দ্রীয় অনুভূতির অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে অমৃত রস-আস্বাদন।'

নিবেদিতার ভাষায়,—

In some imperceptible way, at all events, the Swami's attention appeared to shift, during the month of August, from Shiva to Mother. He was always singing the songs of Ram Prasad, as if he would saturate his own mind with the conception of himself as a child.

He told some of us once, that wherever he turned he was conscious of the presence of the Mother, as if she were a person in the room.···

Gradually, however, his absorption became more intense.···

···The worship of the Terrible became his whole cry. Illness or pain would always draw forth the reminder that 'She is the organ, She is the pain. And She is the Giver of pain, Kali! Kali! Kali!'

সুতরাং, এ সময়ে কাশ্মীর উপত্যকার যে স্বাভাবিক প্রশান্ত নির্জনতা তাও যেন তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা। নির্জন থেকে নির্জনতর বনপ্রদেশে একান্ত এককভাবে এখন তিনি প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। কখনো কখনো বলতেন,—আমি যেন চিন্তা-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি। যে চিন্তা মানুষকে দগ্ধ করে, নিদ্রার অবকাশ দেয় না—তেমনি এক ছেদহীন, যতিহীন প্রচণ্ড চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় তাঁর সে রুদ্ধ চিন্তারাশী মৃত্যুরূপিনী মহামায়ার বিচিত্র রূপবর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছিল, একটি ছোট কবিতার আকারে।

নিবেদিতা এবং অন্যান্য সকলে সান্ধ্য ভ্রমণের পর বজরায় ফিরে এসে দেখতে পেয়েছিলেন স্বামীজীর স্বহস্ত-লিখিত সে কবিতাটি। শুনতে পেয়েছিলেন বিবরণ কী ভাবে প্রচণ্ড, থরথর ভাবাবেগের মধ্যে সে কবিতাটি রচিত হয়েছিল এবং রচনাশেষে আবেশের তীব্রতায় কীভাবে স্বামীজী শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে।

আজ অবশ্য একথা সকলেই জানেন যে সেটিই স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরাজী কবিতা—

Kali the Mother.

উত্তরকালে, 'মৃত্যুরূপা মাতা' নাম দিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ সে কবিতাটির এইরূপ বঙ্গানুবাদ করেছিলেন···

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার গরজিছে ঘুর্ণ-বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে,
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।

প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর-কালিমা মাখা গায়,
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে!
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

এ-ঘটনার দু'দিন পরেই অকস্মাৎ স্বামীজী ক্ষীরভবানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, পূর্বাহ্নে কাউকে না জানিয়ে, কাউকে সঙ্গে না নিয়ে। নির্দেশ ছিল কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ না করে, তাঁর নিঃসঙ্গতায় ব্যাঘাত না ঘটায়।

এর পর প্রায় সাত-আট দিন আর তাঁর কোন সংবাদ ছিল না।

নিবেদিতা এবং অন্যান্য সহযাত্রীগণ অবশ্য ইতিপূর্বে ক্ষীরভবানীর পবিত্র কুণ্ড দর্শন করেছিলেন। কিন্তু এবার তাঁদের কেউ স্বামীজীর সঙ্গে যেতে পারেন নি। নিবেদিতাও নয়। ফলে, ঐ সময়টিতে তাঁদের প্রধান কাজ ছিল ধ্যানে ও কল্পনায়, প্রসঙ্গে ও আলোচনায় স্বামীজীর নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের অনুসরণ করা। সেও এক বিচিত্র তপস্যা।

কখনো তাঁদের মনে হত,—ক্ষীরভবানীর স্থানীয় রীতি অনুসারে হয়ত স্বামীজী এখন হোম করছেন। আবার কখনো ভাবতেন,—হয়ত প্রগাঢ় ধ্যানে আত্মসমাহিত হয়ে পরমানন্দের মধ্যে তিনি ডুবে আছেন, মগ্ন হয়ে আছেন। তখন, জগজ্জননীর স্পর্শানুভূতিতে তাঁর সমগ্র দেহ-মন হয়ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এমনি আরও কত কথা, কত দিব্য আনন্দময় কল্পনা।

নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে সে অবিশ্রাম গুরুধ্যান ও গুরুচিন্তা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল।...

তারপর একদিন প্রায় সায়াহ্ন-লগ্নে স্বামীজীর অতি-পরিচিত নৌকাখানি ধীরে ধীরে নদীর উজান-স্রোত ঠেলে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। নিজ বজরায় এক হাতে ছাদের বাঁশটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন অনিন্দ্য-দর্শন স্বামী বিবেকানন্দ।

ধীরে ধীরে স্বামীজীর বজরা নিবেদিতাদের নৌকার পাশে এসে ভিড়ল। ধীরে ধীরে স্বামীজী এ নৌকায় উঠে এসে প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রত্যক্ষ দেব-দর্শনের কী কমনীয় প্রকাশ সে উন্নত তনুখানিতে তখন উচ্ছ্বসিত, স্বভাব-সুন্দর মুখমণ্ডলে কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপ্রভা প্রতিফলিত! চোখ ফেরান যায় না, অনুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও যেন আশ মেটে না।

'লাখ লাখ যুগ ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।'···এমনি একটি

অনুভূতি!

স্বামীজী নিঃশব্দে হাতের মালাখানি সকলের মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। জীবনের সুদুর্লভ সে মুহূর্তটি, অভাবিত সে স্পর্শটি অমৃত হয়ে রইল সবার জীবনে।

অবশেষে সে মালাখানি একজনের হাতে দিয়ে বললেন,—'এ মালা আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম।'

তারপর আসন গ্রহণ করে, সস্মিত বদনে, কতকটা আত্মগত ভাবেই বললেন,—'আর হরি ওঁ নয়। এবার মা, শুধুই মা।

আমার স্বদেশ প্রেম ভেসে গেছে, পরিকল্পনা যত কিছু ছিল সব বিলুপ্ত হয়েছে। এখন শুধু মা,—আর কেউ নেই, কিছু নেই।'

এক বিচিত্র দিব্যভাবে কক্ষটি মুহূর্তে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবাই রুদ্ধশ্বাসে উপবিষ্ট। নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শ্রুতিযন্ত্রে ধরা যায়। স্বামীজীর চিন্তা এবং অনুভূতি নিঃশব্দ প্রবাহে সকলকে আবিষ্ট করে তুলেছে, তাদের অনুভূতিকে চেতনার ঊর্দ্ধতর ভূমিতে উন্নীত করছে।

সে বিচিত্র আনন্দ শুধু অন্তরের মণিমঞ্জুষায় ধরে রাখতে হয়, ভাষার রেখাঙ্কনে প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করা সম্ভবই নয়।

স্বামীজী আরও বললেন যে ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শন তাঁর মর্ত জীবনে একটি অপ্রত্যাশিত অধ্যায় যোজনা করেছে।···নিবেদিতার মনে হল, যেন অমরনাথ তীর্থের ইচ্ছামৃত্যু-বর লাভের সঙ্গে সে অধ্যায়টি কোন অলক্ষ্য সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে।···

একদা বহুদিন-বিগত যুগে ক্ষীরভবানীর মন্দির এবং তার মধ্যেকার দেবী-প্রতিমাটি বিধ্বস্ত হয়েছিল বিধর্মী ম্লেচ্ছদের হাতে। সেদিন নির্বীর্য হিন্দুজাতি নিঃশব্দে সে অপমান সহ্য করেছিল, যেমন সে চিরদিন করে এসেছে। প্রতিঘাত করেনি, প্রতিবাদ করেনি।

আজ কতকাল পরে, ধ্বংসাবশেষ সে মাতৃমন্দিরের দৈন্যদশা দেখে স্বামীজীর মনে গভীর বেদনা ও ক্ষোভ যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তিনি ভেবেছিলেন,—হায়, সেই দুর্দিনটিতে আমি যদি এখানে উপস্থিত থাকতাম তবে আর কিছু না হোক মন্দির রক্ষায় নিজের জীবন তো বিসর্জন দিতে পারতাম। মরতে তো পারতাম। তখনকার হিন্দুরা কি তাও পারে নি?

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। স্বামীজীর মনে সে চিন্তারাশি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক অশরীরী বাণী ধ্বনিত হল আকাশে, মনুষ্য কণ্ঠেরই মত কণ্ঠে, মনুষ্য ভাষারই মত ভাষায়।

স্বামীজী সুস্পষ্ট শুনতে পেলেন দেবীর তীব্র, তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা।

'আমার মন্দির ম্লেচ্ছরা বিধ্বস্ত করেছে। তাতে তোমার কি? আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে এখানে সপ্ততল মন্দির নির্মাণ করতে পারি। সৃষ্টি ও লয় আমার কাছে দুই-ই সমান।

তুমি আমাকে রক্ষা কর, না, আমি তোমাকে রক্ষা করি? কোনটি সত্য?'···

সে বাণীর ধ্বনি-বিন্যাসও যেমন স্পষ্ট, তার সন্ধানও তেমনি অব্যর্থ ছিল। চকিতে স্বামীজীর মানস-জীবনে যেন একটি বিপ্লব ঘটে গেল,

একটি কালান্তর উপস্থিত হল। এমন একার্থক, সুস্পষ্ট দৈববাণী তিনি ইতিপূর্বে কখনো শোনেন নি। তাঁর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে ভবিষ্যদুক্তি ছিল—'ও যেদিন জানতে পারবে ও কে, সেদিন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে।'—সে উক্তির বাস্তব রূপায়ণের কালও যেন অবিলম্বিত হয়ে দেখা দিল! আত্ম-অনুশোচনারও অবধি রইল না।

'তাই তো, আমি মাকে রক্ষা করি, না মা আমাকে রক্ষা করেন? কে আমি? যন্ত্রী কে, কর্তী, কারয়িত্রীই বা কে?—আমি, না জগজ্জননী স্বয়ং?'

তাই নিবেদিতা প্রমুখ সকলের কাছে ক্ষীরভবানী দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একান্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ঃ

'আমারই ভুল হয়েছিল, অন্যায় হয়েছিল। মা ঠিকই বলেছেন,—তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা কবি?

কাজেই, আর আমার কোন মতলব নেই, কোন দেশপ্রেমের অহমিকা নেই। এখন আমি একটি ছোট শিশু মাত্র। মায়ের ইচ্ছাস্রোতে ভেসে চলেছি আমি। তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তাঁরই লীলা সার্থক হোক। মা, মা, মা।'…

একটু পর আবার বলেছিলেন,—'এখন আর এর চেয়ে বেশী কিছু তোমাদের বলতে পারব না। নিষেধ আছে।

তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমি কোনরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হইনি।'

'I may not tell you more now; it is not in order. But spiritually! spiritually, I was not bound down!'

সেদিন তারিখ ছিল ৬ই অক্টোবর। সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরের অনতিদীর্ঘ সে পুণ্য লগ্নটি নিবেদিতার স্মৃতি-ফলকে স্বর্ণলেখায় লিখিত হয়ে গেল।

এর পর কয়েকটি দিন অধিকাংশ সময় স্বামীজী প্রায় মৌন অবস্থায় কাটাতেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখাও বড় হত না। তবে যেটুকু হত তাতে নিবেদিতার মনে এ-চিন্তাটিই পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হত যে একটি সঙ্কটময় কালের মধ্য দিয়ে অনিবার্য-শক্তি মহাকাল স্বামীজীকে তখন নিয়ে চলেছেন। অন্তরে ও বাহিরে, নিরবধি জগজ্জননীর ধ্যান-তন্ময়তায় তিনি বিভোর হয়ে আছেন।···

আর দেহত্যাগের সঙ্কল্প?

সুস্পষ্ট না হলেও একটি অস্পষ্ট আভাসের মধ্য দিয়েও কি সেটি তখন তাঁর মনে উদিত হয়েছিল? কে জানে? অন্ততঃ নিবেদিতা জানতে পারেননি, বুঝতেও পারেননি। তবে এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বামীজীর জীবন-স্পর্শ এখন থেকে ক্রমশঃ যেন পূর্বাপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এবং নিবিড়তর হয়ে উঠছে।

তাঁর প্রতি কথায়, তাঁর কণ্ঠধ্বনিতে, তাঁর উপস্থিতিতে মুহুর্মুহুঃ আনন্দ-ভূমির স্বর্ণদ্বার যেন খুলে যাচ্ছে সকলের সম্মুখে। কখনো আপন মনে তিনি গাইছেন—মাতৃসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত···

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি—
(ভব-সংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি লক্ষের মধ্যে দু'একটা কাটে
তুমি হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।

কখনো আবার স্বরচিত কবিতা থেকেই আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন সকলকে—

নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি, করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।···

আর সেই সঙ্গে কখনো কখনো একটু টীকা সংযোগ করে হয়ত বলছেন,···

সত্য, এসব প্রত্যাক্ষানুভূতি বর্ণে বর্ণে সত্য। কোন সংশয়ের অবকাশ নেই, অবিশ্বাসের হেতু নেই।

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,' তার কাছে মা আসেন। সত্য সত্যই আসেন।

আমি দেখেছি, উপলব্ধি করেছি সে রহস্যময়ীকে।···তাইতো সব পরিকল্পনা চিরদিনের মত আমি বিসর্জন দিয়েছি।

এখন শুধু গঙ্গার তীরে তীরে কৌপীন-সম্বল হয়ে পরিব্রাজকের নিঃসঙ্গ, কঠোর জীবন আমি যাপন করতে চাই।

বিবেকানন্দ চলে গেল। চিরদিনের মত গেল, আর সে ফিরবে না।

আমি কে যে জগৎকে শিক্ষা দেবার ভার আমার বলে মনে করছি? এও তো এক ধরণের অভিমান, এক ধরণের অহঙ্কার! জগন্মাতার কোন প্রয়োজন নেই আমাকে দিয়ে, আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন, একান্তভাবে প্রয়োজন।

প্রেম, শুধু প্রেম।

সেই তো সম্পদ, সেই তো একমাত্র অবলম্বন।

নিষ্কাম, নিষ্কলুষ প্রেমের শক্তি অব্যর্থ। যদি কেউ আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তথাপি আমাদের ভালবেসেই যেতে হবে এবং পরিণামে একদিন তারা সে ভালবাসার বশে না এসে পারবে না, কিছুতেই পারবে না। এই হচ্ছে সার কথা, এই হচ্ছে জীবন-দর্শন।'

'There was no way but love. If people sinned against us, we must love them till it was impossible for them to resist it. That was all.'

বস্তুতঃ সে এক অভাবিত অবস্থা, ভাব ও প্রেমের এক অসীম প্রসারতা। জগতের কোন প্রাণীর কোন দুঃখ বেদনাই যেন স্বামীজীর হৃদয়টিকে স্পর্শ না করে যেত পারত না। এবং

প্রেম ও আশীর্বাদের বাণী ভিন্ন অন্য কিছু তাঁর মুখ থেকে বেরও হত না।

এমনি মানসিক অবস্থার মধ্যেই একদিন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের একটি প্রাসঙ্গিক পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করেছিলেন স্বামীজী।...

সে কাহিনীর মাধুর্য এবং মাহাত্ম্য গভীর ভাবে নিবেদিতাকে স্পর্শ করেছিল।...

পুরাবৃত্তে কথিত আছে—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রচণ্ড সংগ্রামে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্র নিহত হয়েছিল। পুত্রশোকে জর্জরিতা হয়েছিলেন মাতা অরুন্ধতী, জর্জরিত হয়েছিলেন মহর্ষি স্বয়ং। গভীর শোকের ছায়ায় আবৃত হয়েছিল বশিষ্ঠের পুণ্য আশ্রম।

তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়েছিল আকাশে, তার শুভ্র কিরণ ধারায় আবৃত হয়েছিল পৃথিবী। ফলে, সেদিন সমগ্র আশ্রমটিই অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিল, বিশেষ শ্রী ধারণ করেছিল।

বৃহৎ বৃক্ষারাজির অন্তরালে, আলো-ছায়ার অস্পষ্টতার রহস্যে বশিষ্ঠের কুটীরখানি যেন ধ্যানস্থ হয়েছিল।...

কুটীরের অভ্যন্তরে বিশ্বামিত্রেরই রচিত একখানি গ্রন্থপাঠে নিরত মহর্ষি বশিষ্ঠদেব।

এমন সময় অরুন্ধতী প্রবেশ করলেন কুটীরে। স্বামীর নিকটে এসে একটু নত হয়ে দেখলেন তিনি কি করছেন। তারপর অনুচ্চস্বরে বললেন,—'দেখ, আজ চন্দ্রের কী বিচিত্র শোভা, কী স্নিগ্ধ অনুপম সৌন্দর্য!'

মহর্ষি কিন্তু গ্রন্থ থেকে মুখ না তুলেই বললেন,

'প্রিয়ে, বিশ্বামিত্রের প্রতিভা এর চাইতেও বহুগুণে স্নিগ্ধ, বহুগুণে সুন্দর।'...

স্বামীজী বলেছিলেন,—'এরই নাম অহেতুক প্রেম, যার মধ্যে ব্যক্তিগত ইষ্টানিষ্টের স্পর্শমাত্র নেই। শত্রুর যথার্থ প্রতিভার

স্বীকৃতিতে নিজের সব কিছু বিস্মৃত হয়েছেন বশিষ্ঠ। বিস্মৃত হয়েছেন অপমান, বিস্মৃত হয়েছেন শতপুত্রের নিধন যাতনা। এমনি প্রেম আমাদের মধ্যেও সঞ্জাত হওয়া চাই।'

এইভাবে, কয়েকমাস সময়ের মধ্যে, উত্তব-ভারত ভ্রমণের ধ্যানময়, আনন্দময় ও নব-নব-অভিজ্ঞতাময় দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন ধর্ম এক জীবন্ত পদার্থ, শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাকে গ্রহণ করা যায়, অনুভব করা যায়। সে যেন এক বিস্ময়কব নূতন জগৎ, যার স্মৃতি ও রোমাঞ্চ সমগ্র উত্তর জীবনেব অক্ষয় পাথেয়। তবে সে তীর্থ-পর্যটনেব এটিই ছিল শেষ অধ্যায়। কাবণ, স্বামীজী এখন প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ফিবে আসবেন বঙ্গদেশে।—

সুতরাং, সে অনুসাবেই ব্যবস্থাদি হতে থাকল। স্বামীজী প্রথমে ফিরবেন একাকী। আব সবাই উত্তব-ভাবতেব কিছু কিছু বিখ্যাত স্থান দেখে পবে ফিরে আসবেন।···

১৩ই অক্টোবব প্রত্যাবর্তনেব দিন স্থিব হল। বাবমূল্লার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন সকলে।

ভৃত্য, মাঝি, বন্ধু, শিষ্য সবাই একযোগে—স্বামীজীব কাছ থেকে বিদায় নেবাব জন্য বড় রাস্তাব উপব টাঙ্গাব কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দার-মাঝিব চাব বৎসবের ছোট মেয়েটি থালা ভর্তি ফল নিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে স্বামীজীর পাশে পাশে চলল। তার দেওয়া ফল স্বামীজী পথে পথে খাবেন—এই তার নিবেদন। সে এক করুণ বিদায় দৃশ্য।

নিবেদিতা লিখেছেন,—আবার কবে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে আমরা জানতাম না। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে সেদিন আমরা সকলে এমন কয়েকটি ঘণ্টা তাঁর সান্নিধ্যে যাপন করলাম যার পুণ্যস্মৃতি আমাদের সমগ্র জীবনে অম্লান হয়ে থাকবে, অক্ষয় হয়ে থাকবে।'

মনে হবে যেন,—

……'পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছে বিস্তীর্ণ অস্তশিখরের দীর্ঘছায়া
নিয়স্ত ধূসর পাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।'
আর,
'মেঘমুক্ত—
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চির-পথিকের
বাঁশিতে বাজিবে ধ্বনি, মোরা তার হব অনুগামী।'

—x—

ছয়

আবার কলিকাতা।

কোলাহল-মুখর, কর্ম-চঞ্চল মহানগরী কলিকাতা।

স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় চারমাস কাল উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করে এবং প্রত্যাবর্তন পথে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর পরিদর্শন করে নভেম্বর মাসের প্রথম দিনটিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নিবেদিতা। অর্থাৎ, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে যে তীর্থযাত্রার সূত্রপাত, ঐ খ্রীষ্টাব্দেরই ১লা নভেম্বর তার পরিসমাপ্তি।

হিমালয়ের তুষার-ঢাকা শিখরে ও সানুদেশে, যুগযুগ-সঞ্চিত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মধ্যে, ভারতাত্মার মূর্ত্য-বিগ্রহ স্বামী-বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে-নিঃসংশয়ে এক অভিনব জীবন যাপনের সেই কাল। পূর্বাধ্যায়ে সে কথা আমরা বর্ণনা করেছি।

নিবেদিতার সমগ্র জীবনখানিই অবশ্য বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তাঁর কর্ম এবং আত্মোৎসর্গ যেমন বিচিত্র, তাঁর গুরুভক্তি এবং গুরুপ্রেমের আনুগত্যে যে মহাত্যাগ তার তাৎপর্যও তেমনি বিচিত্র। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিচিত্র বোধকরি তাঁর অন্তরজীবনের অভাবিত রূপান্তর। সে রূপান্তর যেমনি দ্রুত ও সর্বাবয়ব, তেমনি কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় সমুজ্জ্বল। আর স্বামীজীর প্রথম-দর্শন লাভের শুভলগ্ন থেকে সে পরিবর্তনের সূচনা হলেও—এই কালে, এই উত্তর-ভারত পরিভ্রমণের দিনগুলিতেই, সেটি একটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। মনে হয়, সেটিই তাঁর দ্বিজত্ব লাভের দ্বিতীয় অধ্যায় স্বরূপ।

কি জাতিগত বিশ্বাস ও সংস্কার, কি শিক্ষা বা ধর্ম বিষয়ক ধারণা,—সবই একটি সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত ছিল নিবেদিতার জীবনে। আবার, তাদের সব কিছুকে আবৃত করে নিবেদিতার মধ্যে একটি নিবিড় ধর্মপিপাসা ছিল, একটি তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল। আর ছিল এক অপরিমেয় প্রেম সম্পদ। তাঁর অসামান্য জীবনের সেই ছিল বোধকরি অক্ষয় মূলধন।

আজ সেই মূলধনের শক্তির উপরই বিরাট পুরুষের স্পর্শ ক্রিয়াশীল হল হিমালয়ের অবিচ্ছিন্ন মহামৌনের মধ্যে এবং তার ফলে, সকল পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কার যেন শরতের শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত অপসৃত হতে থাকল ধীরে ধীরে। আর তৎস্থলে গড়ে উঠতে শুরু করল নূতন বোধ, নূতন স্বচ্ছ চিন্তাধারা,—বীজগর্ভ উর্দ্ধশীর্ষ অসংখ্য নবাঙ্কুরের মত।

সুতরাং, উত্তর-ভারত যাত্রার পূর্বেকার যে নিবেদিতা, আর সে প্রদেশ থেকে প্রত্যাবৃত্ত যে নিবেদিতা, অন্তরজীবনের পরিচয়ে—তারা আর এক ব্যক্তিই নয়। বহুলাংশে দুই স্বতন্ত্র মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। সে রূপান্তরের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষভবে অনুধাবনযোগ্য। কারণ, এরই সূত্রানুসরণ করে ধীরে ধীরে ভারতের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন নিবেদিতা, এবং ভারত-ভগিনীরূপে তাঁর যে চিরস্মরণীয়, মহান আত্মপ্রকাশ, তারও যাত্রারম্ভ হয়েছিল এই রূপান্তর থেকেই।

* * *

নিবেদিতার অমর জীবনের বিচিত্র ত্যাগ-মহিমার কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, পরে আরও করব।

ত্যাগ-মাহাত্ম্য অবশ্য সর্বকালে, সর্বদেশেই বহুধা কথিত। ভারতবর্ষে তো এই ত্যাগকে অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায় বলেই ঘোষণা করা হয়েছে। তথাপি, এর মধ্যে একটি বিশেষ কথা আছে। সে কথা এই যে ত্যাগের সর্বক্ষেত্রেই একটি সীমা রেখা নির্দিষ্ট

থাকে। অস্পষ্ট হলেও তার একটা পরিধি থাকে। নানা শাস্ত্রগ্রন্থে, পুরাণ ইতিহাসে এর সমর্থন আছে।

সেখানে, বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কাম্যবস্তু লাভে বিশেষ ধরণের ত্যাগই বিহিত।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে দেশের স্বাধীনতা লাভ বা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মানুষ যুগে যুগে, দেশে দেশে আত্মসুখ পরিত্যাগ করেছে, আত্মবিসর্জন দিয়েছে। আবার, ধর্মের জন্য, আত্মোপলব্ধির জন্য ত্যাগ করেছে গৃহ, বর্জন করেছে আত্মপরিজন, আত্মসুখকামনা। জগতের ইতিহাসে এ সকল ত্যাগের নিদর্শন রয়েছে প্রচুর। কিন্তু এদের মধ্যে স্বতঃই যেন একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট থাকে। এ কথাটি জানা থাকে যে যার জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করছি, জীবনের কাম্য সম্পদ বিসর্জন দিচ্ছি, সে আমারই দেশ, আমারই স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী, জন্মভূমি। অথবা, আমার আত্মোপলব্ধি, আমারই জাতি ও বংশ-পরম্পরা অনুসৃত যে ধর্মোৎকর্ষ সেটিই আমার লক্ষ্য, আমার টার্গেট। কিন্তু এ সকল ত্যাগের অন্তরালে দেশ, ভাষা ও ধর্ম সংস্কার, অর্থাৎ যা নিয়ে মানুষের সকল আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও গৌরববোধ—তার কোন একটিকেও বিসর্জন দেবার দাবীও থাকেনা, আহ্বানও থাকে না। সুতরাং, ত্যাগের একটি সীমারেখা এ সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে বৈকি!

এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও এর অন্যথা হয়নি। তাঁরও সকল প্রয়াসের, সকল ত্যাগের মূলে ছিল তাঁর দেশ, তাঁর ধর্ম আর তাঁর অতৃপ্ত অন্তরপিপাসা, স্ব-স্বরূপে নিমগ্ন হবার জন্য, সমাধিস্থ হবার জন্য।···

কিন্তু নিবেদিতার? সে ইতিহাস সর্বাংশে স্বতন্ত্র ধরণের। তাঁর ক্ষেত্রে ত্যাগের দাবী ছিল সর্বগ্রাসী, সর্বাবয়ব। সে দাবীর পরিধি ছিল তাঁর দেশ, সযত্ন-বর্ধিত যাবতীয় শিক্ষা-চিন্তা, ধর্ম-সংস্কার, কর্ম-সংস্কার এবং আত্মচেতনা সব কিছুকে ঘিরে। সে যেন ধারণাতীত

এক কঠিন আহ্বান। অথচ, সে আহ্বানের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের মধ্য দিয়েই নিবেদিতার সার্থক নবজন্মলাভ।

তাই বলছিলাম, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মারম্ভে নিজ আচার্যদেবের সহযাত্রীরূপে তীর্থদর্শন মানসে যে নিবেদিতা কলিকাতা ত্যাগ করেছিলেন, আর শীত-প্রারম্ভে তীর্থদর্শন সমাপ্ত করে যে নিবেদিতা প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন মহানগরীতে—তারা বাহ্যদৃষ্টিতে অভিন্ন হলেও, অন্তর জীবনে আর এক ছিলেন না। সে ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটেছিল বিস্ময়কর, দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছিল অবিশ্বাস্য পরিমাণে। ফলে, স্বামীজীর নিগূঢ় আকাঙ্খা এবং দূর-বিসর্পিত স্বপ্ন এখন অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর চিন্তা-মানসে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি নিবিড় সম্বন্ধসূত্রও গ্রথিত হতে শুরু করেছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে, তার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইতিহাসের নিগূঢ় পদধ্বনির সঙ্গে।

তবে এখনও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার প্রাক্কালে, প্রস্তুতি-পর্বে, আরও দু'টি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে পরিচয় তাঁর বাকী ছিল।

প্রথমতঃ, যে নারী-সমাজের শিক্ষা ও সেবায় তাঁর আত্মনিয়োগের আকাঙ্খা ও যত্ন সে সমাজের সর্বাবয়ব একটি পরিচয় লাভ। অথবা, পরিচয়ও ঠিক নয়, পরিচয়সূত্রে তার সঙ্গে একাত্মা হয়ে, অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠা। আর দ্বিতীয়তঃ, আপন কর্ম ক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ ধারণার মধ্য দিয়ে একটি সুপরিকল্পিত কর্মপন্থায় যাত্রারম্ভ করা। স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত করা।

কী প্রণালীতে এবং কত দুরূহ প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সেই দুই অভীষ্ট সাধনে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, আজ দীর্ঘ কালান্তরে তার সব তথ্য সঠিক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নভাবে মুষ্টিমেয় ঘটনাসূত্রে যে সব তথ্যাদি পাওয়া যায় তাদের সাক্ষ্য থেকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর একটি চিত্র গ্রথিত করে তোলা সুকঠিন। অথচ, নিবেদিতার চরিতানুধ্যানে সে চিত্রটির মূল্য অসামান্য। কিন্তু সে-কথা এখন

থাক।···আমরা নিবেদিতার কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের কথা বলছিলাম।

নিবেদিতার কলিকাতা পৌঁছাবার কয়েকদিন আগেই স্বামীজী পৌঁছেছিলেন কলিকাতায় এবং উত্তর কলিকাতায়, বাগবাজার অঞ্চলে, ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর গৃহে সাময়িকভাবে অবস্থান করছিলেন। আর রামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী দেবী সারদামণিও বাস করছিলেন ঐ অঞ্চলেই—১০।২ বোসপাড়া লেনে, একটি সাধারণ ভাড়াটে বাড়ীতে।

তখনও 'উদ্বোধনের' নিজস্ব বাটী নির্মিত হয়নি। শ্রীমা সারদামণি জয়রামবাটী থেকে কলিকাতা এলে, তখনকার কালের প্রথম দিকে বলরামবাবুর গৃহেই অবস্থান করতেন। অথবা, কখনো কখনো গঙ্গার তীরে বাড়ী ভাড়া করে তাঁর বাসের ব্যবস্থা হত। স্বভাবতঃই সে-সব গৃহ সব সময় সুপরিসর হতনা। সব দিক দিয়ে উপযোগীও হতনা। মায়ের যে আশ্রিত, ভক্ত-পরিবার, স্ত্রী-ভক্ত ও আত্মীয় পরিজন নিয়ে গঠিত ছিল, সেটি তখনও খুব বৃহদায়তন না হয়ে উঠলেও, নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন ছিলনা। বোসপাড়া লেনের গৃহটিও যে যথেষ্ট বৃহৎ ছিল তাও নয়। তথাপি, সে গৃহেরই একটি কক্ষে এবার নিবেদিতার বাসের ব্যবস্থা হল।

মায়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেন নিবেদিতা। অর্থাৎ, হিন্দুসমাজের অবগুণ্ঠিত অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারে প্রথম পাদক্ষেপ করলেন বিবেকানন্দ-দুহিতা, বিদেশিনী নিবেদিতা। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীমায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আশীর্বাদই তাঁকে সে অধিকার প্রদান করেছিল। অথচ, মায়ের সঙ্গে সেই তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার।

প্রথম সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবশ্য আমরা ইতিপূর্বে প্রদান করেছি এবং সে প্রসঙ্গেই একথাও বলেছি যে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতেই নিরতিশয় স্নেহে ও সমাদরে মা এই বিদেশিনী কন্যাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও সামাজিক সংস্কারবদ্ধতার

সেই সব দিনে সে গ্রহণকার্যটি খুব সহজও ছিলনা, সামান্যও ছিলনা। কারণ, প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গিনীরূপে শ্রীশ্রীমা এবার ব্রাহ্মণ দেহে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গপল্লীর নিভৃত নিরালায় এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের শত আচার নিয়মের মধ্যেই তিনি পালিত এবং বর্ধিতও হয়েছিলেন। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর তিনি বাহ্যতঃ যে জীবন যাপন করতেন, সেটিও ছিল হিন্দুবিধবার কঠোর নৈষ্ঠিক জীবনেরই অনুরূপ। তবে সমাজ-বিধি অতিক্রম করবার দৃষ্টান্ত যে মায়ের জীবনে না ছিল তাও অবশ্য নয়। প্রয়োজন হলে,—'ভক্তের জাত আলাদা,' কিংবা 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ-সব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কল্পে মা লঙ্ঘন করতেন দেশাচারেব গণ্ডী, অতিক্রম করতেন সমাজ-সংস্কারের অবরুদ্ধতা।

নিবেদিতার ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনটিই বোধকরি অপরিহার্য বলে প্রতীত হয়েছিল। মা উপলব্ধি করেছিলেন, নিবেদিতার বুদ্ধিদীপ্ত নিষ্পাপ মুখখানি দেখবামাত্রই উপলব্ধি করেছিলেন,—যে দেশ ও জাতির গণ্ডি-বিভাগ এখানে নিরর্থক। অধ্যাত্ম-জীবনের অখণ্ডতার ক্ষেত্রে নিবেদিতা তাঁরই সন্তান, তাঁরই অন্তরঙ্গ ভক্ত-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট অন্যতমা। বিশেষ সমাদর-যোগ্যা এক শক্তিময়ী কন্যা।

আর নিবেদিতা?

মাতৃ-সান্নিধ্যে তাঁরও অনুভূতি হয়েছিল বিচিত্র। সেকথাও পূর্বে বলেছি। উত্তরকালে, মধ্যে মধ্যেই বিনম্র অন্তরে সে অনুভূতির কথা তিনি প্রকাশ করতেন। কখনো চিঠিতে. কখনো কথা-প্রসঙ্গে সে প্রকাশ উচ্ছ্বসিত হত।

তথাপি, নিবেদিতাকে একান্ত আত্মগোষ্ঠীতে গ্রহণ করা, উচ্চবর্ণের ভারতীর নারীর সঙ্গে সমপর্যায়ে আসন দেওয়া সে যুগে কম সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল না, কম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। এমন কি, স্বামীজী স্বয়ং নিবেদিতার হস্তে মায়ের আহার্য গ্রহণের সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

কত শক্তি থেকে, কত প্রশান্ত উদারতা থেকে, তথাকথিত আচার-নিয়মের বহু উর্দ্ধে যে-সত্যের স্থান, তার কত গভীর উপলব্ধি থেকে সেটা সম্ভব হয়েছিল,—তা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

সেদিনের অবস্থা তো কোন ভাবেই আজকের মত ছিল না। তখনকার হিন্দু-সমাজে এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বিধবার পক্ষে কোন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারো সঙ্গে বাক্যালাপই ছিল নিষিদ্ধ, বসবাস, ভোজনাদি তো দূর দুঃস্বপ্নের কথা। অথচ, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে একান্ত লজ্জাশীলা, কেতাবী-শিক্ষায় প্রায় অশিক্ষিতা, বহুলাংশে পল্লীবধূর মত জীবন-যাপনে-অভ্যস্তা শ্রীশ্রীমা দ্বিধাহীন চিত্তে এবং নিরতিশয় আগ্রহের সঙ্গে নিবেদিতাকে নিজ আশ্রিত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। করেছিলেন যুগ-প্রয়োজনে, নিবেদিতার অন্তর-পরিচিতির ভিত্তিতে, তাঁর অসামান্য শুভ-সংস্কারের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে। মার্গারেট রূপে তার যে বাহ্য পরিচয়—জাতি ও বংশে, ভাষা ও ধর্মে সীমিত ছিল—সে সবই ছিল মায়ের দৃষ্টিতে —'এহ বাহ্য' পর্যায়ভুক্ত, সম্পূর্ণ গৌণ তালিকার অন্তর্গত।

এমন কি, স্বামীজীর 'মানস কন্যা'-রূপে নিবেদিতার যে পরিচয় তার একটি বিশেষ মূল্য থাকলেও, মায়ের চোখে সেটিও মুখ্য বিচার্য ছিল না। নিবেদিতা স্বমহিমায়ই মায়ের স্নেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, নিজ অন্তরজীবনের মহৎ সম্ভাবনার দাবীতেই মায়ের অফুরন্ত আশীর্বাদ আকর্ষণ করেছিলেন। এটিই সত্য কথা।

তবে, বাহ্য অবয়বের কোন প্রভাবই যে ক্রিয়াশীল ছিল না এমনও হয়ত নয়। ঐ ঋজু দীর্ঘাঙ্গ দেহটি, ঐ গৌরবর্ণ তনুটি, মাথার চুল সোনালীও নয়, রূপালীও নয়—অথচ সোনালী-রূপালীতে মেশান—এক বিচিত্র শোভা! মুখমণ্ডল বুদ্ধি ও জ্ঞান-দীপ্তিতে ভাস্বর, সুনীল চক্ষু দুটির অন্তরালে অফুরন্ত কৌতুহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা,—তাহে

শ্বেতবাশ অঙ্গে পরিহিতা,
অনবদ্য সৌন্দর্যে শোভিতা।—
ভগ্নী নিবেদিতা।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মনোহর উদ্যানবাটী থেকে আহরিত সে অনাঘ্রাত পুষ্পটির শোভা এবং প্রভাব কি উপেক্ষনীয়? হাজার মানুষের মধ্যে যে-শোভা মুহূর্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করত, সে কি মায়ের চোখে ধরা পড়ে নি, মাকে আকৃষ্ট করেনি? অবশ্য করেছিল।

'পহলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি'।—এ-প্রবচন অস্বীকার করবার কোন হেতুও নেই। তবে সেটি ছিল গৌণ, প্রারম্ভিক পর্যায়ের ক্ষণিকের একটি ব্যাপার মাত্র। তার ফলে জন্ম-জন্মান্তরের অক্ষয় সম্বন্ধ-সূত্র গ্রথিত হতনা। সেটি গ্রথিত হয়েছিল নিবেদিতার সেই মাধুর্য থেকে যাকে প্রকাশ করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন,—

'নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভিতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ কিংবা নেতৃত্ব-স্পৃহা নেই।···সে অতি উদার, অতি পবিত্র।··· সে প্রাণ দিতে এসেছে ভরেতবর্ষে, গুরুগিরি করতে আসে নি।'

সেই জন্যই বোধকরি, উত্তর জীবনে নিবেদিতা মায়ের কাছে এমন আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন যা আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় নি। সে অনুপম আশীর্বাণীটি ছিল এই···'আমার গুরুকে আমি যেমন করে লাভ করেছিলাম, যেমন ভাবে ভালবেসেছিলাম তোমার গুরুকেও ঠিক তেমনটি করে তুমি লাভ কর, তেমন ভাবে ভালবেসে ধন্য হও, সার্থক হও।'···

এ যেমন মায়ের দিকের কথা, নিবেদিতার দিকেরও তেমনি কথা আছে, অসামান্য গ্রহণ শক্তির পরিচয় আছে।···

একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, বহুদর্শন ও বহু

পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় নিবেদিতার কাছে মা ছিলেন একান্ত সেকেলে, একান্ত গ্রাম্য।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত থাকে অধিকাংশ সময়, অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয় কথা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় বা সম্পর্কও তাঁর বিশেষ নেই।—নিবেদিতার চোখে এই তো মায়ের প্রথম বাহ্য প্রকাশ। অন্ততঃ তাইতো সকলের মনে হয়।

কিন্তু এসবের অন্তরালে অবস্থিত যে মহাশক্তি ও মহাধৃতি তাকে নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন কোন্ তপস্যায়? যে অজস্র করুণা ও প্রেম, যে নিষ্ঠা ও ঔদার্য, যে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও বিশ্বৈকবোধ ঐ অতি-সাধারণতার পশ্চাতে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করতে তাকে উপলব্ধি করেছিলেন নিবেদিতা কোন্ শক্তিতে?

শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে নিবেদিতার একালের একটি বিশেষ উক্তি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে:

জনৈকা বান্ধবীর কাছে লেখা পত্র থেকে অংশটুকু উৎকলিত। আলমোড়ায় অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে এই পত্রটি লিখেছিলেন নিবেদিতা।

'আমি অনেকবার চিন্তা করেছি তোমাকে সে মহিলার কথা বলব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী, দেবী সারদামণি। একজন হিন্দু বিধবারই মত তাঁর শুভ্র পরিচ্ছদ। একটি সাদা শাড়ী তাঁর সমগ্র দেহখানি পরিবেষ্টন করে মাথা পর্যন্ত উঠে যায় অনেকটা আমাদের দেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠনের মত।

তাঁকে ভাল করে জানলে বোঝা যায় তাঁর মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি ও সুষ্ঠু তৎপরতা কি সুন্দর সামঞ্জস্যেই না মিলিত হয়েছে! তিনি যেন এক স্বর্গীয় মাধুর্যের জীবন্ত প্রতিমা—কত শান্ত, কত নম্র ও কত স্নেহ-প্রবণ। আবার একটি ছোট বালিকার মতই সর্বদা উৎফুল্ল, সর্বদা আনন্দ-মুখর। বরাবরই তিনি রক্ষণশীলা ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমাদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর মধ্যে রক্ষণশীলতার আর

কিছুই অবশিষ্ট রইলনা। তিনি আমাদের স্পর্শ করলেন, আশীর্বাদ করলেন। আমাদের সঙ্গে বসে আহার করলেন। সকলের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রইলনা।

তাঁর এ সব আচরণ আমাদের একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছে, এবং আমার নিজের ভবিষ্যৎ কার্য-সম্ভাবনাকেও যতখানি সফল করে তুলেছে—ততখানি আর কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না।...

তাঁর কলিকাতা অবস্থানকালে চৌদ্দ-পনেরো জন উচ্চবর্ণের মহিলা তাঁর সেবা-পরিচর্যা করে থাকেন, আর তিনি এক অপূর্ব কৌশলে ও ভালবাসায় তাঁদের সকলকে অপর্থিব আনন্দ ও শান্তির মধ্যে মগ্ন রাখেন সর্বদা।

বস্তুত, তিনি এক মহাশক্তিরূপিনী, মহানুভব রমনী যদিও বাহিরে নিতান্ত সরল ও অকপট।'...

অতি অল্পকাল মধ্যে মা'র সম্বন্ধে এমন নিখুঁত, নিগূঢ় পরিচয় লাভ নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কোন্ মানসিক সামর্থ্যে সেটিই এক রহস্য।

স্বামীজীর জীবন ও চরিত্র নিবেদিতাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। করেছিল এক বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র পরিবেশে। সে কথা দিয়েই আমরা গ্রন্থারম্ভ করেছি। সে অসামান্য জীবনের অনতিক্রম্য প্রভাবই নিবেদিতার জীবনে সর্বাধিক। অনস্বীকার্য ও অনবদ্য সে কাহিনী। তাঁরই আহ্বানে, তাঁরই প্রেমাকর্ষণে নিবেদিতার চরম ত্যাগ ও পরম প্রাপ্তি। নিবেদিতার 'সব ছোড়্, সব পাওয়়ে'র মাধুর্যে গড়া অনন্য জীবন। তিলে তিলে, দিনে দিনে—অশেষ প্রদাহের মধ্য দিয়ে, কঠোর তপস্যা এবং আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে সে জীবনলাভ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কতদিন বা কত দীর্ঘ মাস-বর্ষব্যাপী সে প্রক্রিয়া তা আমার জানিনা, অনুমানও করিনা। কিন্তু একথা অনুমান করি যে মার্গারেট নোবেল থেকে ভারত-ভগ্নী নিবেদিতায় তাঁর যে সর্বতোভদ্র রূপান্তর সেটি মোটের উপর দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ

ছিল। পুরাতন সুদৃঢ় সংস্কাররাশীর সম্যক অপসারণ এবং তৎস্থলে ভারতীয় চিন্তা ও ভারতীয় জীবন-দর্শনের আধুনিকতম রূপটিকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোকে গ্রহণ খুব অল্প সময়ে হয়নি। বিনা সংঘর্ষেও হয়নি।

অথচ, তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার উচ্চাবচ বিচার বাদ দিলে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল গগনস্পর্শী, সর্বভাবে অবিসম্বাদী। কিন্তু বিচিত্র মানুষের অন্তর-জীবনের ইতিহাস, সূক্ষ্ম অনুভূতিগম্য বিচিত্র তার উত্থান পতনের কাহিনী। তাই, দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই নিবেদিতা সর্বাংশে স্বামীজী-প্রদর্শিত পথে আত্মবিনিয়োগে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু মায়ের কাছে ?

সেখানে একেবারে বিনা দ্বিধায় বিনা দ্বন্দ্বে, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান শত বাহ্যিক অসমতা সত্ত্বেও মুহূর্তে তাঁর পদপ্রান্তে নিজ দেহমন লুটিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন নিবেদিতা। বাংলাদেশের জল-মাটিতে গঠিত শ্যাম-কমনীয় মায়ের দেহখানির আকর্ষণে, চিরস্নিগ্ধ মাতৃভাব-মণ্ডিত অপার্থিব তাঁর মুখখানি দর্শন মাত্রে—'মা'-ডাক স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল নিবেদিতার কণ্ঠ থেকে। যেন যুগে যুগে ঐ রূপ তিনি দেখে এসেছেন, ঐ পাদযুগে প্রণাম করে এসেছেন। ঐ দক্ষিণ করতলের শুভ আশীষস্পর্শে ধন্য হয়ে এসেছেন, কৃতার্থ হয়ে এসেছেন। যেন কালে কালে তাঁরই চারদিকে ছোট একটি শিশুর মত, অপরিণত বয়স ও অপরিণত বুদ্ধি একটি সরলা, অবুঝ বালিকার মত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্রাম করেছেন। আবার দিবসান্তে তাঁরই পায়ের কাছটিতে নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে নিদ্রার কোলে লুটিয়ে পড়েছেন। এমনি একটি অস্পষ্ট বোধ ও চেতনা যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।...

অবশ্য, এক্ষেত্রেও স্বামীজীর জীবন-প্রভাবই অদৃশ্য পথে ক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বহিঃপ্রকাশে তার বৈচিত্র ছিল বিস্ময়কর।

স্বামীজী বলতেন,—Love me and love my dog.—আমাকে যদি ভালবাস তবে আমার সব কিছুকে ভালবাস, এমন কি, আমার কুকুরটিকেও ভালবাস।…

আর নিবেদিতার অসাধারণ জীবনটিতে এ-কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত হয়েছিল।

স্বামীজীকে ভালবেসেছিলেন নিবেদিতা। সে ভালবাসার তুলনা নেই, পরিমাপ নেই। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাকে সমর্থা প্রেম বলে, যে প্রেম নিজের জন্য কিছু চায় না, কোন দাবী রাখেনা, শুধু দিয়েই সুখী, দিয়েই পরিতৃপ্ত—তেমনি দুর্লভ প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন নিবেদিতা এবং তেমনি প্রেমের প্রশস্ত ভূমিতেই গুরুর জন্য অক্ষয় সিংহাসন তিনি স্থাপন করেছিলেন।

সুতরাং, স্বামীজীর কাছে যা-কিছু ভাল, তাঁর চক্ষে যা-কিছু প্রিয় নিবেদিতার কাছেও সে সবই ক্রমশঃ অনবদ্য হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন স্বামীজী তাঁর সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে। তাই ভারতবর্ষের প্রতি ধূলিকণাকে আপন বলে গ্রহণ করবার নিরলস জীবন-তপস্যা ছিল নিবেদিতার।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন স্বামীজীর গুরু, ইষ্ট, বন্ধু, সখা। ‘প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।’—

তাই নিবেদিতার ধ্যানমানসেও তাঁর স্থান সর্বোচ্চে স্থাপিত হয়েছিল।

আবার মা,—শ্রীমা সারদামণি,—স্বামীজী জানতেন, এ-যুগে ভারতবর্ষের নারী-আদর্শের মূর্ত-প্রকাশ এই মহীয়সী নারী। অতীতে ও বর্তমানে এক অভিনব যোগসূত্র স্থাপন করে অনাগত-কালের জন্য এক অতুলনীয় জীবনমহিমায় তিনি অধিষ্ঠিতা। কি মাতারূপে, কি গুরুরূপে, কি কন্যা বা জায়ারূপে—সর্বরূপেই তিনি অনন্যা, তিনি সার্থক। অতএব নিবেদিতার চক্ষেও অতি সত্বর মা অদ্বিতীয়া হয়ে উঠেছিলেন, পরম পূজনীয়া হয়ে উঠেছিলেন। এ

সবই প্রত্যক্ষ ঘটনা, বাস্তব সত্য। কিন্তু তার মধ্যেও একটি কথা থাকে। সেটি হচ্ছে এই যে—যে শ্রদ্ধা, যে প্রেম ও অনুরাগের বিষয় আমরা এতক্ষণ বিবৃত করেছি অপরের প্রভাব-সঞ্জাত হলে সচরাচর তাদের মধ্যে কতকটা দূরত্ব থেকে যায়, কতকটা ব্যবধান মাথা তোলে।

কিন্তু নিবেদিতা—যাঁর ধমনীতে ছিল কেল্টিক রক্ত, শিক্ষায় ছিল সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা—সেই মহাতেজস্বিণী নারী মায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের দিনটি থেকেই সে দূরত্ব সম্যক অপসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মায়ের স্নেহাকর্ষণে একান্তভাবে ধরা দিতে তাঁর মনে যেন কোন সঙ্কোচ, কোন জড়তা উদিতই হতে পারে নি। সে সামর্থ্য সহজ নয়, তার অসামান্যতা উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর চরিতানুধ্যানের এই একটি দিগ্‌দর্শন।

অবশ্য, সেদিনের পরিবেশটিও বড় অনুকূল ছিল। চতুর্দিকে প্রেম ও শুচিতা যেন নিত্য প্রবাহিত ছিল। ধ্যানে প্রশান্তি ছিল অব্যাহত। আর মায়ের দিব্য আশীষ-স্পর্শ ছিল অব্যর্থ ও অমোঘ।

নিবেদিতা দেখতেন,—প্রতিদিন রজনীর শেষযামে, দিবারম্ভের বহুপূর্বে শয্যা ত্যাগ করে—জপের মালাটি হাতে নিয়ে মা ধ্যানে বসেছেন। গৃহবাসিনী অন্যান্য সকলেও তাঁকে কেন্দ্রে নিয়ে নিঃশব্দে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছেন। ধীরে ধীরে ধ্যান-তন্ময়তায় সমস্ত কক্ষটি ভরে উঠেছে। নিস্তব্ধ নৈশ আকাশের ঈষদান্ধকার বিদীর্ণ করে জ্যোতির আভাস যেমন ফুটে উঠতে চাইছে আলোকশিশুর আবির্ভাবের অবিলম্বতা ঘোষণা করে, তেমনি ধ্যান-নির্মল অন্তরাকাশেও আনন্দের স্নিগ্ধ জ্যোতিধারা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হতে চাইছে। হাতের জপমালা স্তব্ধ হয়ে আসছে, অন্তরের অজপা-জপ চকিতে বীজ মন্ত্রের নবভাষ্য রচনা করে দিচ্ছে। অবলুপ্ত হচ্ছে স্থান, কাল ও দেহ-চেতনা। শুধু একাগ্র ঊর্ধ্বমুখতার অবাচ্য প্রশান্তিতে, অন্তহীন কালস্রোতে সকলে ভাসমান। সে

এক অপার্থিব অনুভূতি, স্বর্গীয় তন্ময়তা।···এরই মধ্যে রাত্রি প্রভাত হয়েছে, সৃষ্টি জাগ্রত হয়েছে। মা ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করে আসন ত্যাগ করেছেন। তারপর, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে কাউকে সঙ্গে নিয়ে একান্ত লজ্জাশীলা পল্লীবধূটির মত পায়ে হেঁটে তিনি গঙ্গাস্নানে চলেছেন। দিনের পর দিন নিবেদিতা দেখতে পেতেন এই দৃশ্যটি।

আর দেখতে পেতেন, মায়ের অদ্ভুত গঙ্গা-প্রীতি, গঙ্গাজলের পূত শক্তির উপর অখণ্ড বিশ্বাস। উত্তরকালে, এই বিশ্বাসটিকে নিজ বিশ্বাসের সঙ্গে একত্র মিশিয়ে হিন্দুর গঙ্গাপ্রীতির বিশ্লেষণ করেছিলেন নিবেদিতা। বলেছিলেন, হিন্দুর গঙ্গা-প্রীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, গঙ্গার প্রতি তার সশ্রদ্ধ অনুরাগের ইতিহাস আছে।···

কত যুগ, মন্বন্তর ধরে অখণ্ড বিশ্বাসে এই নদীতে তারা অবগাহন করেছে। 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারী'—এ বিশ্বাসে বিন্দু বিন্দু গঙ্গাজল পান করে কৃতার্থ হয়েছে। লক্ষ-কোটি নরনারীর সে গভীর বিশ্বাস স্বতঃই সে নদীজলে অনুস্যূত হয়েছে। মহাদেবের জটা-নিসৃত ত্রিধারা মহামতি ভগীরথের শঙ্খনিনাদ অনুসরণ করে আকাশপথে যখন এই পৃথিবীর বুকে নিপতিত হল, তখন সে ভাগীরথী, তখন সে সুরধুনী গঙ্গা। আবার, স্বর্গে দেব-নিবাসে সে মন্দাকিনী, আর পাতালেতে ভোগবতী। তার স্পর্শমাত্রে কলুষ-মালিন্য মুছে যাবে, অভিশাপ অপসারিত হবে। পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার সে পৌরিণিক মহিমা যুগে যুগে অগণ্য নরনারী অশেষ শ্রদ্ধায় শ্রবণ করছে, বিশ্বাস করেছে। আবার এরই তীরে কালে কালে উত্তর ভারতের যত স্মরণীয় মহাতীর্থ—তাদের অধিকাংশ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গোত্রী থেকে শুরু করে হৃষিকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র এরই তীরে অবস্থিত। প্রয়াগের মহাসঙ্গম, বারাণসী শিবক্ষেত্র, নবদ্বীপ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর—সবই ঐ গঙ্গার তীরে। সবই গঙ্গাবারি-স্পর্শে মহিমান্বিত।

ভৌগোলিক বিচারে—স্রোতস্বতী গঙ্গা হিমগিরির কোন এক অজ্ঞাত উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে অকস্মাৎ সমতল ভূখণ্ডের দিকে প্রসারিত হল—এই সঙ্কল্প নিয়ে—

'আমি ঢালিব করুণাধারা—
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।'

দেখতে দেখতে, শতযোজন-বিস্তৃত ভূ-প্রদেশ উর্বর পলিমাটিতে ভরে গেল, শ্যাম-শস্যে শোভান্বিত হয়ে উঠল। সৃষ্টি হল ইতিহাস-খ্যাত গাঙ্গেয় উপত্যকা। কিন্তু শুভ্র ফেনরাশির পুষ্প-অর্ঘ্য শিরে নিয়ে অশ্রান্ত প্রবাহে তখনও ছুটে চলেছে গঙ্গা মহাসমুদ্রের মহানীলে নিঃশেষ আত্মনিবেদনের আকুতি নিয়ে।

পূর্বাপর গতিময়, প্রাণময়, পূত-সলিলা গঙ্গা। 'Happy is the source, happy is the course, happy is the estuary.'

আবার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও গঙ্গাবারি অদ্ভুত। কোন কলুষ তাকে স্পর্শ করে না, কোন দূষিত কীট তার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে না। প্রতি পূজা-পার্বনে হিন্দুরা ব্যবহার করে এই গঙ্গাজল। কত দূর দূরান্ত থেকে নানপাত্র পূর্ণ করে গৃহে নিয়ে যায়। রক্ষা করে সমগ্র বৎসর—নানা পূজা-অর্চনার জন্য। কিন্তু কখনো সে জল দূষিত হয় না, অপবিত্র হয় না—যেমন হয় অন্য যে-কোন নদী বা জলাশয়ের বারি।

কত কবি, ঋষি অনবদ্য ছন্দগাথায় যুগে যুগে বন্দনা করেছেন এই জলধারাকে, অভিনন্দিত করেছেন এই মহানদীকে।

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত গিরিবরমণ্ডিত ভঙ্গে।
ভীষ্মজনীন খলু মনিবরকন্যে, পতিত নিবারিণি ত্রিভূবন ধন্যে।

—স্বয়ং আচার্য শঙ্করের এই গঙ্গা-বন্দনা। অতএব, গঙ্গাজলের পূত মহিমায় হিন্দু বিশ্বাস করবে বৈকি! অবশ্য, এসব বিশ্লেষণ নিবেদিতা করেছেন অনেক পরে; ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের

নানা দিকের উপর গ্রন্থাদি রচনার কালে। কিন্তু, একথা মনে হয় যে মায়ের অপূর্ব গঙ্গাপ্রীতি দেখেই সে নদী সম্পর্কে একটি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিবেদিতার অন্তরে প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু সে কথা যাক। আমরা মায়ের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের কথা বলছিলাম।—

গঙ্গাস্নানের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মা পূজা করতে বসতেন এবং পূজা অন্তে কখনো নিজ হস্তে, কখনো অপর কোন ভক্তকে দিয়ে প্রসাদ দিতেন উপস্থিত সকলকে। তারপর, দ্বিপ্রহরের আহার্য গ্রহণ করে অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। কলিকাতার অবিশ্রাম কোলাহল-মুখরতার মধ্যেও মায়ের বাড়ীটি তখন যেন শান্ত ও নিঃস্তব্ধ হয়ে যেত। উত্তীর্ণ-মধ্যাহ্নে আবার মায়ের কক্ষে কোন্-না-কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত। মা সকলের মধ্যস্থলটিতে বসে পাঠ শ্রবণ করতেন, প্রশ্ন ও সমস্যার মীমাংসা করতেন। নানা প্রসঙ্গে ও ইঙ্গিতে পুঁথির নিষ্প্রাণ তত্ত্বকথা জীবন্ত হয়ে উঠত। কখনো কখনো, এই সময়টিতেই নানা স্থান থেকে ভক্তরা আসতেন মাকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে। মা কল্যাণ-স্মিত হাস্যে তাদের আশীর্বাদ করতেন, স-স্নেহ সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করে দিতেন। এমনি ভাবেই অপরাহ্ণ গড়িয়ে যেত, সমাগত হত সন্ধ্যা। সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে, যখন গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ বাজত, ঘণ্টা বাজত, জ্বলে উঠত সন্ধ্যাদীপ তখন মাতৃগৃহের ঠাকুরঘরটিতেও দেবতাদের আরতি হত, দেবস্তোত্র গীত হত। তারপর, আরত্রিক অন্তে স্তিমিত দীপালোকে স্ত্রীভক্তদের নিয়ে আবার মা ধ্যানস্থ হতেন প্রাতঃকালেরই মত।

অনেক রাত্রে, ধ্যান জপাদি অন্তে, সামান্য কিছু আহার করে সকলের খাওয়া ও শয়নব্যবস্থার খুঁটিনাটি সংবাদ নিয়ে মা শয্যাশ্রয় গ্রহণ করতেন।

প্রতি নিয়ত কত সমস্যা উঠত, সঙ্গত-অসঙ্গত কত প্রার্থনার দাবী

আসত,—কত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হত, কিন্তু মা, তারই মধ্যে অতি সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রসন্নতার প্রতিমূর্তিরূপে বিরাজ করতেন, চলাফেরা করতেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের দিনগুলিতে, কী পরবর্তী কালের 'উদ্বোধনের' অথবা জয়রামবাটীর দিনগুলিতে—এই ছিল মায়ের উদয়াস্তের কৃত্য তালিকা। এর মধ্য দিয়ে নিবেদিতা যে শুধু একটি আদর্শ আশ্রমিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাই নয়, পরন্তু নিজ অন্তর ও বাহির উভয় জীবনেরই জন্য এক অমূল্য পাথেয়ও তিনি ঐ শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্য থেকেই সযত্নে আহরণ করে ধন্য হয়েছিলেন। কত সমাদরে ও শ্রদ্ধায় সে আহরণ-বার্তা যে তিনি স্মরণ করতেন, কত ভক্তি এবং বিনম্রতায় সে সৌভাগ্যকাহিনী উল্লেখ করতেন— তা প্রকাশ করা যায় না।

একদা, এসব দিনের বহুকাল পরে, দূর বিদেশ থেকে স্বামীজীর অন্যতম বিদেশিনী মহিলা-ভক্ত সারা, সি, বুলের অসুস্থতা উপলক্ষ্যে মাকেই সে কথা নিবেদন করেছিলেন নিবেদিতা একটি অপূর্ব-মধুর লিপির মধ্য দিয়ে। যথাস্থানে সে লিপিটি আমরা উদ্ধৃত করব।

এখানে শুধু এইটুকু বলি যে—

এভাবেই শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহাশীর্বাদের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর নিরাপদ আশ্রয় ও অনুমোদন লাভ করে নিবেদিতা বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র প্রথম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মায়ের ভক্ত পরিবারটি তখনো খুব বৃহদায়তন হয়ে ওঠেনি—সে কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু বৃহদায়তন না হলেও সে পরিবারের বৈচিত্র্য কিছু কম ছিল না। মায়ের জীবনের নিত্য সহচরী যোগীন-মা, গোলাপ-মা সে পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যা ছিলেন। তাঁরা উভয়েই অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের বধূ ছিলেন, গৃহিণী ছিলেন।

আর ছিলেন ধর্মজীবনের অতি উচ্চ সাধিকা। মায়ের পিত্রালয়ের নিকট ও দূর আত্মীয়বর্গ, যাঁরা অনেক সময় মায়ের কাছে থাকতেন, তাঁদের মধ্যেও রুচি ও প্রকৃতির ভিন্নতা ছিল বহুমুখী। তাছাড়া, ব্রাহ্মণেতর বহু পরিবারেরও বহু মহিলার আসা-যাওয়া ছিল অবিশ্রাম।

এদের সকলের মধ্যেই ধীরে ধীরে নিবেদিতা একটি সমাদরের স্থান লাভ করেছিলেন—অতি অল্পকালে।

এ ছাড়া, আরও একটি ঘটনা একালেই সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ, একালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভিন্ন আরও একজন সিদ্ধসাধিকা মহীয়সী নারীর সান্নিধ্য এবং আশীর্বাদ লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন নিবেদিতা। সে কাহিনীটিও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাখ্যায়িকায় দেবী অঘোরমণির কথা আছে। উল্লেখ আছে তাঁর বাৎসল্য ভাব-সাধনার অনবদ্য কাহিনী।

প্রাচীন বাংলার সমাজব্যবস্থায়—তখনকার দিনে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে বাল্যবিবাহ একটি অতি সাধারণ প্রথা ছিল। সে প্রথানুসারে ব্রাহ্মণ-কন্যা অঘোরমণিও অতি শৈশবে, মাত্র আটবৎসর বয়সে, পরিণীতা হয়েছিলেন এবং বিধবাও হয়েছিলেন প্রায় একই বৎসরে। তারপর দীর্ঘকাল, প্রায় অশীতিবর্ষব্যাপী ছিল তাঁর একটানা বৈধব্য জীবন। অপর কোন ব্যক্তির হাতে তিনি জল গ্রহণ করতেন না। দিনের তৃতীয় প্রহরে একবার মাত্র একমুষ্টি আতপ-চাউল তাঁর আহার ছিল এবং সেও ছিল সপ্তাহের চার-পাঁচ দিনের বেশী নয়। বাকী দিনগুলি নিরম্বু উপবাসেই তাঁর অতিবাহিত হত।

তপস্যায় ও কৃচ্ছ্রতায়, আচারে ও নিষ্ঠায় সে জীবনের প্রায় সবটাই এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস।

শ্বশুরকুল বা পিতৃকুল,—কোন কুলেই, তাঁর আপনজনও কেউ ছিল না। নিঃসঙ্গ বিধবা গঙ্গার তীরে এক বৃহৎ পুরাতন অট্টালিকার

একাংশে একটি একান্ত নির্জন কক্ষে অহোরাত্র ভগবৎচিন্তায় অতিবাহিত করতেন। অবিরাম জপ ও ধ্যানই ছিল জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

এইভাবে বহুবৎসর অতিক্রান্ত হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যদর্শন তিনি লাভ করেছিলন, এবং তার অল্পকাল পরেই এক পরম মুহূর্তে দীর্ঘ তপস্যার অমৃতফল লাভে ধন্য হয়েছিলেন। নবজন্ম লাভ করেছিলেন। বাৎসল্যরতির চরমোৎকর্ষে সচ্চিদানন্দ ঘন নিরাকার ভগবানকে সীমার গণ্ডীর মধ্যে বালগোপালরূপে তিনি দর্শন করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক 'গোপালের মা' সম্বোধনে বহুধা সম্মানিত হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে সে অনবদ্য দিব্য ঘটনার এইরূপ বর্ণনা আছে···

'১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে—শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত।···

এই সময় কামারহাটির ব্রাহ্মণী একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে, ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার আগে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং দক্ষিণ হস্তটি মুটো করার মত দেখা যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, এ কি? এমন সময় ইনি, কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন? গোপালের মা বলেন, আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ভাবছি —এদিকে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে গোপালের বাঁ হাতখানি যেমন ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল, এতবড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে, এক হাত তুলে, আমার মুখপানে চেয়ে বললে,—'মা, ননী দাও!' আমি

তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান।···চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম। সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জন মানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হত। কেঁদে কেঁদে বললুম—'বাবা, আমি দুঃখিনী, কাঙালিনী, আমি তোমাকে কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব! কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারিকেলের লাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম—'বাবা, গোপাল আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিষ খেতে দিলুল বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।'

তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। যেমন সকাল হোলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্লো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও একহাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চল্লুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দু'খানি আমার বুকের উপর ঝুলচে।'

এই গোপালের মার প্রথম ভগবান দর্শনের ইতিহাস। তারপর সে দর্শনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় দুইমাস কাল, দেবী অঘোরমণি বালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবা রাত্রি বুকে পিঠে নিয়ে একসঙ্গে বাস করেছিলেন। সেও এক বিস্ময়কর কাহিনী।··· লীলাপ্রসাঙ্গর গ্রন্থকারের ভাষায়—'একে তো শ্রীভগবানে বাৎসল্যরতিই জগতে দুর্লভ,—ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানের লেশমাত্র মনে থাকিতে উহার উদয় অসম্ভব—তাহার উপর সেই রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহায়ে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানের এইরূপ দর্শন লাভ করা যে আরও কত দুর্লভ তাহা সহজে অনুমিত হইবে। প্রবাদ আছে,—'কলৌ জাগর্তি গোপালঃ, কলৌ জাগর্তি কালিকা'—তাই অদ্যাপিও শ্রীভগবানের ঐ দুই ভাবের এইরূপ জ্বলন্ত উপলব্ধি কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন,—'তোমার খুব হয়েছে। কলিতে এমন অবস্থা বরাবর থাকলে, শরীর থাকে না।'…

এই মহীয়সী, বৃদ্ধা তপস্বিনীর সান্নিধ্যও নিবেদিতা একালেই লাভ করেছিলেন। শুধু সান্নিধ্যই বা কেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিনগুলি নিবেদিতার ঐকান্তিক সেবা-যত্নের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। নিবেদিতারই প্রাণঢালা শুশ্রূষা ও পরিচর্যার মধ্যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করেছিলেন।…

প্রকৃতির অদৃশ্য হস্ত-নিয়ন্ত্রণ অতি বিচিত্র। ভগবানের বিধি-বিধান সত্যই বড় দুর্জ্ঞেয়। তাই, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্রহ্মচারিণী, বাল-বিধবা গোপালের মা, যিনি একদা শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের ছোঁয়া আহার্য পর্যন্ত গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন, তিনিই জীবনের শেষ পর্যায়ে, জাতি বিচারের সর্বগণ্ডী অক্লেশে অতিক্রম করে 'নরেনের মেয়ে' নিবেদিতাকে অশেষ স্নেহে নিজ সর্ব সেবাধিকার দান করে কৃতার্থ করেছিলেন উত্তরকালে। তাঁর প্রথম পুণ্যদর্শন লাভের ঘটনাটি নিজ আত্ম-কাহিনীতে অপূর্ব মমতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিবেদিতা :

এক পৌর্ণমাসী রজনীর শুভ লগ্নে আমরা কয়েকজন একত্র হয়ে তাঁকে দর্শন করতে কামারহাটি গিয়েছিলাম। ভাগীরথীর বুকে চন্দ্রের রজত-শুভ্র আলোকধারা সেদিন এক অবর্ণনীয় শোভা বিস্তার করেছিল। কামারহাটির উদ্যানবাটীর অবস্থান ছিল একেবারে গঙ্গার উপর। গঙ্গার ঘাট থেকে দীর্ঘ সোপান শ্রেণী ধাপে ধাপে উঠে গেছে। ঘাটের পরেই শষ্পাবৃত বিস্তৃত প্রাঙ্গন এবং তারই দক্ষিণে উদ্যানগৃহের একটি প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার একপ্রান্তে একান্ত অপরিসর একটি কক্ষ। সেই কক্ষটিতেই জীবনের সুদীর্ঘ বৎসরগুলি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানজপে অতিবাহিত করেছেন দেবী অঘোরমণি।

কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমরা দেখেছিলাম—আসবাব-

পত্র কিছু নেই, শয্যাদ্রব্যও কিছু নেই। শ্বেত পাথরের নগ্ন মেঝেতেই তাঁর শয্যা। কিন্তু সমস্ত স্থানটি যেমনি পরিচ্ছন্ন তেমনি শুচি স্নিগ্ধতায় সৌরভময়। হাতের কাছেই কুলুঙ্গীতে একখানি পুরানো রামায়ণ, আর প্রাচীর গাত্রে ঝোলান একটি জীর্ণ জপের মালার থলি। ঐ মালায় নামজপ করেই তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন, বালগোপালের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে চরিতার্থ বোধ করেছিলেন।

আমরা যখন সে পুণ্যস্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন বাইরের গাছগুলি, তাদের বহুদূর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার পুষ্পস্তবক গুলি শুভ্র চন্দ্রালোকে এক রহস্যময় স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়েছিল যেন এক শ্বেত মর্মরের স্বপ্ন পুরীতে কত অশরীরী দেবতা ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মৃদুস্বরে কথা কইছেন। আর তাঁদেরই মধ্যে, এই সদাব্যস্ত, নিয়ত কোলাহলমুখর ধরিত্রীর অপর প্রান্তে গোপালের মা'র জপশুদ্ধ, ক্ষুদ্র গৃহখানি পরমা শান্তির অক্ষয় সংবাদ বুকে ধারণ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গম্ভীর, নিভৃত মহিমার কোন তুলনা হয় না।'

অবশ্য স্বামীজীই উদ্যোগী হয়ে তাঁদের পাঠিয়েছিলেন সেই তপোবনটিতে—প্রাচীন ভারতের নারী-আদর্শের একটি জীবন্ত নিদর্শন দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেদিন 'গোপালের মা'-র নিকট থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলে নিবেদিতাকে স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন—'গোপালের মাকে কেমন দেখলে? কেমন লাগল?'...নিবেদিতা তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞতা কী ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু স্বামীজী নিজে সে অসামান্য জীবনের ভাষ্যরূপে অতি সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলেছিলেন—

'Ah! this is the old India that you have seen, the India of prayers and tears, of vigils and fasts that is passing away, never to return!'

এই ভারতবর্ষ। তপস্যার ও বেদনার, কৃচ্ছ্রতার ও আত্মচেতনার

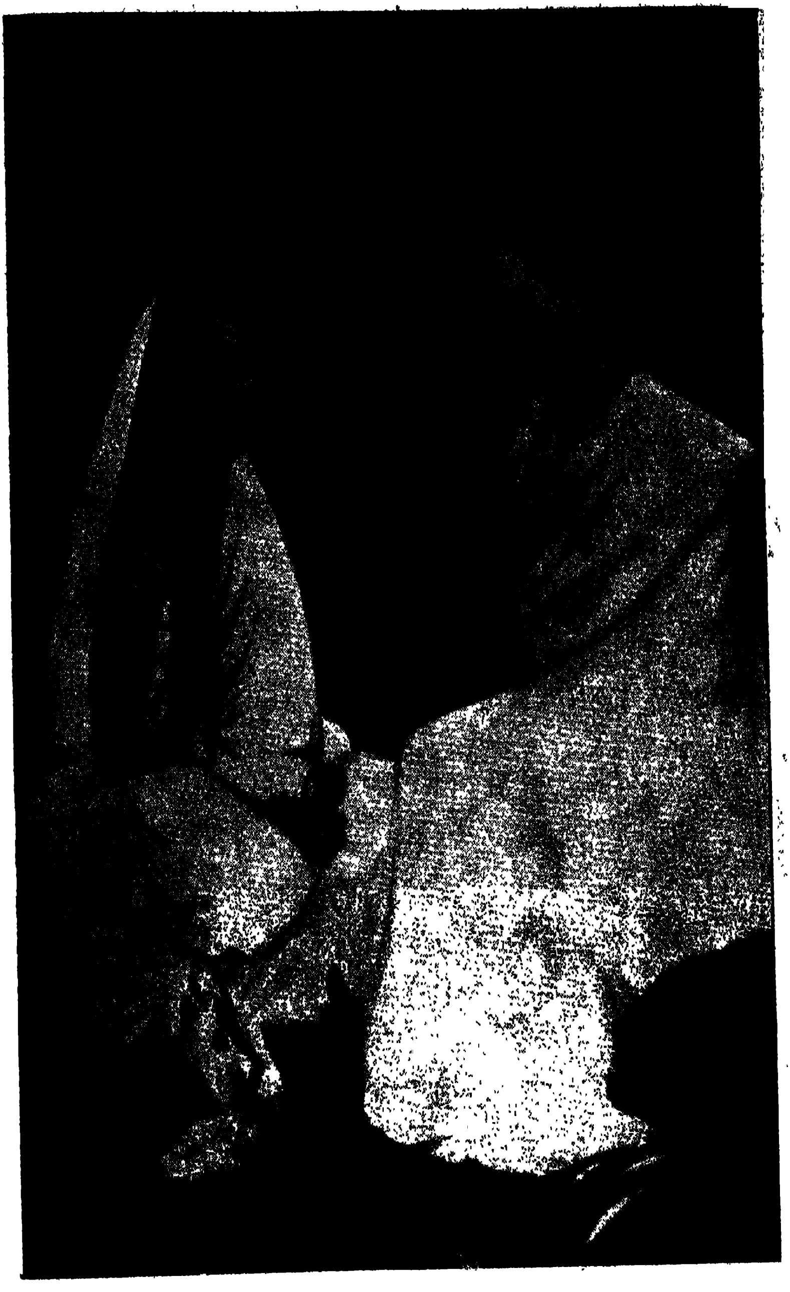
এই ভারতীয় প্রকাশ। কিন্তু হায়, এ-জাতীয় জীবন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অতি দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর ফিরবে না।

এইভাবে, শ্রীমা ও গোপালের মা, দেবী সারদামণি ও দেবী অঘোরমণি—এই দুই মনস্বিনী নারীর নিবিড় স্নেহস্পর্শ ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে একদিকে যেমন বর্ণাশ্রম-শাসিত গোঁড়া হিন্দুসমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার একটি সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিলেন নিবেদিতা, অন্যদিকে তেমনি, সেই দুই অসামান্য জীবনের দিব্য আলোকেই ভারতীয় নারী-আদর্শের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করবার প্রকৃত সামর্থ্যও তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয়েছিল।

বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে, কেতাবী শিক্ষার স্বল্পতা স্বত্বেও পরাজ্ঞান লাভের যথাযথ শক্তি যে ভারতীয় জীবন-দর্শন ধারণ করে—এই দুই নারীজীবন সহায়েই মুখ্যতঃ তিনি যেন সম্যক ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেকথা। সেই হেতু উত্তরকালে শ্রীশ্রীমার জীবনালোচনা প্রসঙ্গে নিবেদিতার কণ্ঠ থেকে এই সার্থক উক্তি নির্গত হয়েছিল ঃ

ভারতীয় নারী-আদর্শের চরম অভিব্যক্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিরাট কল্পনাপ্রসূ মনের পক্ষেও নারী-আদর্শের অন্য কোন মহত্তর অভিব্যক্তি ধারণা করা সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে দেবী সারদামণিই তাঁর শেষ কথা।

'To me it has always appeared that she is Sree Ramakrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood. But is she the last of an old order or the beginning of a new? In her one sees realised that wisdom and sweetness to which the simplest of women may attain And yet, to myself



শ্রীমা ও নিবেদিতা

the stateliness of her courtesy and her great open mind are almost as wonderful as her sainthood.'

অথবা,

'আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কোন দিন কোন প্রশ্নের, তা সে যত জটিলই হোক, যত সমস্যাসঙ্কুলই হোক, উত্তর দিতে তাঁকে মুহূর্ত দ্বিধা করতে দেখিনি। অথচ, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সমাধান সমূহ কত সহজ ছিল, কত সুন্দর ও মৌলিক ছিল।

বস্তুত তাঁর সমগ্র জীবনখানিই একটি নীরব অশ্রান্ত প্রার্থনা। ভগবৎবিধান সর্বত্র, সর্বাবস্থায়ই কল্যাণপ্রসূ—এ বিশ্বাসই সে জীবনের ভিত্তি।'

'Her life is one long stillness of prayer. Her whole experience is of theocratic civilisation. Yet, she rises to the height of every situation. Is she tortured by the perversity of any about her ? The only sign is a strange quiet and intensity that comes upon her.

Does one carry to her some perplexity or mortification born of social development beyond her ken ? With unerring intuition she goes straight to the heart of the matter, and sets the questioner in the true attitude to the difficulty.'

এই ভাবেই নিবেদিতার একালের জীবনের যে দু'টি সমস্যার কথা এ পর্যায়ের প্রারম্ভে আমরা উল্লেখ করেছি—তাদের প্রথমটির সমাধান হয়েছিল।

কিন্তু অপরটির? অর্থাৎ, বাংলার মাটিতে নবযুগের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দুরূহ কার্যটি? সেটিও অবশ্য এই সময়েই সূচিত হয়েছিল এবং তারও যাত্রারম্ভে মায়েরই শুভ-আশীর্বাদ ছিল অমূল্য পাথেয়।

পরবর্তী পর্যায়ে সেটিই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

সাত

সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর নিবেদিতা কলিকাতা মহানগরীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন একথা পূর্ব পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। স্বামীজীও তখন কলিকাতার উত্তরাংশে বাগবাজার পল্লীতে ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর গৃহে। সে-কথাও পূর্বে বলা হয়েছে।

সেই বলরাম বসু-মন্দিরে, স্বামীজীকে ঘিরে ভারতবর্ষে নানা কর্ম প্রবর্তনার কথা তখন নিত্য আলোচিত হচ্ছে। এ মর্ত জীবনের পরমায়ু আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই—এবিষয়ে তখন নিঃসংশয় হয়েছেন স্বামীজী।

অলক্ষ্য, রহস্যাবৃত প্রদেশ থেকে প্রভুর আহ্বান আসছে ক্ষণে ক্ষণে, ধ্বনিত হচ্ছে অন্তরের নিভৃত নিরালায় ঃ

'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে। সংসারীর ভালোমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুকগে। তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।'

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরভবানীর অপ্রত্যাশিত অশরীরী বাণীও ধীরে ধীরে অপসারিত করছে আবরণ, উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে আপন স্বরূপ।

কোন্ দূর অন্তরাল থেকে কে যেন গাইছে, মর্মস্পর্শী সুস্বর সংগীত, যে সংগীত একদিন বিগত অতীতে তিনি স্বয়ং শুনিয়েছিলেন নিজ গুরুকে ঃ

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।...

তাই স্বামীজী এখন ব্যস্ত, কতকটা অধীরও বটে। যা কিছু কাজ

এখনো অনারব্ধ, এখনো বাকী—যথাসত্বর তাদের গোড়াপত্তন করে দিতে হবে, যোগ্য পাত্রে তাদের দায়িত্ব ন্যস্ত করে প্রস্তুত হতে হবে মহা-যাত্রার জন্য। অধীরতার মূল কারণ তাই।··· স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার তাঁর কর্ম-পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ। যে পাখির এক পাখা ভেঙ্গেছে তার পক্ষে ঊর্দ্ধ-আকাশে ডানা মেলে বিচরণ করা সম্ভব নয়।

'এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকট দিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে
অঙ্গহীন।'···

এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, নিঃসংশয়। কাজেই এখন, অর্থাৎ উত্তর ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়েই, একদিকে যেমন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 'নরাপদ স্নেহাশ্রয়ের মধ্য দিয়ে নিবেদিতাকে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের একান্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করাবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি একটি অনাড়ম্বর সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আদর্শে ভারতীয় নারীর শিক্ষাকার্যে যথাসত্বর তাকে নিয়োজিত করবার জন্যও তিনি বিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

নিবেদিতার নিজের আগ্রহও তখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিল। ঝড় প্রশমিত হ'য়ে বায়ু তখন অনুকূল হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে স্বকীয় চিন্তাধারার সম্যক সামঞ্জস্য বিধানে এখন তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা নেই, বাধা নেই। স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে ভারতবর্ষের জীবনরহস্য তাঁর কাছে এখন বহুলাংশে সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছে, অর্থপূর্ণ হতে শুরু করেছে। তাছাড়া, আলমোড়ার সেই প্রদোষ-লগ্নের অক্ষয়-স্পর্শ নিয়ত ক্রিয়াশীল থেকে নিবেদিতার অনুভূতিকেও ক্রমশঃই স্বচ্ছ করে

দিচ্ছে। অতএব, নিবেদিতাও চাইছেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিতে। যত ক্ষুদ্র আয়তনেই হোক—একটি আদর্শ স্ত্রীশিক্ষায়তনের সূচনা করতে।...তাই স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বিদ্যালয় সম্পর্কে কার্যকরী আলোচনা প্রথম শুরু করেছিলেন নিবেদিতা।...

তারপর, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য ১২ই নভেম্বর তারিখে একটি ঘরোয়া ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হল। সে সভায় স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট সন্ন্যাসীগণ, আর ছিলেন মাষ্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহন বাবু প্রমুখ প্রাচীন গৃহীভক্তগণের অনেকে।...

নিবেদিতাই সে সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন। সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে। 'উদ্বোধনের' পৃষ্ঠায় যথাকালে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।...বিবরণীটি এইরূপ ছিল ঃ

'একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে সব গৃহস্থ ভক্তদের একটি সভাগোছের, ঘরোয়া জলসা হলঘরে হলো। যাতে গৃহস্থেরা মেয়ে দেন ঐ স্কুলে,—এই আবেদন। সকলে বসে আছেন। এমন সময় অতর্কিত ভাবে স্বামীজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন। মাষ্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহন বাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামীজী কয়েক জনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন, ওঠ্ ওঠ্। ওঠ্ না।... উঠে বল, আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল, হ্যাঁ আমরা রাজী আছি। আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।

কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজী হরমোহন বাবুকে জিদ করে চাপা গলায় বললেন,—তোকে দিতেই হবে। তাঁর হয়ে স্বামীজী নিজে তখন বললেন,—'Well, Miss Noble, this gentleman offers his girl to you.'

নিবেদিতা প্রথম দেখতে পাননি যে ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামীজী

আছেন। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা খুব বেশী রকম খুশী হলেন। হাত তালি দিতে লাগলেন।'

সে যাই হোক—গৃহীত হল একটি বিদ্যালয় খুলবার প্রস্তাব এবং অবিলম্বে তার প্রতিষ্ঠাকার্যও আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপিত হয়ে গেল—সতের নম্বর বোসপাড়া লেনের একটি অপরিসর ভাড়াটে বাড়ীতে।

নিবেদিতার ভারতবর্ষের কর্মজীবনে সে এক অবিস্মরণীয় দিন, এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।...

সেদিনটি রবিবার ছিল। উদ্বোধন-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গৃহটি যথাসম্ভব সজ্জিত করেছিলেন নিবেদিতা। দ্বারে স্থাপন করেছিলেন মঙ্গল-কলস, স্থাপন করেছিলেন পুষ্পমালা, পতাকা।

শুভ শঙ্খধ্বনির অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলেন মহা-সরস্বতী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। বাহ্যিক আড়ম্বর কিছুই ছিল না। শুধু পরিবেশের স্বচ্ছ পবিত্রতায় এবং সঙ্কল্পের ঐকান্তিকতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, মহিমময় হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রীমা তাঁর নিত্য-সহচরী গোলাপ-মা ও যোগীন-মাকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। উদ্বোধন কার্যের তিনিই ছিলেন সর্বাধিকারিণী। তিনিই সম্পন্ন করেছিলেন আনুষ্ঠানিক পূজা, তিনিই করেছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। তাঁকে কেন্দ্রে নিয়েই সমগ্র আয়োজনটি সার্থক হয়েছিল। তাঁর উপস্থিতিই ছিল যেন নিবেদিতার দুর্লভ পাথেয়, অনন্ত ভরসা।

প্রতিষ্ঠা-পূজা শেষ করে বিদ্যালয় গৃহের চতুর্দিকে তাঁর অমোঘ বাণী যেন শব্দ তরঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। বলেছিলেন, 'আমি প্রার্থনা করছি যেন এ বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। আর এখান থেকে শিক্ষালাভ করবে যে-সব ছাত্রী তারা যেন আদর্শ নারীরূপে গড়ে ওঠে।'

মৃদুস্বরে উচ্চারিত মায়ের সে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ—উচ্চকণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন গোলাপ-মা।…

সে প্রার্থনা ও আশীর্বচন দু'দিন আগেই হোক, আর পরেই হোক, সার্থক হবে, জাতির বহু-বিস্তৃত জীবন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে, সে-কথা স্বামীজী জানতেন। কিন্তু নিবেদিতাও সেদিন যেন কোন অদৃশ্য শক্তি-প্রভাবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন সে সত্য, নিঃসংশয় হয়েছিলেন বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তাই প্রতিষ্ঠা-উৎসবের শেষে গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন,—'এ বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে ভবিষ্যতের সে সব শিক্ষিত হিন্দু-নারীর পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের পূত আশীর্বাদের চাইতে আর কোন মহত্তর বা বৃহত্তর শুভ সামগ্রী আমি কল্পনা করতে পারি না। এই-টিই সর্বোৎকৃষ্ট।'—

শুরু হয়েছিল যাত্রা,—'শুভকর্ম পথে ধরি নির্ভয় গান।'

প্রতিষ্ঠার পর দিন থেকেই যথারীতি বিদ্যালয়ের পাঠের কাজও আরম্ভ হয়েছিল।

অর্থ নাই, কর্মী নাই, সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ কিছুই নাই। উপযুক্ত গৃহ নাই, সুপরিসর স্থান নাই। সর্বোপরি, বিদ্যার্থীও নাই বললেই চলে। তথাপি আরম্ভ হল বিদ্যালয়ের দুর্গম পথযাত্রা।…

এখন থেকে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বেকার কথা আমরা বলছি। সেদিনের হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একান্ত গৌণ বলে চিহ্নিত ছিল। অষ্টমবর্ষে গৌরীদানের মহাপুণ্য তখনও হিন্দু পিতা-মাতার পরম কাম্য বস্তু। তার উপর, কোন খ্রীষ্টান রমণী, যার ছোঁয়া জল পর্যন্ত অপাণীয়, তিনি গ্রহণ করবেন হিন্দু পুরনারীর শিক্ষাভার, কিংবা উন্মুক্ত সাধারণ রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে মেয়েরা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে করবে যাতায়াত লেখাপড়া শিখতে,—সে সবই ছিল দূর দুঃস্বপ্নের কথা। তবু, তারই মধ্যে, সে প্রতিকূলতারই মধ্যে পা বাড়িয়েছিলেন নিবেদিতা—

কখনো দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন দূর অতীতের দিকে, কখনো ভারত-ইতিহাসের গর্ভগৃহের দিকে। ব্যক্ত এবং জাগ্রত যে বর্তমান, সে বর্তমানে ভরসা ছিল শুধু গুরুর নির্দেশ ও প্রেরণা, আর জীবন্ত মহা-সরস্বতীর অমোঘ আশীর্বাদ।—

অতীতের দিকে যখন তাকাতেন, তখন নিবেদিতার মনে হত যে, প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার সিদ্ধান্তগুলি অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা শাশ্বত এবং কালজয়ী মহাশক্তিতে মহিমান্বিত। সে যুগের কর্মপ্রণালীও যেন তাঁর চক্ষে বহুলাংশে সর্বকালোপযোগী বলেই প্রতিভাত হত।

সে দিনের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি,—নিজকে জানা। আত্মানং বিদ্ধি—এই ছিল নির্দেশ। এক অজ্ঞাত, রহস্যাকীর্ণ অতীতের গর্ভগৃহ থেকে এই জীবধাত্রী পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ একদিন তুমি জন্মলাভ করেছ। কেন করেছ জাননা, কীভাবে করেছ জাননা। আবার, আর এক মহাশূন্যতার দিকে মহাকাল তোমাকে অনিবার্য আকর্ষণে নিয়ে চলেছে। কেন নিয়ে চলেছে তাও জাননা। অথচ সেখানে, সেই নিরন্ধ্র মহাশূন্যতার মধ্যেই ঘটবে তোমার নিঃশেষ অবলুপ্তি। আর এই দুই অজ্ঞাত অন্তহীনতার মধ্যে, জাগ্রত বর্তমানে সীমিত যে অপরিসর কালটুকু তা নিয়েই তোমার বর্তমান জীবন!

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

কিন্তু এই মহাতত্ত্বের অন্তর্নিহিত রহস্যটি কি তুমি জান? না, তুমি জান না? আর জান না বলেই তোমার দুঃখের নিবৃত্তি নেই, কামনা-বাসনার দোলা-চাঞ্চল্যে অশান্তির অবধি নেই। মৃত্যুর মহাভীতির হাত থেকে নিস্তার লাভের কোন উপায়ই তোমার জানা নেই।

(প্রাচীন যুগের নির্দেশ তাই ছিল—জান, নিজেকে জান। পরাজ্ঞান আয়ত্ত কর। দ্বন্দ্বাতীত যে মহাজীবন, সেই মহাজীবন লাভ কর।

নিবেদিতা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন—জ্ঞানোৎকর্ষের সেই বিস্ময়কর প্রয়াস—যা প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। জ্ঞান যোগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হয়েছিল কতভাবে, কত বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

এতএব জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তারই মধ্য দিয়ে পরাজ্ঞান আঁয়ত্ত কর।

এ যোগ সৃষ্টির প্রারম্ভ মুখে পুরুষোত্তম স্বয়ং বিবৃত করেছিলেন বিবস্বানের কাছে। বিবস্বান বলেছিলেন মনুকে, মনু থেকে ইক্ষাকু আর ইক্ষাকু থেকে বিশ্ব-জগৎ সে মহাজ্ঞানের অধিকার লাভ করেছিল।

ইদং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

এর শক্তি অপরিমেয়, প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এমন পবিত্র, এমন উজ্জ্বল বস্তু আর কিছু নেই।

সেজন্য, শৈশবকালেই সমিধ্‌পাণি হয়ে গুরুর নিকট উপস্থিত হও। প্রার্থনা কর দীক্ষা, প্রার্থনা কর শিক্ষা, প্রার্থনা কর উপনয়ন-সংস্কার। শ্রদ্ধাবান এবং সংযতচিত্ত হয়ে—সে প্রার্থনা তোমাকে নিবেদন করতে হবে।

তারপর তোমার বংশ-পরিচয়, তোমার 'হেরিডিটি' অনুসন্ধান করে তোমার অঙ্গ-লক্ষণে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে যদি আচার্য গ্রহণ করেন—তবেই তুমি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করলে। তোমার বিদ্যারম্ভ হল।—সে বিদ্যা জাগতিকও বটে, পরমার্থিকও বটে। পরমার্থিক ক্ষেত্রে তার প্রণালী—তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

প্রথমে গুরুমুখে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ কর, শ্রুতিপথে তাকে অন্তরের

মণিকোঠায় গ্রহণ কর। তারপর মনন কর, চিন্তা কর এবং ধ্যানে ও অভ্যাসে বাক্যের নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হও। যদি সে প্রয়াস ঐকান্তিক হয়, নিষ্ঠা অব্যভিচারিনী হয় তবে পরাজ্ঞান তুমি অবশ্য লাভ করবে।

আবার, জাগতিক শিক্ষার দিক দিয়েও প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালী নিবেদিতাকে প্রভূত পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল। গৃহস্থ-জীবন এবং সমাজ-জীবনের জন্য নানা কারিগরি এবং বাস্তব-শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল সে-যুগে।

শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কার্যসূচীর সঙ্গে সে ব্যবস্থার সঙ্গতি ছিল নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রথিত।

অতি-প্রত্যূষে, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা ছিল বিধি। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে বিদ্যার্থীকে প্রজ্জ্বলিত করতে হত অগ্নি—যজ্ঞের জন্যও বটে, গৃহকর্মের জন্যও বটে। সেজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহও বিদ্যার্থীর কর্ম-তালিকার অঙ্গীভূত ছিল। আলো এবং উত্তাপের উৎস অগ্নি ও সূর্য, জ্ঞানের প্রতীকরূপে বহুধা বন্দিত ছিলেন সে যুগে। ভালোমন্দ সংস্কারের লোহিত-শিখা অগ্নিতে 'স্বাহা' মন্ত্রে নিত্য আহুতি দিয়ে আত্মোপলব্ধির ক্ষুরধার পথে অগ্রসর হবার ছিল নির্দেশ।

তাছাড়া, গো-চারণ, গো-পালন, গো-দোহন প্রভৃতিও কারিগরি শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর ছিল ক্ষেত্র-কর্ষণ, ক্ষেত্র-রক্ষা প্রভৃতির গুরু দায়িত্ব। সে-যুগের গ্রামীণ-জীবনে প্রতি পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক একটি কাঠামো, একটি 'ইকনমিক্ ইউনিট্' নিদৃষ্ট ছিল। তিন একর পরিমিত ভূমি আর একটি দুগ্ধবতী সবলা গাভীই ছিল সেই একক বা ইউনিট্। তাকে রক্ষা করা এবং বর্ধিত করা ছাত্র জীবনের অন্যতম করণীয় বিষয় ছিল।

আশ্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিতভাবে ভিক্ষা সংগ্রহও একটি অবশ্য করণীয় বিষয় ছিল। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেক

ছাত্রকেই এ সব কর্তব্য পালন করতে হত। এতে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটত, আভিজাত্যের অহমিকা দূর হত, আর অন্তরে শুভ সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত হত।

এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রণালীর মূল কথা ছিল আচার্যের জীবন ধারার সঙ্গে নিজ ব্যষ্টি-জীবনকে যুক্ত করে দেওয়া এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, ও পরিচর্যায় তাঁর প্রসন্নতা অর্জন করা।…

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।—

এই ছিল পদ্ধতি, এই ছিল নির্দেশ।

এ নির্দেশ পুরুষের শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন প্রযুজ্য ছিল, স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিভাবে প্রযুজ্য ছিল কিনা—সেটা সঠিক জানা না গেলেও মনস্বিনী, বিদূষী নারীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না সে-যুগে।

উপনিষদ গ্রন্থাদিতে—পুরাণে, মহাকাব্যে মহীয়সী নারীর উল্লেখ রয়েছে একাধিক স্থানে, একাধিক প্রসঙ্গে। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ—এই দুই পর্যায়ে তাঁদের বিভক্ত করা হত। যাঁরা সন্ন্যাসিনী হবেন, বেদাধ্যয়নের অধিকার লাভ করবেন, তাঁরাই ব্রহ্মবাদিনী। আর যাঁরা শিক্ষা অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন—তাঁরাই সদ্যোবধূ।

আরও পরবর্তীকালে, বৌদ্ধ-যুগেও নারীশিক্ষার ধারা অবলুপ্ত হয়নি। সে যুগেও নারী-সমাজে বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হত প্রভূত পরিমাণে। শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা-পদ্ধতিও কতকাংশে অপরিবর্তিতই ছিল। ফলে, বৌদ্ধযুগের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীর অবদান উপেক্ষণীয় ছিল না। বৌদ্ধযুগের থেরিগাথা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী-গণেরই অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। ধম্মদীনা, কিসাগৌতমী, মহা-প্রজাপতি, বিশাখা প্রমুখ মনস্বিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর কীর্তিকথায় সে যুগের ধর্ম এবং সংস্কৃতিক্ষেত্র কম বিভাসিত ছিল না।

কিন্তু মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বকালে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার অনিবার্যতায় নারীশিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র ক্রমশঃ

সঙ্কুচিত হয়ে গেল। গৃহ ও সমাজের বহিঃপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে ক্রমে হিন্দুনারী অন্তঃপুরের আবেষ্টনীতে নিজকে আবদ্ধ করল। পর্দাপ্রথার অন্তরালে নিজকে লুক্কায়িত করল। সে এক মহা-বিপর্যয়ের সংকটময় যুগ এসেছিল ভারতবর্ষে। তখন শিক্ষা থেকে মর্যাদা রক্ষার সমস্যাই হিন্দুসমাজকে অধিক বিব্রত করে তুলেছিল।

নিজ বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক যুগে—অতীতের শিক্ষাধারার এই ঋজু-কুটিল ক্রম-বিবর্তনটি অনুধাবন করেছিলেন নিবেদিতা।

আর সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন এই সত্য যে সেই বিচিত্র ক্রম-বিবর্তনের পটভূমিতেই এদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের যে দাবী, আধুনিক যুগের যে আকাঙ্ক্ষা তাকেও পূর্ণ করতে হবে।

স্বামীজীর সঙ্গে এ সম্পর্কে মধ্যেই মধ্যেই নানা কথা হত। স্বভাবতই নিবেদিতা স্বামীজীর উপদেশ চাইতেন, নির্দেশ চাইতেন। কখনো কখনো স্বামীজীর মতামত নিয়ে বিশেষ ধরণের প্রশ্নও উত্থাপন করতেন নিবেদিতা।

কিন্তু প্রণালী সম্পর্কে, প্রাত্যহিক কার্যাবলী সম্পর্কে কোন অভিমত স্বামীজী দিতে চাইতেন না। সে বিষয়ে নিবেদিতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য তিনি অনুরোধ করতেন।

বলতেন,—তোমার নিজের মত করে কর, নিজের ইনিসিয়েটিভের অনুগামী হয়ে কর। সে দায়িত্ব তোমারই, আমার নয়।

তবে, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতীয় নারী বর্তমান কালে শিক্ষার কোন্ আদর্শটি গ্রহণ করবে, কোন্ লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবে সেটি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্ণয় করতে হবে সন্দেহ নাই।

স্বামীজীর নিজের মনের কাছেও তখন পর্যন্ত এটি একটি দুরূহ সমস্যার আকারে ছিল যার সমাধানসূত্র অনাবিষ্কৃত।

প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের একটি সুসম সামঞ্জস্য বিধান করে ভবিষ্যতের শিক্ষা-বর্ত্ম নির্ধারণ করতে হবে। ধর্মের শাশ্বত ভিত্তির

উপর বিজ্ঞানের নানা রসায়ন মিশিয়ে স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অতীত যুগের আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং জিজ্ঞাসা নষ্ট হয়েছে একালে। অথচ, এ-কালের উপযোগী কোন পন্থা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারানুসরণে আবিষ্কৃত হয়নি এখনো। ফলে, এক রুচি-বিকার যেন আমাদের পেয়ে বসেছে। এক অস্পষ্ট লক্ষ্যে আমাদের দ্বিধাজড়িত শিক্ষা-পরিকল্পনা একবার অগ্রসর হচ্ছে, আর একবার পিছিয়ে আসছে।

কত দীর্ঘ দিন, নিস্তব্ধ সন্ধ্যার কত দীর্ঘ প্রহর এ সমস্যার সমাধান-কল্পে স্বামীজী গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এককালে যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন।···

তারপর একদিন সহসা সে ধ্যান-তন্ময়তা থেকেই এ সমস্যার বিচিত্র সমাধান-সূত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সে আবিষ্কারের সাক্ষী ছিলেন নিবেদিতা, ফলপ্রার্থী ছিল এ-দেশের উত্তর-সমাজ।

স্বামীজী বলেছিলেন,—প্রাচীন যুগে এ দেশের গার্হস্থ্য জীবনে পঞ্চঋণ পরিশোধের উল্লেখ দেখা যায় প্রাত্যহিক পঞ্চযজ্ঞের মাধ্যমে।

দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ নামে সে ঋণ গুলি যেমন বিখ্যাত, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি নামে তেমনি পঞ্চযজ্ঞও বিখ্যাত।

এদের পশ্চাতে প্রভূত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এ যুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় সে তাৎপর্যগুলিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন—পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পুরুষগণের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা যেতে পারে। বীরপূজার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যেতে পারে।···

দেবদেবীর নানা মূর্তির, নানা পটের প্রচলন আছে আমাদের দেশে। সে গুলির মধ্য দিয়ে সুকৌশলে চিত্রবিদ্যা, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।···দেবদেবীর মন্দিরের

বেদীমূলে যে ঘট থাকে, যে ঊর্দ্ধ-শিখা প্রদীপ থাকে—সূক্ষ্ম-শিল্প শিক্ষার জন্য তারা অমূল্য উপাদান রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

বৈদিক যুগের যজ্ঞবেদীর শত বিচিত্র আয়তন ছিল, রূপ ছিল। আধুনিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাদেরও সার্থক প্রয়োগ হতে পারে।

নানা গৃহপালিত পশু-পক্ষীর যত্ন ও পরিপালন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্ভূক্ত হওয়া বিধেয়। কিন্তু সবার উপরে মানুষ।

নিবেদিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,—মানুষের কথা কখনো বিস্মৃত হয়ো না। ভবিষ্যতের ভারতীয় নারীর শিক্ষা পরিকল্পনায় দরিদ্র-সেবা, মানব-সেবা যেন সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে। 'Never forget humanity.'

আর, শিক্ষার পরিবেশন কার্যে ধর্মের জারক রস অবশ্য মিশ্রিত করতে হবে। কারণ, ধর্মই শিক্ষার মূল কথা, মর্ম কথা।…'Religion is the core of education.'…

তাই করেছিলেন নিবেদিতা। তপস্যা দিয়ে, সাধনা দিয়ে নিজ চিন্তা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে স্বামীজীর আশা ও স্বপ্নের সুকৌশল সংমিশ্রণে একটি সুন্দর 'শিক্ষা-দর্শন তিনি গ্রথিত করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে ভারতীয় নারীর যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এই কালে—অর্থাৎ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দিন থেকেই।

যে শিক্ষার বিষয়বস্তু দেশের মাটি থেকে সংগৃহীত, জাতির স্বকীয় ভাবধারা থেকে আহরিত, যার সকল সুযোগ-সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত, সকলের জন্য অবাধিত, যার নিয়ন্ত্রণাধিকারও জাতীয় মনীষার স্বাধিকারভুক্ত—নিবেদিতা তাকেই জাতীয়-শিক্ষা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে শিক্ষাদর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে তদীয় Hints on National Educatin in India-নামক গ্রন্থটিতে। পৃথিবীর বহু দেশেই তখন শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হয়েছে।

জেমসের প্র্যাগ্‌মাটিজমের অতি-বাস্তবতার ভিত্তিতে নূতন শিক্ষা-বিধির প্রবর্ত্তনায় অগ্রসর হয়েছেন মনস্বী জন ডিউই, তাঁর শিকাগোর পরীক্ষামূলক বিদ্যায়তনে। প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণতলে, অবারিত আলো-ছায়ায়, বন-বনানীর অমৃতরস-নির্ঝরতার মধ্যে সহজানন্দে সে শিক্ষা অগ্রসর হবে, বিকিরীত হবে। অথচ বাস্তব জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে নানা প্রয়োজনের অপরিহার্য যে সব তাগিদ আছে, তাদেরই মাপকাঠিতে হবে তার প্রকৃত মূল্যায়ন। অন্তহীন এ প্রণালী, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে অব্যাহত তার কার্যকারিতা।

ফ্রোবেলের শিক্ষাচিন্তা এবং শিক্ষাপদ্ধতিও তখন পাশ্চাত্যের শিক্ষাভূমিতে বহুল প্রভাব বিস্তার করেছে। মাদাম মন্তেসরির আবির্ভাব সূচিত হয়েছে শিশুশিক্ষার অনাবিষ্কৃত ভূমিতে। বাংলা-দেশের মাটিতেও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তখন প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণতলে, সপ্তপর্ণী ছায়ার নীচে নীচে নব জীবনের অজানিত পথে যাত্রা করতে চাইছে।

সুতরাং, বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতার কার্যারম্ভ যে একটি নূতন যুগের ব্রাহ্মমুহূর্তে শুরু হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। তবে তাঁর কর্মপ্রণালীর মধ্যে এবং তাঁর শিক্ষাদর্শনের অন্তরালে গত ও অনাগত যুগের ভাবধারা এবং কর্মধারার একটি সার্থক সমন্বয়ের প্রয়াস ছিল। ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিজ্ঞানের আধুনিক অবদান দিয়ে শিক্ষাসৌধ গড়ে তুলবার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা, যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক, ছিল। জৈনধর্মের অনুকৃতিতে নিবেদিতা যেন একথাটিই নানাভাবে প্রকাশ করতে চাইতেন—

'We should not only live to know, but know how to live.'

অথবা,—

'Education is all the preparedness that life brings us for all the functions that life demands of us'…

তাঁর সে স্বপ্ন ও চিন্তা, তাঁর সে আদর্শ ও কর্ম-প্রয়াস উত্তরকালে কতখানি সার্থক হয়েছিল, কতদূর সফলতা অর্জন করেছিল নারীশিক্ষার আধুনিক কালের ক্রমবিস্তারের ইতিহাসে তার অনুসন্ধান করতে হবে। যাঁরা নিবেদিতার বক্ষ-রক্তে-গঠিত বিদ্যায়তনটির শুচিস্নাত প্রাঙ্গণতল থেকে বিদ্যা ও কর্ম-শিক্ষার চন্দন তিলক ললাটে এঁকে সংসারের নানাক্ষেত্রে, নানাভাবে প্রবেশ করেছেন—তাঁদের জীবনেতিহাসের নিভৃত নিরালায় খুঁজে দেখতে হবে।...

আজ অবশ্য 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ের' বা 'নিবেদিতা মহাবিদ্যালয়ে'র নাম ও খ্যাতি বহু-শ্রুত, বহু-বিস্তৃত। কিন্তু কি আত্মত্যাগে, কি দুর্জয় সঙ্কল্প ও তপস্যায় দিনে দিনে, তিলে তিলে, এই বিদেশিনী নারী—শত প্রতিকূলতার মধ্যে, শত বাধাবিপত্তির মধ্যে সে বিদ্যায়তনের শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন—সেকথা যথাযথ উপলব্ধি করাও যেমন সহজ নয়, প্রকাশ করাও তেমনি সহজ নয়। দু'চারটি বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সে প্রতিকূলতার আংশিক চিত্র অঙ্কিত করা যায় মাত্র।...

বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিকযুগে যে বাধা নিবেদিতাকে সর্বাধিক-চিন্তিত করেছিল সেটি শিক্ষার্থীর একান্ত অভাব। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, যথারীতি তার কার্যারম্ভও হবে—কিন্তু কোথায় বিদ্যার্থী, কোথায় ছাত্রী?

স্বামীজী বলেছিলেন—ছাত্রী সংগ্রহ তোমাকেই করতে হবে।... অর্থসংগ্রহ? সেও তোমারই কর্তব্য। সকল বাধা-বিঘ্ন নিজ শক্তিতে অতিক্রম করে তোমার শিক্ষা-ব্রত তোমাকেই উদ্‌যাপিত করতে হবে। যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। পরাধীন, শিক্ষা-বঞ্চিত দেশে এছাড়া উপায় কি, পথ কি বল!

কাজেই, নিবেদিতাকেও সে-পন্থাই গ্রহণ করতে হল। রুদ্ধদ্বার পর্বতগাত্রে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করবার সঙ্কল্পই গ্রহণ করলেন তিনি।

বারে বারে দীপ প্রজ্জ্বলিত করলেও

'হয়ত—বাতি জ্বলবে না।'

কিন্তু, 'তা বলে, ভাবনা করা চলবে না।'—এই হল তাঁর সঙ্কল্প, তাঁর মটো।

যদি বিদ্যার্থী তাঁর কাছে না-ই আসে, তাঁর বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুকই হয় তবে যাবেন, তিনিই এগিয়ে যাবেন। তাদের দুয়ারে দুয়ারে, তাদের গৃহে গৃহে প্রার্থনা করবেন সহযোগিতা, জ্ঞাপন করবেন বিদ্যালয়ে যোগদানের ঐকান্তিক আবেদন। সেও এক করুণ, বিচিত্র ইতিহাস।

এমন ঘটনা বহু আছে যখন নিবেদিতা কোন গৃহস্বামীর কাছে বিনম্র আবেদন জানিয়েছেন তদীয় কন্যাটিকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবার জন্য। কিন্তু গৃহস্বামী সঙ্গে সঙ্গে অসম্মতি জানিয়েছেন। প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে তাঁর কন্যা বা কুলবধূ বিদ্যালয়ে যাবে প্রতিদিন, এ সম্ভব নয়। কারণ, সমাজ-বিধানে বা কুলধর্মে সেটি নিষিদ্ধ, সেটি অবাঞ্ছিত। নিবেদিতা ধীরে ধীরে উত্তর করেছেন—'কিন্তু আপনাদেরই সমাজের বহু কন্যা ও বধূ তো প্রতিদিন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে পায়ে হেটেই গঙ্গাস্নানে যায়, দেবমন্দির দর্শন করতে যায়। তবে বিদ্যালয়ে যেতে আপত্তি কেন? গঙ্গাস্নানে বা দেবমন্দির দর্শনে দেহ মন পবিত্র হয়, নির্মল হয়। শিক্ষালাভেও তো তাই হয়,—তবে শিক্ষালাভের জন্য রাজপথ দিয়ে যাতায়াত অবাঞ্ছিত হবে কেন?···

একাধিক দিন এরূপ যুক্তি বিচারের পর হয়ত গৃহস্বামী শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু তাও অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে।

কখনো উঠেছে জাতি-বিচারের বাধা, ছুৎ-মার্গীর রুচি বিকার। শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান নারীর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিশুদ্ধতা থাকবে না, শুচিতা থাকবে না—এই আপত্তি।

কত ধৈর্য ও আত্মসংযমের সঙ্গে সে-সব অসম্মানজনক আপত্তি,

সে-সব কুশিক্ষা ও অশিক্ষা-প্রসূত বিরোধিতা তিনি খণ্ডন করেছেন, অতিক্রম করেছেন। আজ সে-সব দিনগুলির কথা চিন্তা করলেও লজ্জার অবধি থাকে না, গ্লানি এবং ধিক্কারে চিত্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, কি নির্মম ব্যঙ্গ ছিল আমাদের সঙ্গে।

সেদিন দেশ পরশাসিত ছিল। ইংরাজ ছিল আমাদের প্রভু, আমাদের সব কিছুর নিয়ামক। নিবেদিতাও ইংরাজজাতি সম্ভূতা ছিলেন, তাঁর ধমনীতেও উষ্ণ কেল্টিক রক্তই প্রবাহিত ছিল। শুধু গুরুভক্তির দায়ে ও আনুগত্যে ভারতবর্ষকে আপন বলে গ্রহণ করে তার সেবায় এবং শিক্ষায় তিনি স্বেচ্ছায় নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন, নিঃশেষে বলি দিয়েছিলেন। আর সেজন্যই আমাদের কাছে, আমাদের অর্গলবদ্ধ দুয়ারে দুয়ারে তাঁর করুণ আবেদন ছিল, আকুতি ছিল। আর তারই প্রতিদানে আমাদের কী রূঢ় ব্যবহার, কী উদ্ধত প্রত্যাখ্যান। অথচ আজ? স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বথা পরিবর্তিত আজকের পটভূমিতে?···

আজ দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে অভিজাত এবং উচ্চবর্ণের পরিবার সমূহে। খ্রীষ্টান মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাও আজ, এক পশ্চিমবঙ্গেই কত! আর সেই সব বিদ্যায়তনের ব্যয় বাহুল্যও মাত্রাতিরিক্ত। তথাপি, সে সব বিদ্যায়তনে পুত্র কন্যাদের পাঠাবার জন্য, যে কোন প্রকারে ভর্তি করাবার জন্য উচ্চবর্ণের ও উচ্চ বিত্তাধিকারীদের কী অবিশ্বাস্য ব্যাকুলতা, কী ভিক্ষুক-সুলভ হ্যাংলামি! সবটা মিলিয়ে যেন এক বিচিত্র ধিক্কারজনক পরিস্থিতি!

তথাপি, এটিই আজকের অনস্বীকার্য বাস্তব অবস্থা। আর নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের যাত্রারম্ভের যে কথা বললাম সেটি ছিল সে দিনের প্রকৃত পরিস্থিতি।···

এ-ছাড়া আরও ছিল। উদাহরণ হিসাবে তেমন একটি ঘটনার কথাও বলছি।

নিবেদিতার ব্যক্তিগত গৃহস্থালীর কার্যাদির জন্য বহু চেষ্টায় একজন বৃদ্ধ পরিচারিকা সেদিন সংগৃহীত হয়েছিল। অন্য কোন স্থানীয় পরিচারিকা তাঁর কাজ গ্রহণ করতেই স্বীকৃত হয়নি। বৃদ্ধা যে স্বীকৃত হয়েছিল সেও যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে এবং শর্তাধীনভাবে। তার শর্ত এই ছিল যে নিবেদিতা কখনো রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করবেন না। রান্নাঘরের কোন তৈজসপত্র স্পর্শ করবেন না। নিবেদিতাকে তাতেই সম্মত হতে হয়েছিল। তথাপি, মধ্যে মধ্যেই এক একটি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হত, বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হত।

একদিন অপরাহ্নে, সেদিন খানিকটা অবসর ছিল নিবেদিতার, নিজেই চা তৈরী করে নেবেন মনে করে পরিচারিকার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গরম জল চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু চা তৈরী করতে গিয়ে দেখলেন যে গরমজল আরও খানিকটা প্রয়োজন। সেজন্য হাতের বাটিটি বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে খানিকটা জল ঢেলে দিতে অনুরোধ করলেন।

সে অনুরোধে বৃদ্ধা যেন এককালে অভিভূত হয়ে গেল এবং মুহূর্তে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হল। তারপর, দু'তিন মিনিট পরে যখন সে ফিরে এল তখন দেখা গেল সে সম্পূর্ণ সিক্ত-বসন। দু'তিন ঘড়া জল সর্বাঙ্গে ঢেলে, প্রায় স্নান করে, নিবেদিতার ছোঁয়া জলের বাটি ধরবার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

নিবেদিতা প্রথমটা বুঝতেই পারেন নি ব্যাপারটি। কিন্তু পরে পেরেছেন এবং অত্যন্ত সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেছেন,—কোন অভিযোগও নেই, কোন ক্ষোভও নেই। দেশাচার ও লোকাচারের সংস্কার যে অতি দৃঢ়মূল, রক্তধারার মধ্যে বংশানুক্রমে যে সে সংস্কারের বীজ লুকিয়ে থাকে—এ তত্ত্বটিই বরং তিনি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, সব দেশে, সব সমাজেই কোন-না-কোন ভাবে এদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তেমন মানুষ সর্বকালেই দুর্লভ যিনি এসব

সংস্কার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের উপরই কোন কাজের সমর্থন অথবা বিরূপতা নির্ভর করে। এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে-কাজ অত্যন্ত দূষণীয় বা বেদনাদায়ক মনে হয় অপর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে তাকেই সহজভাবে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা ঘটে না।

অতএব, হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের নানা অর্থহীন ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার তাঁকে খুব বেশী স্পর্শ করত না, ব্যথা দিতে পারত না। বরং এ সমাজকে আরও নিবিড়ভাবে জানবার, একান্তভাবে গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠত। আব তার ফলে এই হত যে এ দেশের প্রত্যেকটি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, শত বাধা-নিষেধের অন্তরালে কোন যুক্তি-সম্মত কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কি না সেটি আবিষ্কার করতেই সচেষ্ট হতেন নিবেদিতা। লোকাচারের গোঁড়ামি, বাহ্যতঃ যত উৎকট বলেই প্রতিভাত হোক, তার পশ্চাতেও যে একটি বহুযুগ-আশ্রিত অপরিহার্য-প্রায় সংস্কার বোধ কাজ করে সেটি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতেন।

নিঃসন্দেহে সে এক আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা,—অশেষ তপস্যার ফলে ক্বচিৎ কোন ভাগ্যবান সাধকের পক্ষে তেমন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ সম্ভব হয়ে থাকে।

শ্রীমা বলতেন, যদি শান্তি পেতে চাও, আনন্দে থাকতে চাও তবে দোষদৃষ্টি পরিহার কর। অথবা, যদি দেখতেই হয় তবে দোষ দেখ নিজের, আর গুণ দেখ অপরের।—

সেই দুর্লভ দর্শনশক্তিই যেন এইকালে গুরুর অশেষ কৃপায় ধীরে ধীরে নিবেদিতার মধ্যে সঞ্জাত হতে শুরু করেছিল।

আরও একটি সক্রিয় প্রভাব অবশ্য ছিল অন্তরালে। সেটি এই,…

বহু-বৈশিষ্ট্যে-সমৃদ্ধ বিবেকানন্দ চরিত্রের অন্যতম একটি বিশিষ্টতা এই ছিল যে তিনি ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের সন্ধান পেতেন, দুর্বলের মধ্যেও সবলের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। আর সেই হেতু, তাঁর

সান্নিধ্যে ও উদ্দীপনায় অতি সাধারণও অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হত, অক্ষম জনও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তিমানের মত কাজ করত। নিবেদিতার সদা-জাগ্রত দৃষ্টিতে সে বৈশিষ্ট্য মুহুর্মুহুঃ ধরা পড়ত। সবিস্ময়ে তিনি দেখতে পেতেন—

'He (Swamiji) made all who were near him appear great. In his presence one saw and lived at its highest,...and even their faults and failings, if one realised them, would seem to be justified and accounted for.'

কথিত আছে ইতিহাস-খ্যাত দুর্জয় সম্রাট নেপোলিয়ানও অনুরূপ শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাসে সে কথার উল্লেখ আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত দুরূহ কাজও নিবেদিতার পক্ষে ক্রমশঃ সহজ হয়েছিল। তাছাড়া নিবেদিতার বিচার পদ্ধতিও কোনদিন মামুলি ধরণের ছিল না। স্বভাবগত ভাবেই যেন তিনি দেখতে পেতেন —সেই অসংখ্য স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ পরম্পরায় সমাবেশ যা মানুষের প্রতি কার্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে, উপলব্ধি করতে পারতেন এই বিশেষ তত্ত্বটি যে এক-একটি ব্যষ্টি-জীবন সমষ্টি-জীবনেরই খণ্ড-পরিমাণ। সেই হেতু, জাতি বিচারের অতি-উৎকট কার্যকলাপও তাঁর কাছে এককালে অর্থহীন মনে হত না, অস্বাভাবিক বলে বোধ হত না। উত্তরকালে নরওয়ের সমুদ্রোপকূলে এক নিভৃত কুটীরে বসে এ সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেছিলেন—Web of Indian life নামক তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থটিতে।

তাঁর মনে হত এটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘকালের পরাধীনতা আর সামাজিক অবরুদ্ধতায় এ ছাড়া অন্যরূপ মনোভাব গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর সেজন্য সমগ্র বাগবাজার পল্লীটিকে একান্ত আপন বলে অতি সহজেই তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং সে পল্লীর প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে একটি অদৃশ্য যোগাযোগে নিজ ব্যক্তিগত জীবনটিকেও

আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মমত্ববোধ এবং ঔৎসুক্য দুই-ই ছিল প্রচুর।

কখনো অতিপ্রত্যুষে, কখনো অলস গোধূলি-সন্ধ্যায় সতের নম্বর বোসপাড়া লেনের অপরিসর কক্ষের গবাক্ষের কাছটিতে তিনি বসে থাকতেন—শুধু গঙ্গা-স্নানার্থীদের শোভাযাত্রাটি দেখবার জন্য, আর সেই চিরন্তন শোভাযাত্রার পশ্চাতে ভারতীয় সমাজ-জীবনের যে মর্মকথা নিহিত—সেইটি উপলব্ধি করবার জন্য।

সে সব মমতা-সজল মুহূর্তগুলিতে কখনও মনে হত এদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসের কথা,—তার বিগত দিনের ঐশ্বর্য সমারোহ, তার সহজ, সরল আত্ম-সমাহিত জীবনধারার কথা যে কথা এদেশের মানুষ আজ আর বিশেষ চিন্তা করে না, কোন মূল্যবান উত্তরাধিকার বলে স্বীকারও করতে চায় না।

এর মধ্যে, কখনো কখনো, আবার নিজের বিদ্যালয়ের কথাও মনে উঠত। সে বিদ্যালয়ের বর্তমান সমস্যার কথা এবং তার ভাবীকালের বহু-বিশ্রুত নাম-খ্যাতির কথা—দুই-ই যেন ছায়াচিত্রের মত তখন দৃষ্টির সম্মুখে উদিত হত, আবার বিলীন হয়ে যেত।

ছাত্রী-সমস্যা, অর্থ-সঙ্কট, কর্মীর অভাব, এ সব তো ছিলই। কিন্তু তার চাইতেও বৃহত্তর এবং দুরূহতর সমস্যাগুলিই এই সব বিশেষ মুহূর্তে তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিত, চিন্তান্বিত করে তুলত।

নিবেদিতা তখন ভাবতেন—জাতির ব্যাপক জড়তার কথা, মহা আলস্যের কথা। আর তার চরম আত্মবিস্মৃতির কথা। হায়, যে জাতি চিন্তায় ও ধ্যানে একদিন মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানৈশ্বর্য আবিষ্কার করেছিল, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করেছিল, সৃষ্টি করেছিল অনবদ্য সাহিত্য ও মহাকাব্য,—

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুসী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বৃত্তাশ্চ বেদাঃ।

বায়ু প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা—

তিনিই বিশ্বচরাচরে যাবতীয় প্রাণীর অন্তরাত্মা—যাঁর মস্তিষ্ক হল অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণ, যাঁর বাক্য হল বেদ, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব আর পদদ্বয় পৃথিবী,—

এই সব বিরাট অক্ষয় মহা-প্রকাশ যে জাতির অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল, বিশ্ব-যন্ত্রের লয়-সঙ্গতির মহাতান কান পেতে যে শুনতে পেয়েছিল—আজ তারই এমন নিঃশেষ আত্মবিস্মৃতি, নিজ অতীত ঐতিহ্য ও সভ্যতায় এমন অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও অশ্রদ্ধা—নিবেদিতা যেন ধারণাই করতে পারতেন না।

বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও ঐ ভাবেরই প্রতিফলন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ত। নিয়ত তিনি দেখতেন—ঔৎসুক্যহীন, কৌতূহলহীন নিষ্প্রাণ চক্ষুগুলি—কোন কিছুতেই বিস্ময় প্রকাশ করে না, একাগ্র হয়ে ওঠে না। কোন উৎসবানুষ্ঠানে, কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপেও তাদের মধ্যে প্রাণ-প্রাচুর্যের লক্ষণ দেখা যায় না। সে অভিজ্ঞতাও নিবেদিতার পক্ষে নিরতিশয় বেদনার বিষয় ছিল। সে বেদনা যেন ভাষার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করতেও পারতেন না।

অতি তুচ্ছ জিনিষেও এ আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ দেখা যেত।… 'লাইন' একটি ইংরাজী শব্দ। মুখে মুখে বাংলা শব্দেরই মত প্রচলিত হয়েছে—অন্য বহু বিদেশী শব্দের মত। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যেদিন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ঐ বিদেশী শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বলতে অসমর্থ হয়েছিল সেদিন নিবেদিতার ক্ষোভের যেন আর পরিসীমা ছিল না। সেদিন অত্যন্ত হতাশ হয়েই তিনি বলেছিলেন—'হায়, তোমরা নিজেদের মাতৃভাষাটি পর্যন্ত ভুলে গেছ। একি ভয়াবহ পরিণতি!'

আবার পরমুহূর্তেই যখন শ্রেণীর এক প্রান্ত থেকে হঠাৎ একটি বালিকা 'রেখা' শব্দটি উচ্চারণ করে উঠেছিল তখনই বা নিবেদিতার

কি আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কি পরিতৃপ্তি!

সকলকে উৎসাহ দিয়ে সে শব্দটি কয়েকবার নিজেই পরম মমতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন,—'রেখা, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ—রেখা, রেখা!'

আবার কখনো এমন হয়েছে যে পাঠ দান কালে বাহ্যতঃ একটি সামান্য অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে অসামান্যতা অনেক সময় লুকিয়ে থাকে সেটিকে অতি মমতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন, অথবা একটি সাধারণ, সদা-ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যে গূঢ় অর্থ নিহিত তাকে সর্বপ্রযত্নে উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু কোথায় সে ঔৎসুক্য, কোথায় সে আগ্রহোচ্ছলতা? নেই, সে সব বৃত্তি যেন আর বেঁচেই নেই। আছে শুধু এক অদ্ভুত ক্যালাস্‌নেস্‌, যা নিবেদিতাকে ব্যথিত করত, মর্মাহত করে দিত।

এমনি আরও দু'একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটি বলা যেতে পারে।...

আমাদের গৃহকর্মের জন্য যে চাকরানী আমরা নিযুক্ত করি —তাকে সাধারণত 'ঝি' শব্দে অভিহিত করা হয় আমাদের দেশে।...

একদিন এই সম্বোধনটিই নিবেদিতাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল। হিন্দুর পারিবারিক ব্যবস্থার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য যেন ঐ শব্দটির মধ্যে সহসা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। হিন্দু-পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বমহিমায় ও সর্বকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিতা থাকেন পরিবারের গৃহিণী। অন্নপূর্ণারূপে তিনিই পরিবারের মা, তিনিই সকলের সর্বংসহা ধাত্রীদেবতা। পূজনীয় ব্যক্তিবর্গই হোন, আর স্নেহভাজন কনিষ্ঠগণই হোন—তাঁরই প্রীতি ও যত্নে সকলে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত। তাঁকে ঘিরেই পরিবারের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুষ্ঠু জীবন-যাপন। উৎসবানুষ্ঠান, লোক-লৌকিকতা সেও তাঁরই স্নেহের অকৃপণ অবদান।

সকলের সর্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তবেই তাঁর নিজের কথা। সকলের পূর্বে রজনীর শেষযামে তাঁর শয্যাত্যাগ, আর সকলের শেষে তাঁর আহার, সকলের পর তাঁর শয্যাগ্রহণ।

গৃহের ভৃত্য বা পরিচারিকা—তারাও তাঁর পুত্র, তাঁর কন্যা।

নিজ পুত্র-কন্যারই মত তারাও তাঁর স্নেহ-যত্নের অধিকার দাবী করে। সেই হেতু হিন্দুসমাজে পরিচারিকা—'ঝি' বা 'কন্যা' শব্দে অভিহিতা।...

কি সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা, কি সহজ সাম্যবোধ এই মধুর সম্বোধনের অন্তরালে অনুস্যূত!...

'গোধূলি' আর একটি বিচিত্র শব্দ—বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিবেদিতা বলতেন—'cowdust'.

এ-শব্দটির তাৎপর্য এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনাও নিবেদিতাকে মুগ্ধ করত। তাঁর রচনাবলীর একাধিক স্থানে এ-শব্দটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। হিন্দু সংস্কৃতির একটি সর্বাবয়ব ধারা-চিত্র যেন ঐ শব্দটির মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। একদিন বিদ্যালয়ে প্রসঙ্গক্রমে এই শব্দটি তার আলোচ্য বিষয় হয়েছিল।...

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ,—দেখতে পাবে স্মরণাতীতকাল থেকেই এদেশে গো-ধন বিশেষ সম্পদরূপে গৃহীত। গো-দুগ্ধেই শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধের তুষ্টি সাধিত হয়ে থাকে। বৃষের সহায়তায় শস্যোৎপাদন, বৃষ-বাহিত যানে দীর্ঘপথ পরিক্রমা। পয়স্বিনী গাভী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী। সে নন্দিনী, সে বরপ্রদা কামধেনু।...

অপরাহ্ণে সেই গৃহ-সম্পদ যূথবদ্ধ হয়ে গৃহে ফিরে আসে, দূর গোচারণ ভূমি থেকে! গো-ক্ষুর-উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মধ্যে অস্তাচলশায়ী সূর্য-কিরণ অদ্ভুত মায়াজাল রচনা করে। পল্লী-বাংলার সে অনবদ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে এদেশের সকল কমনীয়তা, সকল ধ্যান-উন্মুখতা যেন বিজড়িত। নিবেদিতার জিজ্ঞাসু মনের কাছে এদের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর! তাই এদের বিশ্লেষণে তিনি যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁর সে উদ্দীপনা, সে এপ্রিসিয়েসন্ বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত,—অনুরূপ কোন প্রেরণা বা জিজ্ঞাসা জাগ্রত করতে না পেরে। তাঁর দুঃখ ছিল সেইখানে, কঠিনতম সমস্যাও ছিল সেইখানে।...

জাতীয় মর্যাদা বোধের একান্ত বিলুপ্তি থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু কি আছে? সেই জন্য, তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কেতাবী শিক্ষা আর কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি, আত্মসম্বিৎ জাগ্রত করবার শিক্ষাও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।...

নিজ মহান গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করেই সে বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিটি তিনি রচনা করেছিলেন। প্রাচীনযুগের শত বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী ও মহাকাব্যের নানা চরিতাখ্যায়িকা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সরস গল্পের আসর তিনি রচনা করতেন। ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ দান প্রসঙ্গে অতি সুনিপুণ কৌশলে সেই সব গল্পের অবতারণা হত। মীরা বাঈয়ের কাহিনী বলতেন, অহল্যা বাঈয়ের কাহিনী বলতেন। বলতেন, ছত্রপতির অপরাজেয় জীবনাখ্যায়িকা। এ সবের বিস্তারিত আলোচনা পরেও আমরা করব।

সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান, ভীষ্মের চরিতকথা, কর্ণের ভাগ্যহত কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য জীবন—এক একদিন এক একটি প্রসঙ্গ সুকৌশলে উত্থাপিত হত। পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গেও একদিকে যেমন তাদের সম্বন্ধ থাকত অন্যদিকে দেশপ্রেমের গৌরবে আর জাতীয় ঐতিহ্যের অনুরাগেও তেমনি তারা জীবন্ত হয়ে দেখা দিত।

এমনিভাবে দিনে দিনে, নিজ ক্ষুদ্র বিদ্যায়তনটিকে একটি আদর্শ নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন।

দেবী সারদামণির পুণ্য জীবনটিকে কেন্দ্রে রেখে সে বিদ্যায়তনে প্রকৃত ধর্মভাব জাগ্রত করতে হবে, জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা এবং মমত্ববোধ জন্মাবে, অথচ এ-যুগের যা প্রয়োজন, এ-কালের যা চাহিদা—তদুপযোগী ব্যবস্থাও অবশ্য থাকবে—এই ছিল নিবেদিতার ড্রিম, নিবেদিতার স্বপ্ন।...

অন্যদিকে বিদ্যালয়ের যেটি স্থূল বাস্তব দিক—তার ছাত্রী,

প্রয়োজনীয় গৃহ-উপকরণ, প্রয়োজনীয় অর্থ সে সবের জন্যও তাকেই সচেষ্ট হতে হবে।

বাগবাজারে যে গৃহটিতে বিদ্যালয়ের সূত্রপাত সেটি নিতান্তই অপরিসর ছিল। দ্বিতলের যে কক্ষটিতে নিবেদিতা বাস করতেন সেটিও ছিল অত্যন্ত নিচু, অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন।

শীতের দেশের মানুষ নিবেদিতা,—বাংলার প্রচণ্ড জলার্দ্র গ্রীষ্মে ঐ ছোট ঘরটিতে বসে বিদ্যালয়ের অর্থাগমের জন্য এক মনে তাঁকে গ্রন্থ রচনা করতে হত। বামহস্তে থাকত একটি ছোট তালপাতার হাতপাখা আর দক্ষিণ হস্তে থাকত লেখনী। গ্রীষ্মের খরতাপে শ্বেতশুভ্র তনুখানি রক্তিমবর্ণ ধারণ করত, কপালে জমত বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটি ছোট রুমাল দিয়ে সে ঘাম মুছে নিচ্ছেন আর মাথার দুঃসহ যন্ত্রণা নিবারণের জন্য হাত দিয়ে মধ্যে মধ্যে মাথা চেপে ধরছেন আর লিখছেন,—নিবেদিতার এ মূর্তি তদীয় বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক যুগের সংগ্রাম-সঙ্কুল দিনগুলির সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত হয়ে আছে। একটির কথা চিন্তা করলেই আর একটির চিত্র কল্পনা-মানসে প্রতিভাসিত হয়ে উঠে।

সে নিরলস ঐকান্তিক তপস্যার তুলনা হয় না। নারী-শিক্ষার প্রসার ও নারীশক্তির উদ্বোধন কল্পে এ দেশের কয়জন নারী বা পুরুষ অনুরূপ নিষ্ঠাপূত তপশ্চর্যা করেছেন আমরা জানি না। কিন্তু এ-কথা জানি যে নিবেদিতার তপস্যা অতি ভাস্বর ছিল। এবং সেই হেতু তাঁর কঠোর আত্মত্যাগও বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে।···

তবে, পরবর্তীকালে এ তপস্যা ও আত্মত্যাগের অংশভাগী অবশ্য হয়েছিলেন আরও দু'জন মনস্বিনী নারী,—একজন ভারতীয়, অপর-জন অভারতীয়। বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিকথায়, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাহিনীতে, তাদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

অনেকটা পরবর্তী কালের ঘটনা হলেও প্রাসঙ্গিক হিসাবে তাঁদের উভয়েরই নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় একান্ত প্রীতির সঙ্গে এখানেই আমরা উল্লেখ করে নিচ্ছি।...

যিনি অভারতীয়,—তিনিই ভগ্নী ক্রিশ্চিন নামে এদেশে সুপরিচিতা হয়েছিলেন উত্তরকালে। আর যিনি ভারতীয়—তিনি কল্যাণীয়া সুধীরা, 'ভারতের সাধনার' লেখক বহুখ্যাত স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কনিষ্ঠ সহোদরা।

ভগ্নী ক্রিশ্চিনের পূর্বনাম ক্রিশ্চিয়ানা গ্রীনস্‌টাইডেল। জার্মানীর অন্তর্গত ন্যূনবার্গে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বয়সের বিচারে তিনি নিবেদিতার জ্যেষ্ঠা ছিলেন। অতি শৈশব-কালে, মাত্র তিন বৎসর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে তাঁকে আমেরিকা চলে আসতে হয়েছিল। সেই থেকে ডেট্রয়েট সহরে তাঁদের বসবাস। ক্রিশ্চিনের বয়স যখন সতের—তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এবং সেই দুর্দিনের অন্ধকারেই—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে—স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন।

স্বামীজী তখন সহস্র দ্বীপোদ্যানের নির্জন বাটীতে অতি উচ্চ এক ভাবজীবন যাপন করছেন। সেখানেই, একদিন ধারামুখর এক অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রিতে স্বামীজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হয়েছিলেন ক্রিশ্চিন।

স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন—'আজ যদি ভগবান ঈশামসি জীবিত থাকতেন তবে যে মনোভাব নিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে আমরা উপনীত হতাম, উপদেশ লাভের জন্য, আশীর্বাদ লাভের জন্য, —ঠিক তেমন মনোভাব নিয়েই আজ আপনার পাদপ্রান্তে আমরা উপনীত হয়েছি।'

—'শুধু আমার যদি যীশুখ্রীষ্টের মত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার শক্তি থাকত'—উত্তর দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ক্রিশ্চিনের শুচি-স্নিগ্ধ জীবনটি স্বামীজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট

করেছিল প্রথম পরিচয়ের কাল থেকেই। বাংলা দেশের কাজের জন্য তাকে লাভ করবার কথাও সেই কালেই বলেছিলেন তিনি।

নিবেদিতার সঙ্গে ক্রিশ্চিনের প্রথম পরিচয় ঘটে ইংলণ্ডে। সে সময় নিবেদিতার কর্ম পরিকল্পনার বিষয় অবগত হয়ে আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এই গূঢ় সঙ্কল্পটিও গ্রহণ করেছিলেন যে সংসারের দায়-দায়িত্ব উদ্‌যাপিত করে,—ভারতবর্ষে যাবেন এবং নিবেদিতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভারতের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করে ধন্য হবেন। ঘটনার অনিবার্যতায় নিবেদিতা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বৎসর পরে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্গদেশে। তখনো স্বামীজী জীবিত। সুতরাং ক্রিশ্চিনের ভারতাগমনে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।···

ভগ্নী ক্রিশ্চিন অতি নম্র ও মৃদু স্বভাবের নারী ছিলেন। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে তাঁর চিত্তভূমিটি সরস ছিল, সমৃদ্ধ ছিল। অখণ্ড বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা নিয়ে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সেজন্য, একদা স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন ঃ

'তুমি মহৎ—এ আমি জানি। আর জানি বলেই তোমার চরিত্রে আমার অখণ্ড বিশ্বাস রয়েছে। অন্য বহু বিষয়ে আমার চিন্তা থাকলেও—তোমার সম্পর্কে আমি নিঃসংশয়।'

নিবেদিতার সহকর্মীরূপে বিদ্যালয়ের কার্যে যোগ দিয়ে ভগিনী ক্রিশ্চিন জননীর যত্ন ও পরিচর্যায় তাকে শৈশবের অক্ষমতা থেকে পৌগণ্ড পর্যায়ে পোঁছে দিয়েছিলেন।

পরে অবশ্য নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের কার্য পরিত্যাগ করে অন্য একটি বিদ্যালয়ের কাজে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তথাপি, নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের সংগঠনে তাঁর যে অবদান সেটি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, স্বামীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর, অনুরাগ ছিল অকপট।

নিজ অনবদ্য স্মৃতি-কথায়—শুধু যে স্বামীজীর মহাজীবনটিকেই ভূয়োভূয়ঃ তিনি অভিনন্দিত করেছেন তাই নয়,—পরন্তু, নিজ অন্তর জীবনের একটি কমনীয় রূপও সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি নিপুণ চিত্রে উদ্ঘাটিত করেছেন।—

'Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived on this earth at the same time and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet.'—এই তাঁর একটি অবিস্মরণীয় উক্তি ছিল।

* * *

আর অন্য যে ভারতীয় নারী, তিনি স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কনিষ্ঠ সহোদরা সুধীরা দেবী, সে-কথা পূর্বে বলেছি। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল দেবব্রত, দেবব্রত বসু। যৌবনের প্রারম্ভে রাজনৈতিক বিপ্লবীরূপে তিনি রাজবন্দী হয়েছিলেন। পরে কারামুক্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান করে সন্ন্যাসী হন।

সুধীরা দেবীর জীবনে এই অগ্রজ সহোদরের চরিত্র অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মচারিণীরূপে সুধীরার জীবন-যাপন এবং পরে নিবেদিতা-বিদ্যালয়ে নিবেদিতার সহকারিণী-রূপে যোগদান।

উত্তরকালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন নিবেদিতা। অবশ্য এসবই অনেক পরবর্তী-কালের ঘটনা। কারণ, সন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী সুধীরা বিদ্যালয়ের কার্যে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন।

তবে, এর উত্তর-সম্প্রসারণের যুগে—সুধীরা দেবীর নেতৃত্ব এবং কর্মপ্রয়াস বিশেষ মূল্যবান ছিল বলেই—এ প্রসঙ্গে তাঁর কথাও এখানেই আমরা উল্লেখ করে নিলাম।…

অন্যথা নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের অতি-শৈশবে নিবেদিতা ছিলেন একা, একেবারেই একা। বিদ্যালয়ের যত দায়-দায়িত্ব সর্বাংশে তাঁরই একক দায়িত্ব ছিল।

আবার, একাল থেকেই, শুধু মাত্র ঐ বিদ্যায়তনের অপরিসর ক্ষেত্রেই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা আবদ্ধ ছিল না। বাংলার বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রে, রাজনীতি ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে নানা ভাবে তিনি নিজকে সংযুক্ত করতে শুরু করেছিলেন এইকালেই। এবং এ-কালেই কলিকাতার প্লেগ মহামারীতে তাঁর অদ্ভুত সেবাকার্য সর্বজনের সশ্রদ্ধ এবং সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তখনকার দিনের তন্দ্রাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ—সে ভয়াবহ মহাব্যাধির সঙ্গে এ বিদেশিনী নারীর নির্ভীক ও অক্লান্ত সংগ্রাম দেখে যেন আত্মধিক্কারে অকস্মাৎ সজাগ হয়ে উঠেছিল। সেকথা ইতিপূর্বে সবিস্তারে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি।

বস্তুত, বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে প্রেমে ও প্রীতিতে তিনি যেন ধীরে-ধীরে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন এই কালে। ফলে, তাদের সুখ-দুঃখের ওঠা-নামা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন—সবই যেন নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল।

মনে হয়, নিজ গুরুর মানসজীবনে এই ভারত-প্রেমের যে সুগভীর প্রকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অনুভব করেছিলেন প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাদের দ্বারা তাঁর নিজের চিন্তা-জীবনও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। প্রাথমিক স্তরে সে পরিবর্তন জ্ঞাতসারে হয়নি, সহজ মসৃণ পথেও আসেনি। পরন্তু সংগ্রামের দুর্গম বন্ধুর পথে শনৈঃ শনৈঃ তারা নিবেদিতার অন্তর-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল—সেকথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তীকালে, আবার একদিন, গুরুর ঐ অসামান্য দেশ-প্রেম আর এক মহাসঙ্কট আনয়ন করেছিল

নিবেদিতার জীবনে। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরবর্তী অধ্যায়ে সে বেদনাময় কাহিনীর কথা যথাসাধ্য আমরা বিবৃত করব।...

এখানে বাংলার জন-জীবনের প্রতি নিবেদিতার অদ্ভুত মমত্ব-বোধের যে কথা বলছিলাম তারই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।...

একদিন, তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে। রাত্রির প্রথম প্রহরে তখনকার দিনের বাগবাজারের পল্লীপথ প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। ঘরে ঘরে জ্বলছে মৃদু তৈল প্রদীপ।—নৈশ আকাশটি নির্মেঘ ও প্রশান্ত। নিজ কক্ষের বাতায়নের পাশটিতে নিবেদিতা অনেকক্ষণ একাকী বসেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কক্ষের মধ্যে আহারের ব্যবস্থা করতে শুরু করেছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ গলির অপর পার্শ্বের ছোট একটি খোলার ঘর থেকে এক আর্ত চীৎকার ধ্বনিত হল, নিবেদিতা মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠলেন। কান পেতে দ্বিতীয়বার সে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করলেন। তারপর দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন সেই আর্তনাদ লক্ষ্য করে। গৃহটি দূরে নয়,—সেখানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। দরিদ্রের ঘর, দরিদ্রের একটি ছোট সংসার। চতুর্দিকে দারিদ্র্যের ছাপ পরিস্ফুট। ঘরের মেঝেটি কাঁচা, আর সেই মেঝেতে এক জীর্ণ মলিন শয্যায় রুগ্না একটি বালিকা শুয়ে আছে। বালিকার মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যু যেন শরীরী হয়ে তার শয্যার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিবেদিতা। বালিকা ধীরে ধীরে তাঁরই চোখের সামনে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, অনন্ত ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল।

শোকের ছায়ার মত দুঃখিনী-জননী কন্যার পায়ের কাছটিতে পড়ে আছেন। তাঁর দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাসে চতুষ্পার্শ্বের বাতাস যেন

ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। অন্ধকারে ঢাকা কুটীর, অন্ধকারে ঢাকা মায়ের দেহ-মন।

কিছুক্ষণ পরে বালিকার মৃতদেহ কুটীরের বাইরে আনা হল, তাকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। কিন্তু তার মা নিস্পন্দ অবস্থায় শুয়েই রইলেন মাটিতে।

নিবেদিতা অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে দুঃখিনী মায়ের পাশটিতে গিয়ে বসলেন। নিঃশব্দে মায়ের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিলেন মূর্তিমতী সান্ত্বনার মত, সমদুঃখভাগিনী ভগ্নীর মত। সেই স্পর্শে সহসা সে শোকার্ত নারী চরম উত্তেজনায় উঠে বসল—বলে উঠল, 'আমার মেয়ে? কোথায় নিয়ে গেল তাকে, কোথায়?' ...সে এক নিদারুণ, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। কিন্তু নিবেদিতা শুধু নিজ কোমল দক্ষিণ করতল মায়ের গায়ে স্থাপন করে বসে রইলেন। তারপর অতি নিম্ন কণ্ঠে, যেন কোন অনন্তের বাণী বহন করে—মায়ের কানের কাছটিতে মুখ নিয়ে বললেন,—'চুপ কর। তোমার মেয়ে এখন মহামায়ার কাছে, মা কালীব কাছে চলে গেছে।... এখন কথা বলতে নেই।' কে জানে সে কণ্ঠস্বরের অন্তরালে কোন্ নিগূঢ় উপলব্ধি লুক্কায়িত ছিল, কোন্ প্রশান্তি নিহিত ছিল।

স্বামীজী বলতেন,—মৃত্যু তুমি মাতৃরূপা কালী,

সুখ বনমালী—তোমার মায়ার ছায়া।'

সে 'মায়ার ছায়ার' প্রগাঢ়তাই কি নিবেদিতার কণ্ঠধ্বনি থেকে উৎসারিত হয়ে শোকাতুরা জননীর মর্মমূলে আঘাত করেছিল সেদিন? সে তথ্য সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে শোকার্ত মাতা শান্ত হয়েছিল সে আশ্বাস বাণীতে এবং নিবেদিতাও সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলেন এই শাশ্বত তত্ত্বটি,—

কোথায় শেষ? কোথায় মানুষের তৈরী বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা?... কোথাও নেই। কোথাও নেই।

আছে,—　　　　　'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু,
　　　　　সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'—এই সত্যটি। এ, ছাড়া আর কোন ভেদরেখা সত্য নয়, শাশ্বত নয়।—মহাপ্রকৃতির দিগন্ত বিস্তৃত ক্রোড়টি সর্বজীবের জন্য প্রসারিত রয়েছে নিত্যকাল ধরে। আকাশে সূর্য উঠছে, চন্দ্র নক্ষত্র দেখা দিচ্ছে—প্রকৃতির তালে তালে পরম সঙ্গতি রক্ষা করে। তাদের পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসছে। তাদের উপর কোন বিশেষ দেশের মানুষের বিশেষ কোন অধিকার কি আছে?···

সঙ্গে সঙ্গে আরও অনুভব করেছিলেন,—যেন একটি গভীর সহানুভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠছে অন্তরে। যেন তিনি ঐ শোকার্ত পরিবারেই আপন জন, ঐ দুঃখিনী মায়ের অপরিসীম বেদনার অংশভাগিনী। তাই, তাঁর কথা কয়টি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নারী আবার নিবেদিতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল।

তাঁর আত্মস্মৃতিতে আছে—

'And then, for a moment, with memory stilled we were enfolded together, Eastern & Western, in the unfathomed depths of consolation of the World Heart.'

*　　　*　　　*

আবার আরও বৃহত্তর কর্মভূমিতে,—ধর্ম, শিল্প এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এইকালেই নিবেদিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। কারণ দেখা যায় যে এসময় থেকেই—কলিকাতার নানা স্থানে, নানা সভা-সমিতিতে তিনি যোগ দিচ্ছেন। হিন্দুধর্মের নানা জটিল বিষয়ে নিজ মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে ভাষণ দিতেও আরম্ভ করেছেন। স্টার থিয়েটারে, আলবার্ট হলে, কালীঘাটের মন্দিরচত্বরে—তাঁর সে সব ভাষণ বিদগ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করছে। বিরোধিতার সৃষ্টিও যে না করছে তাও নয়, কিন্তু বিস্ময়-মুগ্ধ শ্রদ্ধা

এবং প্রশংসাই অর্জন করছে সমধিক।…

সে কথাও এখানে একটু বলা প্রয়োজন।…

কলিকাতা মহানগরীতে নিবেদিতার প্রথম বক্তৃতা হয় স্টার থিয়েটার গৃহে, স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে তীর্থযাত্রার পূর্বে।

সেদিন, স্টার থিয়েটারে বক্তৃতায় স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনিই শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও করে দিয়েছিলেন।

পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—'মিস্ মার্গারেট ইংলণ্ডের অমূল্য উপহার। এর কাছে আমাদের অনেক আশা, অনেক ভরসা।'

সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব।'

নিবেদিতার বাগ্মীতা, আত্মবিশ্বাস, সর্বোপরি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা—সেদিনই স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে এক অভাবিত আনন্দ-শিহরণ জাগ্রত করেছিল। তাঁরা যেন অনুভব করেছিলেন এ অসামান্যা নারী তাঁদেরই আপন জন, তাঁদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়া।

স্বামীজীও বিশেষ প্রসন্ন হয়েছিলেন। সে ভাষণটির মধ্য দিয়ে নিবেদিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে স্বপ্ন ও কল্পনা--তারই সার্থক রূপায়ণের সুস্পষ্ট লক্ষণ যেন তিনি প্রত্যক্ষ কারছিলেন, এবং করেছিলেন বলেই, একথাটি তাঁর কণ্ঠ থেকে সেদিন নির্গত হয়েছিল :

'এরপর ক্রমশঃ নিবেদিতার কার্যকরী শক্তি আরও বর্ধিত হবে। তার মত মেয়ে সত্যই দুর্লভ।'

এ বক্তৃতার বেশ কিছুদিন পরে নিবেদিতা আবার বক্তৃতা করেছিলেন আলবার্ট হলে ও কালীঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণে।

কালীঘাটের সভায়ও স্বামীজী স্বয়ং সভাপতিত্ব করবেন কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত হতে সক্ষম হন নি। নিবেদিতা সেদিন নগ্নপদে, বদ্ধ-

কৃতাঞ্জলি হয়ে নিষ্ঠাপরায়ণা এক হিন্দুবিধবার মত অতি বিনম্র অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন সভা-প্রাঙ্গণে। কৌতূহলী, উৎসুক জনতা মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে সমবেত হয়েছিল বিপুল সংখ্যায়, সে অভাবিত-দৃশ্য দেখবার জন্য, নিবেদিতার মুখে কালীমাহাত্ম্য শ্রবণ করবার জন্য। হিন্দুর সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট, দেবীর দক্ষিণ চরণের চারিটি অঙ্গুলি বক্ষে ধারণ কবে একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান রূপে সে স্বীকৃত। হেথায় চিবজাগ্রত দেবী কালিকা, চিরজাগ্রত ভৈরব নকুলেশ্বর।

আজ সেই কালীঘাটে একজন ইংবাজ রমণী নগ্নপদে শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করে এনেছে, ভাষণ দিতে চলেছে—কালীপূজার তাৎপর্য সম্বন্ধে।—বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি ?

সভাপ্রাঙ্গণের মধ্যেও সজ্জন মণ্ডলীর সমাবেশ সামান্য ছিল না। প্লেগের সেবাকর্যে, বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনে এবং পূর্বের অন্যান্য ভাষণে নিবেদিতা তখন কলিকাতার জনসমাজে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছেন।

সুতরাং সভায় বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভক্ত এবং সাধকবর্গের সমাগম প্রচুর হয়েছিল।···

সেদিনের আলোচ্য বিষয়টিও ছিল—'কালী, জগজ্জননী মৃত্যুরূপা কালী।'···

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে শক্তিপূজা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং॥···

এই ভাবেই 'কালী' স্মরণাতীত কাল থেকে বন্দিতা হয়েছেন, পূজিতা হয়েছেন এই আর্যাবর্তে।

কালী একদিকে মৃত্যুরূপা ভয়ঙ্করী, করালবদনী নগ্নিকা। অন্যদিকে তিনি প্রসন্না, বরাভয়করা মাতৃমূর্তি। তাঁর এক চরণাঘাতে

বীজগর্ভ তৃণশস্পে শ্যামাঙ্গিনী হয়ে ওঠেন ধরিত্রী। আবার, অন্ত চরণাঘাতে জীবদেহের কোষে কোষে স্পন্দিত হয় মৃত্যুর নূপুর-নিক্কণ, প্রলয় ডমরুর ডিমি ডিমি রব, গুরু গুরু ধ্বনি।

কবিকণ্ঠে-বন্দিতা কলমন্দ্র-মুখরা এই পৃথিবীরই মত—

'অন্নপূর্ণা তিনি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তিনি ভীষণা।'

একদিকে,

তাঁরই প্রসন্ন নয়ন-সম্পাতে,

'আপক্ক ধান্যভারনম্র ধারিত্রীর শস্যক্ষেত্র থেকে 'প্রভাত সূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশির বিন্দু—কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে ;'

আবার,

অন্যদিকে তাঁরই রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপে—

'জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে

পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য'—দেখা দেয়।...

এই কালী, মৃত্যুরূপা ভয়ঙ্করী, আবার বরদা চিরসুন্দরী।...

এরই উপর বিদেশিনী নিবেদিতার বক্তৃতা।

অথচ, স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় শক্তি-উপাসনার এই বিশেষ দিকটি নিবেদিতার কাছে এক অজ্ঞাত রাজ্যের অপরিচিত বার্তার মতই ছিল। এ-সম্বন্ধে তাঁর পুঁথিগত জ্ঞানও ছিল না, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান তো বহুদূরের কথা।

কিন্তু স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভের পর থেকে দিনে দিনে হিন্দুর ধর্মোৎকর্ষের এই বিশেষ অঙ্গটি তাঁর চিন্তায় পরিস্ফুট হয়েছিল।...

প্রথমে লণ্ডনে, তারপর বেলুড়ে গঙ্গাতীরে এবং সর্বশেষ হিমালয়ে, ক্ষীরভবানীর পুণ্য প্রস্রবন তীর্থে পর্যায়ে পর্যায়ে ঘটেছিল তার ক্রম-অভিব্যক্তি। নিবেদিতার আত্মকথায় সে ক্রম-অভিব্যক্তির অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। একথা উক্ত হয়েছে যে তাঁর আচার্যদেবের শ্রীমুখ থেকেই তিনি প্রথম জানতে পেরেছিলেন, এবং

জেনে বিস্ময়ও কম বোধ করেন নি—যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও কালী-তত্ত্ব রহস্যাবৃতই ছিল দীর্ঘকাল। কিশোর জীবনে সে নগ্নিকা-মূর্ত্তি তাঁর মনে বিতৃষ্ণা এবং বিরাগই সৃষ্টি করত।

কিন্তু তারপর যৌবনের প্রারম্ভমুখে সাক্ষাৎ হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। পরিচয় হল সে দেব-মানবের অলৌকিক জীবনধারার সঙ্গে। আর তারই ক্রম-পরিণতিতে দীর্ঘ ছয় বৎসর কালে 'কালী'ময় হয়ে উঠল স্বামী বিবেকানন্দের স্বকীয় জীবন। প্রবল বিদ্রোহ বিলীন হয়ে গেল আনন্দের সাগর-সঙ্গমে।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের সহস্রদল হৃদ্‌পদ্মটি দুই করপুটে ধারণ করে মহামায়ার পাদযুগে নিবেদন করেছিলেন, উৎসর্গ করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছিলেন,—

'How I used to hate Kali and all Her ways !···But I had to accept her at last ! Ramakrishna Paramhansa dedicated me to Her ; and now I believe that she guides me in every little thing I do'.

কিন্তু কিভাবে এমন অভাবিত পরিবর্তন সাধিত হল, এমন অকল্পিত ভাব-বিপ্লব ঘটে গেল—সে রহস্য কেউ জানেনা। দৃশ্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা, অহেতুক ও অপরিসীম ভালবাসাই, অবশ্য তার কারণ ছিল। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্যতাও তখন পর্যন্ত সর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে স্বামীজীর কাছে ধরা দেয়নি, সে দিয়েছিল অনেক পরে। তখন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ এক অর্ধোন্মাদ পুরুষরূপে প্রতিভাত।···কাজেই দৃশ্য বস্তু-নিচয়ের অন্তরালে কোন গোপন রহস্য অবশ্য ছিল, যার কথা সে দুই যুগ-মানবের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ জগতের কেউ তা জানতে পারে নি, পারবেও না।

স্বামীজীর কথাই আবার উদ্ধৃত করছি :

'I loved him (Ramakrishna), you see, and that was what held me···I saw his marvellous purity··· I felt his wonderful love···His greatness had not dawned on me then. All that came afterwards, when I had to give in.

At that time I thought him a brain-sick baby, always seeing visions and the rest. I hated it.

And then I had to accept her.

No, the thing that made me do it is a secret that will die with me···

Ramakrishna Paramhansa made me over to Her.··· Strange ! He lived only two years after doing that, and most of the time he was suffering.'

এরই ফলে কঠোর বৈদান্তিক বিবেকানন্দ শনৈঃ শনৈঃ মায়ের একান্ত স্নেহাশ্রিত শিশুতে পরিণত হয়েছিল। আর সে পরিণতির শেষ অধ্যায়টি মার্গারেটের চোখের সম্মুখেই দিনে দিনে, ধীরে ধীরে বিরচিত হয়েছিল। সে এক অক্ষয়, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।···

'কালী' প্রসঙ্গে স্বামীজীর অসংখ্য উক্তির মধ্যে প্রায় শেষ দিকের একটি উক্তি এই ছিল :

মা কালী এক মহাগ্রন্থ। মানুষ ঐ গ্রন্থপাঠ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। কিন্তু তার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যেতে যেতে সে উপলব্ধি করে যে এক মহাশূন্যতার মধ্যেই সে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। সবটাই ওর শূন্যতায় ভরা।···

'The image of Kali is the book of experience in which the soul turns page after page, only to find that there is nothing in it after all.

জীবনের নানা কর্মে ও অনুশীলনে, নিভৃত ধ্যানে ও চিন্তায় ক্রমে

এ অভিজ্ঞতাই নিবেদিতার নিজস্ব মতবাদরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। কালী-মাহাত্ম্য উপলব্ধির এই ছিল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।…

স্বামীজী বলেছিলেন—Well, Express it in your own way, Express it in your own way!…

তাই করেছিলেন নিবেদিতা।

আত্মকথায় বলেছিলেন :—

ভারতীয় চিন্তার এক নিগূঢ় তাৎপর্য বহন করে শক্তিপূজার যে বিশেষ মতবাদটি গড়ে উঠেছে, সেটি বুঝতে হলে অনুভূতির চেতনা প্রয়োজন বলে আমি সহজেই উপলব্ধি করেছিলাম এবং সেই হেতু অমরনাথের অপূর্ব অভিজ্ঞতার পর থেকেই ঠিক ছাত্রজীবনের নিষ্ঠা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি কালীপূজার মাহাত্ম্য অধিগত করতে চেষ্টা করেছিলাম।…

'I set myself therefore to enter into Kali-worship, as one would set oneself to learn a new language, or take birth deliberatley, perhaps in a new race.

To this fact I owe it that I was able to understand as much as I did of our Master's life and thought. Step by step, glimpse after glimpse, I began to comprehend a little'

এবং এই ক্রমিক কম্প্রিহেনসন্, এই আন্তঃ-চেতনার পূর্বাভাসই প্রকাশিত হয়েছিল কালীঘাটেব মন্দিব-প্রাঙ্গণের ভাষণে, আলবার্ট হলের বক্তৃতায়, আর পরবর্তীকালের হাড্‌সন নদীর তীবের রচনা—Kali the Mother-নামক অমূল্য ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটিতে।

এক বিদেশিনী নারীর পক্ষে, অতি অল্পকালে, শক্তিপূজার নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার প্রয়াসই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তার উপর সে রহস্যটিকে ধ্যানে উপলব্ধি করা এবং নিদিধ্যাসনে রূপায়িত করা আরও অবিশ্বাস্য, আরও বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। অথচ, সেটিই বাস্তবে

রূপায়িত হয়ে, সজীব হয়ে দেখা দিয়েছিল—কালীঘাটের ও আলবার্ট হলের কালী-সম্পর্কিত ভাষণ দু'টির মধ্যে এবং সেই জন্যই তাদের কথা বলতে গিয়ে সমগ্র ব্যাপারটিরই একটি বিস্তারিত বিবরণ এখানে আমরা প্রদান করলাম।

নিবেদিতার এ কালের আরও কয়েকটি ভাষণ উল্লেখযোগ্য ছিল। একটি মিনার্ভা থিয়েটারে জনসভার ভাষণ। আলোচ্য বিষয় —'নব্যভারত আন্দোলন।'

কতিপয় সন্ন্যাসী সহ এ সভায়ও স্বামীজী উপস্থিত হয়েছিলেন।

আবার, এর অব্যবহিত পরে, বেলুড় মঠে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সাধারণ সভায়ও বক্তৃতা করেছিলেন নিবেদিতা এবং সেখানেও স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত থেকে বক্তৃতা শ্রবণ করেছিলেন।

তাছাড়, ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলিতেও তিনি তখন নিয়মিত বক্তৃতা দিচ্ছেন—নানা বিষয় নিয়ে, নানা সমস্যা নিয়ে।...

তাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ সহজ-প্রাপ্য না হলেও, নিবেদিতার তৎকালীন মানসজীবনের অভাবিত প্রাচুর্যের তারা যে অভ্রান্ত সাক্ষ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে দিক থেকে এদের একটি মূল্য আছে, তাৎপর্যও আছে।...তবে, সে-কথা এখন থাক।...

কিন্তু যে কথা বলছিলাম সেটি এই যে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় ও আশীর্বাদে নিবেদিতার মধ্যে তখন ধীরে ধীরে এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে, যে দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় জীবনদর্শনের নিগূঢ় তাৎপর্য বোঝা যায়, ধরা যায়।...

দেহ এবং আত্মা। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধসূত্রেই সকল দর্শনশাস্ত্র গ্রথিত—কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। কিন্তু তথাপি দুই গোলার্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। পার্থক্য রয়েছে প্রতিপাদ্য বিষয়ে, পার্থক্য রয়েছে উপকরণে এবং চরম সিদ্ধান্তে।

ফলে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শ এবং লক্ষ্য দুই-ই স্বতন্ত্র।

স্বামীজী বলতেন,—

'In the West they say—Man is body, it has a soul. Whereas in the East we say, Man is a soul, it has a body.'

সে জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে দেহের চিন্তাটিও যেন হেয় কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

আজ এই বিশেষ জীবন-দর্শনটিকেই যেন সর্বতোভাবে গ্রহণ করে নিবেদিতা সার্থকনামা হয়ে উঠেছিলেন। সর্ব চেতনা দিয়ে তিনি যেন উপলব্ধি করেছিলেন আত্ম-নিবেদনের এই পরম কৌশলটি :

'Everything in my past life, as an educationist, had contributed to impress on me now the necessity of taking on the Indian Consciousness and the personal perplexity associated with the memory of the pilgrimage to Amarnath—was a witness, not to be forgotten, to the strong place which, Indian systems of worship held in that consciousness.'

আর আমাদের বিশ্বাস এই যে এ উপলব্ধির পূর্ণ পরিণতিতেই এইকালে নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষালাভ ঘটেছিল।

সন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ সপ্তাহে এ দীক্ষার জন্য স্বামীজীর কাছে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গেই, প্রসন্ন অন্তরে পূর্ণ করেছিলেন মানস-কন্যার সে প্রার্থনা।...

ঠিক এক বৎসর পূর্বে, আর এক শুভলগ্নে প্রাথমিক দীক্ষালাভ করেছিলেন নিবেদিতা, লাভ করেছিলেন গুরুদত্ত অবিস্মরণীয় নাম—নিবেদিতা। সে কাহিনী পূর্বে বলেছি।

আজ আবার বৎসর কাল অন্তে চিন্তা-জীবনের দুশ্চর তপস্যার সিদ্ধি অর্জন করে—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়', ব্রহ্মচারিণীর উৎসর্গীত জীবনপথ তিনি গ্রহণ করলেন আনুষ্ঠানিক ভাবে ও শাস্ত্রানুমোদিত পন্থায়।

গুরুর অমোঘ আশীর্বাদ স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হল ছন্দে :

'The mother's heart, the hero's will
the sweetness of the Southern breeze
the sacred charm and strength thal dwell
on Aryan altars flaming, free ;
All these be yours, and many more.
As ancient soul could dream before—
Be thou to India's future son
the mistress, servant, friend in one.

বীরের সঙ্কল্প আর মায়েম হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—ধীর মধুময়,
যে পুণ্য সৌন্দর্য, বীর্য আর্য বেদীতলে
নিত্য বহে বাধাহীন দীপ্ত হোমানলে—
সকলই তোমার হোক, হোক পূর্ণমান
বিগত কালেতে যাহা স্বপ্নের সমান।
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে,
হও তুমি বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।

এ আশীর্বাদ-বাণী, স্বামীজীর এক বৃহদায়তন তৈলচিত্রের একাংশে স্বামীজীর স্বহস্ত-লিখিত লিপিতে—একদিন উপহার পেয়েছিলেন নিবেদিতা—জীবনের একটি অমূল্য সম্পদরূপে। আজও নিবেদিতা বিদ্যালয়ে গেলে একটি সুপরিসর কক্ষের প্রাচীর গাত্রে সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা সেই বৃহদায়তন চিত্রটি দেখা যাবে, সে লেখাটি

পাঠ করা যাবে। অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল পূর্বেকার সে এক অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন,—দুই মহাজীবনের রাখীবন্ধন। মানুষ মরে যায়, সে থাকে না। কিন্তু তার মধুর স্মৃতি কালকেও অতিক্রম করে কত দিন থাকে, কত কাল থাকে!···

আর একটি কথা।

নিবেদিতার ব্রহ্মচর্য দীক্ষার কথা আমরা বলালম। কিন্তু তাঁর সন্ন্যাস? নিবেদিতা কি সন্ন্যাস দীক্ষাও প্রার্থনা করেছিলেন স্বামীজীর কাছে? সে প্রার্থনা কি গৃহীত হয়েছিল, না প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল? কথাটি সেই প্রসঙ্গ নিয়ে।···

নিবেদিতার বিভিন্ন চরিতাখ্যায়িকায় এ-সম্বন্ধে নানা বিরোধী মতবাদ স্থান লাভ করেছে। কোন কোন আখ্যায়িকা আবার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরব। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে—নিবেদিতার উত্তর-জীবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নানাভাবে তাঁর অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা—দূর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েই স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

নিবেদিতা কি গৈরিক-বস্ত্র পরিধান করতেন, অথবা শ্বেতবস্ত্র? এ বিষয়েও নানা পত্র-পত্রিকায় নানা আলোচনা আমরা লক্ষ্য করেছি। নিবেদিতার চরিত্র অনুধ্যানে এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব খুব বেশী বলে আমরা মনে করি না। সেজন্য খুব বেশী চুল-চেরা বিচারেও আমরা অগ্রসর হব না।

শুধু প্রাসঙ্গিক হিসাবে একথাটিই বলব যে সর্বত্যাগ ও সর্ব-বিসর্জন যদি সন্ন্যাসের যথার্থ লক্ষণ হয়,

'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন-প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।'

এ যদি বর্তমান যুগের মহামন্ত্র হয় তবে নিবেদিতার সন্ন্যাস-

প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নি। থাকবার কোনও কারণও নাই, যুক্তিও নেই।

কথিত আছে—উত্তরকালে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা বলেছিলেন—'না, মা স্বামীজীই আমাকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। শিবমন্ত্রে আমি দীক্ষালাভ করেছি। আর আমি সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করব না।'

আরও কথিত আছে যে স্বামীজীর জীবদ্দশায় একখানা গৈরিক উত্তরীয় স্বহস্তে তিনি নিবেদিতাকে দান করেছিলেন—সন্ন্যাসের প্রতীক বস্ত্ররূপে। স্বামীজীর-দেওয়া সেই গৈরিক উত্তরীয়খানি ধ্যান করবার সময় গায়ে জড়িয়ে নিতেন নিবেদিতা। নতুবা, সচরাচর দুগ্ধ-ধবল শুভ্র বস্ত্রই তিনি পরিধান করতেন। তনুখানি ছিল ঋজু ও দীর্ঘ। মাথার চুল চূড়া করে উপরে বাঁধা। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা। সে এক বিচিত্র রূপ, বিচিত্র লাবণ্য!···

ঋজু দীর্ঘ তনুখানি, তাহে শুভ্রবাস অঙ্গে পরিহিতা,
সরস্বতী-সম দেহ-শোভা।—এই-ই নিবেদিতা!

কিন্তু এছাড়া, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেরও একটি ঘটনা আছে। অদৃশ্য-অনুভূতি পথে সন্ন্যাস দীক্ষাদানের সেও এক বিদ্যুদ্দীপ্ত ঘটনা।···

সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এক কপিশ পিঙ্গল গোধূলি লগ্নে বেলুড় মঠের নিজ কক্ষটিতে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন, সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছিলেন স্বামীজী।

সে কাহিনী আজ সর্বজন বিদিত। গঙ্গার পূর্বকূলে স্বামীজীর জন্ম, গঙ্গার পশ্চিমকূলে তার লীলাবসান। মধ্যে শিবজটা-নিঃসৃত ভাগীরথীর একাংশেরই মত স্বল্পায়ু তাঁর দিব্য জীবনখানি।

তাঁর সে আকস্মিক দেহত্যাগ যেন ধূম-ধূলিসমাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুক থেকে একটি মহিমোজ্জ্বল জ্যোতিউৎসের আকস্মিক অবলুপ্তির

মত। একটি দীপ্ত নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতির মত। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর আছে, বিস্তৃত বিবরণ আছে।…

সেদিন সেই মৃত্যুক্ষণে গুরুর পার্শ্বে নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন কলিকাতায়। পরদিন অতি প্রত্যুষে লোক-মারফৎ সে মর্মান্তিক সংবাদ তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাঁর পক্ষে সে কেমন সংবাদ, কত অসহনীয় বেদনায় ভরা—তা উপলব্ধি করবার সাধ্য আমাদের নাই!

আমরা শুধু এই দেখি যে পরদিন মহানিদ্রায়-নিদ্রিত স্বামীজীর দেহটির একপার্শ্বে একখানি বীজনি হস্তে তিনি ধীরে ধীরে বীজন করে চলেছেন।

সে মূর্তি ধীর, সে মূর্তি স্থির ও নিশ্চল। চক্ষে অশ্রু নেই, পলক নেই, অধরোষ্ঠে কম্পন পর্যন্ত দেখা যায় না। কেবল এক মনে গুরুর দেহে বীজনি সঞ্চালন করে চলেছেন। ৺মোহিতলাল মন্তব্য করেছেন:

'বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্যসহচর আনন্দের কথা মনে পড়ে। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্বান সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন। এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক—তাহা আমি জানিনা।'—

এরপর যথাসময়ে, প্রায় দিবাশেষে, সে দিব্যতনুখানি চিতাশয্যায় শায়িত করা হল, অগ্নি-সংযোগে প্রধূমিত করা হল। গৈরিক বসন পরিহিত, গৈরিক উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের দেহখানি গ্রাস করল লেলিহান মহাঅগ্নি, যে অগ্নির বিচিত্র মহিমা একদিন কীর্তন করেছিলেন মৃত্যুদেবতা বৈবস্বত স্বয়ং। উপলক্ষ্য ছিলেন শ্রদ্ধাবান কুমার কিশোর নচিকেতা।

পরমার্থ লাভের উপায় সেই অগ্নি—'এতমগ্নিং তচৈব প্রবক্ষ্যন্তি

জনাসঃ'—নচিকেতা নামেই অভিহিত হয়েছিল।...

মূর্তিমতী শোকের ন্যায় ম্লান, নত মুখে চিতাগ্নির অনতিদূরে দাঁড়িয়েছিলেন অভাগিনী নিবেদিতা।

অকস্মাৎ, প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি থেকে কাষ্ঠ বিদারণের অস্ফুট শব্দের সঙ্গে স্বামীজীর দেহলগ্ন বস্ত্রখণ্ডের ছোট একটি অংশ তীরবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবার নিবেদিতার বুকের কাছে সংলগ্ন হয়ে গেল। মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। মুহূর্তে মহাবিস্ময়ে বস্ত্রাংশটুকু দুই করপুটভরে তিনি গ্রহণ করলেন—গুরুর শেষ আশীর্বাদের স্মারকরূপে, সন্ন্যাস দীক্ষার নিদর্শনরূপে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই মহামূল্য, মহাশুচি বস্ত্রখণ্ড সযত্নে রক্ষা করেছিলেন নিবেদিতা—অক্ষয় সম্পদরূপে, ত্যাগের বৈজয়ন্তী চিহ্নরূপে।...

কোন আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসদীক্ষা কি এর সমতুল তাৎপর্য ধারণ করে? বিরজা হোমের ঊর্দ্ধমুখিন্ কোন অগ্নিশিখা কি ঐ চিতাবহ্নির শিখার তুলনায় অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান? আমরা সে কথা বিশ্বাস করি না এবং বিশ্বাস করি না বলেই নিবেদিতার মত সর্ব-রিক্তা, শুদ্ধ ব্রহ্মচারিণী নারীকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে স্বামীজী অস্বীকৃত হয়েছিলেন—একথাও যথার্থ বলে গ্রহণ করবার কোন যুক্তি খুঁজে পাইনা। পরন্তু, আমাদের ধারণা—যে দীক্ষা প্রকৃত সন্ন্যাস দীক্ষা, যে দীক্ষা, 'মন না রাঙায়ে কাপড় রাঙাবার' দুর্গতিতে লাঞ্ছিত নয়, সে দীক্ষা যথা সময়ে এবং যথাযথ ভাবেই তিনি লাভ করেছিলেন। অবশ্য, এ-সব অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। নিবেদিতার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভের কথা বলতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে এ কাহিনীর উল্লেখ আমরা করলাম। নতুবা একথা এখানে নয়। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবেদিতার যে সংযোগ সে কথাও এখানে নয়।

বোসপাড়া লেনের বিদ্যালয়টির কথাই এ অধ্যায়ে—আমাদের মুখ্য বক্তব্য।

বলাবাহুল্য, বিদ্যালয়ের সেই গৃহটি নিবেদিতাকে আশ্রয় দিয়েই ক্রমশঃ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করল। শুধু বাংলা দেশের নয়, কালক্রমে বৃহত্তর ভারতের মনীষীবর্গের উৎসুক দৃষ্টিও ঐ বিদ্যালয় এবং তার পরিচালিকার প্রতি আকৃষ্ট হল।

পরবর্তীকালে ঐ বোসপাড়া লেনের গৃহটিতে গোপালকৃষ্ণ গোখেল, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, রমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীগণের শুভাগমনে মুখর হয়ে উঠেছিল। এঁদের কেউ রাজনীতি ক্ষেত্রে, কেউ সাহিত্যে বা ধর্মে, কেউ বিজ্ঞানে, সাহিত্যে বা ইতিহাসে নেতৃস্থানীয়। এমন কি বড়লাট-পত্নী লেডি মিন্টোও একবার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে ঐ বোসপাড়া লেনের বাটীতে গোপনে উপস্থিত হয়েছিলেন।—সে কাহিনীও যথাস্থানে বলব।

বস্তুত, ক্রমে এক ব্যপক কর্মোন্মাদনা ঐ বোসপাড়া লেনের গৃহটিকে ঘিরে যেন জাগ্রত হয়েছিল, যার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিলেন—ঐ বিদেশিনী, ঐ সর্বত্যাগিনী বিবেকানন্দ-দুহিতা নিবেদিতা।...

কখনো কখনো তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুগণও বোসপাড়া লেনে এসে বহু সময় আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত করে যেতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত কোন সময় ঐ পল্লীর অপরিচ্ছন্নতার কথা তুলতেন। অনুরোধ করতেন—কলিকাতার অন্য কোন পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পল্লীতে যাওয়ার জন্য, আরও একটু বৃহৎ বাড়িতে বিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করবার জন্য।

স্মিতহাস্যে তখনই নিবেদিতা উত্তর করতেন—এই পল্লীটিই আমাকে একান্তভাবে আপন বলে গ্রহণ করেছে, কাজেই আমি আর কোথাও যাব না, এখানেই থাকব।...

This lane has adopted me and I must stay here and no where else.'

এইরূপেই নিবেদিতার ভারতীয় কর্মজীবনের প্রথমাংশ যাপিত হয়েছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের নানা অবরুদ্ধতা অতিক্রম করে—নিবেদিতা যে সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন নিঃসংশয়ে তাতে একটি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল, এক অদৃশ্য মহাশক্তির খেলা ছিল।...

॥ আট ॥

কালের বিচারে সময়টি খুব দীর্ঘ-বিস্তৃত নয়। সবশুদ্ধ মাত্র দেড় বৎসর, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন পর্যন্ত।

কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে নিবেদিতার প্রথমবারের সেই ছিল স্থিতিকাল। এ সময়ের শেষ দিকেই স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-দেশে যাওয়া স্থির করেছিলেন। কতকটা স্বাস্থ্যের প্রয়োজনেও বটে, কতকটা কর্মব্যপদেশেও বটে।...

নিবেদিতার নিজ বিদ্যালয়ের অর্থাভাব তখন একটি সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে। অতএব, পশ্চাত্যদেশ থেকে অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতাও স্বামীজীর সঙ্গে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। স্বামীজীরও অসম্মতি ছিলনা। মনে হয়, প্রস্তাবটিকে স্বামীজী দু'দিক থেকে চিন্তা করেছিলেন। একদিকে অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজন তো ছিলই, কিন্তু অন্যদিকে, আরও একটি কথা বোধহয় ছিল।

সমুদ্র পথের দিনগুলি সর্বভাবে কর্মবর্জিত ও নিরুপদ্রব হবে। সুতরাং, সে-সময় নিবেদিতার অন্তরজীবন গঠনে 'শেষ স্পর্শ দিয়ে যাব'—এও নিশ্চয়ই তাঁর চিন্তার মধ্যে এসেছিল। তাই, স্বামীজী ও তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে নিবেদিতাও এবার যাত্রা করেছিলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে, ঠিক চার-পাঁচ দিন পূর্বেই গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীরা, বিশেষ করে উপরের শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রীরা, জানতে পেরেছিল যে 'সিস্টার' চলে

যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন, কতদিনের জন্য যাচ্ছেন—সেটা অবশ্য তারা জানত না। ফলে, তাদের মনে এ আশঙ্কা স্বতঃই জাগ্রত হয়েছিল যে সিস্টার হয়ত চিরদিনের মতই চলে যাচ্ছেন, আর হয়ত তিনি ফিরে আসবেন না।

সিস্টারের ঐকান্তিক স্নেহ, তাঁর কাঁচ-স্বচ্ছ পবিত্র জীবন—কুন্দেন্দিধবল তনু—তাদের মনে তখন গভীর রেখাপাত করেছে, প্রভাব বিস্তার করেছে। কোন্ এক অজানা দেশ থেকে একদিন অকস্মাৎ তাদের মাঝখানে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, শুনিয়েছিলেন আশার কথা, প্রাচীন এই আর্যাবর্তের গৌরব কাহিনীর কথা। সিস্টারকে ঘিরে তখন তাদের কত উৎসাহ, কত স্বপ্ন!···

সিস্টার তাদের বলতেন—দেখ, মাটির বুকের ইমারত, তা সে যত দৃঢ়ই হোক যত কঠিনই হোক কখনও কল্পলোকের ইমারতের মত সুদৃঢ় হয় না, হতে পারে না।—

'No castle built on the earth is ever so formidable as the castle built on air'.

তাই, বৃহৎ কল্পনা তোমরা করতে শেখ, মহৎ স্বপ্ন দেখতে শেখ।

ক্ষত্রিয় বীরব্রত গ্রহণ করে রাজপুত রমণীর মত বীর্যবতী হও।

শ্বাসে শ্বাসে জপ কর নাম—'ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ। মা, মা, মা!'···

এমন ভাষায়, এমন আবেদনে কেউ তাদের চোখের সামনে কোনদিন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল-ছবি তুলে ধরে নি, জীবন-গীতার আবরণ উদ্ঘাটিত করে দেয় নি। এ ধ্বনি নূতন, এ অভিজ্ঞতা নূতন। মানুষটির অনুপ্রেরণা-স্পর্শও একেবারে নূতন।

তাই তাদের মনে বেদনা-মিশ্রিত এ আশঙ্কা জাগ্রত হয়েছিল,—সিস্টার কি চলে যাবেন চিরদিনের মত? আর ফিরে আসবেন না?

নিবেদিতা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন। গভীর মমতার সঙ্গে বলেছিলেন,—না, না। তিনি আসবেন বৈকি ?

আসবেন, অবশ্য আসবেন।...

ভারতবর্ষই তো তাঁর দেশ। সে দেশ ছেড়ে কি তিনি যেতে পারেন, থাকতে পারেন !...

যাত্রার হু'দিন পূর্বে, একটি সম্পূর্ণ দিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কাটিয়েছিলেন। আবার কবে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে, আবার কবে তাঁর নিরব আশীর্বাদ ও স্নেহ লাভ প্রত্যক্ষভাবে ঘটবে জীবনে—কে জানে ? তাই, একটি পূর্ণ দিন মায়ের স্নেহছায়ায় ও নিকট সান্নিধ্যে যাপন করেছিলেন নিবেদিতা।

মনটি বড় ভারাক্রান্ত হয়েছিল। নিজ বাসভূমি থেকে প্রবাসে যেতে মানুষ যে বেদনা বোধ করে—ঠিক তেমনি অন্তর-বেদনা তিনি যেন অনুভব করেছিলেন এবার, ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে নিজ জন্মভূমিতে যাবার প্রাক্কালটিতে।

পবরর্তীকালে আরও হু'বার, বেশ কিছুদিনের জন্য, তাঁকে বিদেশে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তখনকার মনোভাব এবারের মত হয় নি।...

বেলুড়মঠে আবার একটি ঘরোয়া চায়ের মজলিসে তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানান হয়েছিল, সেদিনই অপরাহ্ণ কালে। চা-পানের পর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা গিয়েছিলেন পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে তাঁর গুরুর গুরু, দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে কোন্ আকুতি তিনি জ্ঞাপন করেছিলেন আমরা জানিনা।

নিবেদিতার উৎসর্গীত, নিষ্কাম-জীবনে ব্যক্তিগত কামনা বাসনা কিছু ছিলনা।

If I have any personal affliction—I am unworthy of my church—জনৈক খ্যাতনামা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের এ-উক্তিটির অনুরূপই যেন ছিল নিবেদিতার মনোভাব।

তাই, তাঁর নিবেদন হয়ত ছিল জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতির সাফল্যটিকে ঘিরে, হয়ত ছিল তাঁর সেবা-ব্রতের সার্থক উদ্‌যাপনের ব্যগ্র কামনাটিকে ঘিরে! কে জানে, সঠিক ভাবে কেই-বা বলতে পারে! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী থেকে সেদিন অনেক রাত্রে গৃহে ফিরেছিলেন নিবেদিতা। গ্রীষ্মতপ্ত ধরিত্রী সে রাত্রিতে প্রবল বারিবর্ষণে স্নাত হয়েছিল, শীতল হয়েছিল।...

পরদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আহার্য গ্রহণ করে—বিকালের দিকে তাঁদের যাত্রার ব্যবস্থা ছিল!

২০শে জুন কলিকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে সে যাত্রার আরম্ভ। আর কিঞ্চিদধিক পাঁচ সপ্তাহ পরে, ৩১শে জুলাই ইংলণ্ডের 'টিল্‌বেরী' বন্দরে সে যাত্রার পরিসমাপ্তি। জাহাজ ছিল 'গোলকুণ্ডা।'

বঙ্গোপসাগর দিয়ে, মাদ্রাজ ও কলম্বো স্পর্শ করে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের বুক কেটে, আটলান্টিক মহাসাগরের নিঃসীম বিস্তার অতিক্রম করে সে দীর্ঘ জলযাত্রার পথরেখা চিহ্নিত হয়েছিল। উপরের অন্তহীন আকাশ কখনো নীল, কখনো মেঘাবৃত। নিম্নে মহাসমুদ্র কখনো শান্ত, কখনো তরঙ্গ-মুখর। দূরে দিগন্ত-লগ্নতায়—বনরাজিনীলা তমালবৃক্ষ ও তালবৃক্ষশ্রেণী। আর তাদের মধ্যে, ভাসমান অর্ণবপোতের বুকে ব্রহ্মবিৎ আচার্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহা-জীবনের মহৎ বিশ্লেষণের সাক্ষীরূপে নিবেদিতা।...

নিবেদিতার জীবনের আর এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, আর এক দুর্লভ সুবর্ণ-সুযোগ এটি।...

তদীয় অমরগ্রন্থ 'মদীয় আচার্যদেবের' পৃষ্ঠায় এ যাত্রাকে 'অর্ধ পৃথিবী অতিক্রম' বলে তিনি অভিহিত করেছেন।

বস্তুত, কি ভৌগলিক বিচারে, কি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এ যাত্রা সত্যই অর্ধ-পৃথিবী অতিক্রম করেছিল।

কারণ, একদিকে যেমন সপ্তসমুদ্রের অর্ধাংশ ঘিরে এ-যাত্রার

পরিধি বিস্তৃত ছিল, অপরদিকে তেমনি অতীত যুগের যে সব প্রাচীনা নগরী ও প্রাচীন সভ্যতা একদিন পৃথিবীর বুকে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল, অক্ষয় চিহ্ন এঁকেছিল—মিশর, বাবিলন, তুস্তর দিগন্ত-বিস্তৃত আরবদের মরুপ্রান্তর,—তাদের পাশ দিয়েই এগিয়েছিল 'গোলকুণ্ডা'।...

তারপর সুয়েজ খাল। সে খাল ও ভূমধ্যসাগরের দুই তটে কত জাতি, কত দেশ উঠেছে, বিলুপ্ত হয়েছে। মানব সভ্যতার আদি এবং মধ্যকালের ইতিকথার এক বৃহৎ অংশের জন্ম এবং বিলুপ্তি ঘটেছে সেখানে। প্রাচীন ইস্রেলাইটস্, ফারাওদেরও পূর্ববর্তী রাখাল রাজাদের ইতিকথা, ফিংক্স, হিলিওপোলিস, মহানগরী আলেকজাণ্ড্রিয়া—বিগত অতীতের কত দুর্লভ উপকরণ, কত দুষ্প্রাপ্য ম্যাটিরিয়াল। কিন্তু তারা কথা বলেনা, তারা নির্বাক। কথা বলে ঐতিহাসিক, কথা বলে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীরা। তাই এদের স্মৃতি-উদ্দীপনায় মুহুর্মুহুঃ স্বামীজীর মনে নানা মৌলিক বিশ্লেষণ, নানা ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিভাসিত হয়েছিল। তাছাড়া, একালের সমুদ্রযাত্রার দিনগুলিতে জীবনদর্শনের উৎকর্ষতাও প্রাপ্ত হয়েছিল অভাবিত গভীরতা। নিবেদিতার ভাষায়ই বলছি—

'এই ছয় সপ্তাহের সমুদ্রযাত্রার স্মৃতি আমার অন্তরের মণিকোঠায় মহামূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত।

স্বামীজীর সান্নিধ্য ও সাহচর্যের একটি মুহূর্ত, একটি সুযোগও যাতে নষ্ট না হয়, যাতে হস্তচ্যুত হয়ে না যায় সেজন্য আমি সজাগ থাকতাম সর্বদা। অন্য কারো সঙ্গে মিশতাম না। অবসর মুহূর্তগুলিতে শুধু একটু সেলাইয়ের কাজ অথবা লেখার কাজ নিয়ে বসতাম কখনো। কিন্তু স্বামীজীই ছিলেন সমগ্র সত্বাটিকে ঘিরে। একটি অব্যাহত ভাবস্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁর বিরাট মন ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শলাভে আমি যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। সেই হেতু,—

'To this voyage of six weeks I look back as the

greatest occasion of my life.

I missed no opportunity of the Swami's society that presented itself, and accepted practically no other, filling up the time with quiet writing and needle work : thus I received one long continuous impression of his mind and personality'.

আর, সে ইম্প্রেসনের কাহিনীই বর্তমান পর্যায়ে আমাদের মুখ্য বক্তব্য বিষয়।...

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংবাদের মত বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সংবাদেরও কয়েকটি সুচিহ্নিত ক্রমিক অধ্যায় আছে।

তাদের পশ্চাতে একটি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ-সূত্র বর্তমান থাকলেও—তারা সর্বাংশে এক নয়। তাদের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্যগুলি উপেক্ষাও করা যায় না।...

একথা সর্বজনবিদিত যে স্বামীজীর পুণ্য সঙ্গলাভ নিবেদিতার ভাগ্যে খুব বেশী দিনের জন্য ঘটেনি।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয়। আর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। কাজেই, মোট মাত্র ছয়-সাত বৎসর সেই সঙ্গ-লাভের কালটি বিস্তৃত। আবার তার মধ্যেও মাত্র তিন চারবার তাঁর নিকট-সান্নিধ্য নিবেদিতা লাভ করেছিলেন। সে কালগুলি একত্র করলে দু'বৎসরও হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার মধ্যেই ছিল কয়েকটি সুচিহ্নিত ক্রমিক অধ্যায়। সে কথাটিই বলছি।

প্রথম অধ্যায়ে লণ্ডন মহানগরীতে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয় ঘটেছিল। সে পরিচয় নিবেদিতার জীবনে কি বিপুল ভাবান্তর এনেছিল, কি অব্যক্ত বিস্ময় জাগ্রত করেছিল সে কথার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি।

সে সব অপ্রত্যাশিত অনুপ্রেরণার দিনগুলিতে মনে হয়েছিল যেন এই মাটি, কাঠ, পাথরের স্থূল পৃথিবীর মানুষই স্বামীজী নন। অন্য কোন রহস্যময় অতিন্দ্রীয় জগতের তিনি অধিবাসী—শুধু ক্ষণে ক্ষণে এই কঠিন মাটিতে ঈষৎ লঘুপদে তিনি বিচরণরত। দেহটি লঘুভার, মনটি সর্বথা অন্তর্মুখিন্ আর তাঁর উপস্থিতি, ইংরাজীতে যাকে ethereal presence বলে—ঠিক সেই ধরণের।

নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিয়ত উদ্গীত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠ থেকে, বহন করে আনছে অপ্রাকৃত জগতের অমৃত বার্তা।…ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। সে জীবনের আকর্ষণ অনিবার্য, প্রভাব অলঙ্ঘ্য।…

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বেলুড়ে গঙ্গার তীরের ছোট নিভৃত কুটিরটিতে, স্বামীজীর বহুমুখী জীবনের আর একটি বিশিষ্ট দিক উদ্ঘাটিত হয়েছিল নিবেদিতার সম্মুখে একটি নূতন দৃশ্যের বৈচিত্র নিয়ে।

সে দৃশ্যে ভারতবর্ষই যেন কেন্দ্রস্থ। ভারতর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই যেন তখন মূর্ত হয়ে উঠেছে স্বামীজীর কাছে।

বন্দিনী, নিগৃহীতা জননীর মর্মপীড়ার সে এক কঠিন অন্তঃগূঢ় বেদনা, এক অসহনীয় প্রদাহ। নিবেদিতাব কাছে সেও এক নূতন আবিষ্কার।

পূর্বেকার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভ.বপ্রবাহ আর মুহূর্মুহূঃ সমাহিত-চিত্ততার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি এখন যেন গৌণ পর্যায়ে অপসারিত হয়েছে। কখনো কখনো, সে দেখা দেয় সত্য কিন্তু তাদের অন্তরাল থেকে আর একটি বিবেকানন্দ এখন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণেই বেরিয়ে আসে। সে বিবেকানন্দের অন্তরের রত্নবেদীতে সর্বমহিমায় বিরাজিত তাঁর জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী, জন্মভূমি—

'The queen of his adoration, his motherland'

উত্তরভারতের তীর্থপরিক্রমার অবিস্মরণীয় দিনগুলিও বহুলাংশে

এ অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও তখন স্বামীজীর স্বকীয় জীবনের অন্তঃপুরেও নানা ঘটনা-পরম্পরায় এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হতে চলেছে।…

আর এই দুই কালের বিপরীত অভিজ্ঞতার সংঘাতেই নিবেদিতার জীবনে এক কঠিন পরীক্ষা ও সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সে সব কথাও যথাস্থানে আমরা পর্যালোচনা করেছি।…

হিমালয়ের ক্রোড় থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবার মুখে নিবেদিতার যে অভিজ্ঞতা তাতে স্বামীজী অনেকাংশে সাক্ষী স্বরূপ, উপদেষ্টা স্বরূপ।

ভারতীয় সমাজে নিবেদিতা গৃহীত হোন, ভারতবর্ষকে ও ভারতীয় জীবনধারাকে সর্ব ভাবে গ্রহণ করে নিজ দায়িত্বে তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন—এইটি তখন স্বামীজীর একটি বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল এবং সেজন্য কখনো উৎসাহ, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো সামান্য ইঙ্গিত বা নির্দেশ প্রদান—এই ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ কাজ। অন্যথায় তিনি নিরপেক্ষ, তিনি দ্রষ্টা মাত্র।

স্বকীয় জীবনক্ষেত্রেও তখন তিনি শেষ দৃশ্যে দণ্ডায়মান।

কর্মের ঘন আবরণ অপসৃত হয়েছে। দূর, অস্তদিগন্তে রক্ত-আভা দেখা যায়। কর্ণকুহরে, ধীর সমীরে ভেসে আসে ধ্বনি,—

অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।

…'he who can hug the form of death
to him the Mother comes!'

অথচ, এরই মধ্যে 'বহুজন হিতায়,বহুজন সুখায়' কর্মানুষ্ঠানের জন্য সে কী অবিশ্রাম আবেদন, কী গভীর অনুপ্রেরণা!…

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সংবাদের শেষ অধ্যায়ের এইটিই মূল কথা, এইটিই অদৃশ্য ভাবধারা।

কিন্তু এরই মধ্যে স্বামীজীর জীবনের যে নব পর্যায়টি উদ্ঘাটিত,—সেটিতে দেখা যায় তিনি এক মহামানব, বিশ্বানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ এক

প্রেমিক-পুরুষ,—যাঁর দৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের অপার মহিমা অনন্ত ঐশ্বর্যে প্রতিফলিত।

তাই, এবারের সমুদ্র পথে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রহ্মলীন যে পুরুষ অথবা ভারতপ্রেমিক যে বিবেকানন্দ, নিবেদিতার সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, আজ তাদের উভয়কে আবৃত করে যেন আর এক মূর্তিতে তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন।

'গোলকুণ্ডা' জাহাজের দিনগুলি সেদিক দিয়েও এক গভীর তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে মানবগোষ্ঠীর মহাযাত্রা নানাদেশে, নানাকালে যে পতন-অভ্যুদয় পথে অগ্রসর হয়েছে তার একটি রূপ আছে।

শুধু রাজা মহারাজ নয়, অভিজাত বা বণিকগোষ্ঠীও নয়, পরন্তু অতি সাধারণ যে জন-জীবন, মাটির একান্ত কাছাকাছি যে বাস করে, তার পদধ্বনিও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ধ্বনিত হয়। এই 'গোলকুণ্ডা'র দিনগুলিতে সেই পদধ্বনি যেন শরীরী হয়ে স্বামীজীর কাছে ধরা দিয়েছিল।

দুঃখীর জন্য, নিগৃহীতের জন্য—তা সে যে দেশেরই হোক, যে জাতিরই হোক,—তখন তাঁর কি অপরিসীম সমবেদনা! কি অফুরন্ত সহানুভূতি!

'And above all the vindication of Humanity, never abondoned, never weakened, always rising to new heights of defence of the undefended, of chivalry for the weak.'

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত॥

সে অনুভূতি বিস্ময়কর।...

একদিন কোন্ অপ্রাকৃত ভূমি থেকে স্বামীজী এসেছিলেন এই মাটির ধরণীতে, আবার নিজ জীবনব্রত উদ্‌যাপন করে কোন্

দিব্যধ্যামে তিনি প্রস্থান করেছিলেন,—আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর অক্ষয় জীবনস্মৃতি রক্ষিত আছে তাদেরই হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করেছেন, তাঁর দুর্লভ সঙ্গ লাভে কৃতার্থ হয়েছেন।...

নিবেদিতার ভাষায়—

'Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this love of man.'

এইরূপে, কয়েকটি ক্রমিক পর্যায়ে, স্বামীজীর চরিত-মহিমা নিবেদিতার সম্মুখে প্রকটিত হয়েছিল। একটি অতিন্দ্রীয় পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে তার যাত্রা শুরু। আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি নিভৃত কন্দরে তার উৎসমুখ লুক্কায়িত। আর স্বদেশের কল্যাণ এবং সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধে তার পূর্ণ সার্থকতা।...

'আত্মনো মোক্ষার্থং জাগদ্ধিতায় চ'-রূপ যে মহামন্ত্র এযুগের জন্য স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেন, সে মন্ত্রের প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত রূপায়ন এমনি ভাবেই ধীরে ধীরে নিবেদিতার সামনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল। আর প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু-সান্নিধ্যের সেই ছিল তাঁর শেষ অধ্যায়। স্বামীজীকে একান্তভাবে নিকট পেয়ে, তাঁর হাতে প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা ও নির্দেশ লাভের সুযোগ—এরপর আর তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি বললেই চলে। কারণ, এই সমুদ্র যাত্রার শেষে, ইংলণ্ডে মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। তারপর, আরও একবার নিউইয়র্কে, কিন্তু সেও খুব অল্প সময়ের জন্য। এর পরই দীর্ঘ অদর্শন। কারণ স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, আর নিবেদিতা তারপরও প্রায় দেড় বৎসর কাল ইউরোপ এবং আমেরিকার নানাস্থানে নানা কার্য ব্যপদেশে পরিভ্রমণ করে একেবারে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রত্যাবৃত্ত

হয়েছিলেন। কিন্তু তখন স্বামীজীর জীবনের মেয়াদ আর অল্পই অবশিষ্ট। মহা-প্রস্থানের জন্য তিনি প্রায় প্রস্তুত হয়েই বসে আছেন।

'Those were last days of his life and I met him only to receive his last benediction.'—কিন্তু সে-কথা পরে বলছি।···

এখানে প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন।

একথা সর্বজনবিদিত যে মহৎ জীবন মাত্রেরই একটি প্রদাহ থাকে। সে প্রদাহের ফলে সাধারণের জীবন-ধাতু বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, দীপ্তি লাভ করে। কঠিন উত্তাপ সত্ত্বেও চরমে শান্তি ও মাধুর্য দান করে মানুষের জীবনকে সে ধন্য করে দেয়, আনন্দময় করে দেয়। নিবেদিতার অনন্য জীবনটি যেন এ-প্রক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

স্বামীজীকে ভালবেসেছিলেন নিবেদিতা। কায়মনোবাক্যে নিজের সমগ্র জীবনখানি তাঁর পাদমূলে দুই করপুটভরে তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, স্বাভাবিক নিয়মবশেই অকম্পিত পাবকশিখার মত বিবেকানন্দ জীবন-প্রদাহ সকল দিক থেকে নিবেদিতাকে উত্তপ্ত ও দগ্ধ করেছিল এবং যথাকালে তাঁকে অপূর্ব বিশুদ্ধতাও দান করেছিল। আর জাহাজ-যাত্রার যে দিনগুলির কথা এ পর্যায়ে আমরা বিবৃতি করছি, সে দিনগুলিতেই ঐ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

সমুদ্র পথের দিনগুলিতে কত কথা, কত বিচিত্র কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আহরণ করা হয়েছিল। শুধু আহরণই নয়—শত মৌলিক বিশ্লেষণে এবং ব্যাখ্যায় তাদের জীবন্তও করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে দূর বা অদূর ভবিষ্যতে মানব-সভ্যতা কোন্ লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হবে তারও অভ্রান্ত ইঙ্গিত ক্ষণে ক্ষণেই প্রদান করেছিলেন স্বামীজী।

অবশ্য, নিবেদিতার কাছে বিবেকানন্দ প্রতিভার এ-সব প্রকাশ কোন খণ্ডিত বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল না। তারা ছিল এক অখণ্ড,

অবিভাজ্য জীবনের অংশ, এক দ্যুতিময় জীবন-মাল্যের মণিগণা ইব।…

কিন্তু আশ্চর্য এই যে সে-জীবনের যথার্থ উৎসমুখটি তখনও রহস্যাবৃত ছিল, অজ্ঞাত ছিল। আর এখন অকস্মাৎ একদিনের একটি ঘটনা, সে রহস্যটুকুকে যেন অপসারিত করে দিল।…

সেদিন কথা উঠেছিল নরমাংসাশীদের নিয়ে।—পৃথিবীর কোন কোন অংশে এমন মানুষও আছে—যাদের পক্ষে নরমাংস ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সে কথা শোনা মাত্র স্বামীজী কিভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, বহুদিন নিবেদিতার মনে সে স্মৃতি জাগরূক ছিল।

অতি কঠিন প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন,—'না, একথা সত্য নয়। ধর্মান্ধ না হলে কিংবা যুদ্ধোন্মাদনায় প্রতিহিংসাপরায়ণ না হলে মানুষ কখনো নরমাংস ভোজন করেনা।'…

'No, that is not true.—No nation ever ate human flesh, save as a religious sacrifice, or in a war, out of revenge'…

নিবেদিতার আত্মচরিতে আছে—সেদিন, স্বামীজীর ঐ উক্তিটি থেকেই সহসা যেন তাঁর হৃদয়ের গোপন রহস্যটি নিবেদিতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা এতদিনের এত ঘটনা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি।…

'It was his love of Humanity and his instinct on behalf of each in his own place, that gave to the Swami so clear an insight.'

ঐ মানব-প্রেম, ঐ বিশ্বপ্লাবী ভালবাসা,—বিবেকানন্দ জীবন-গীতার ঐটিই মূল সূত্র, ঐটিই মূল সুর।…আর, সমগ্র জাহাজ জীবনটিই ছিল সেই সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মুখরিত।…

জগতে ইচ্ছাশক্তিই মুখ্যবস্তু, এবং এই ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে উঠবে যদি আত্ম-পর সকলকে আপন করে নিতে পার।…

'Will is the one thing in the world that we admire,…It grows stronger by absorption.'

স্বার্থপরতা অবশ্য বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তিতে সুখ নেই। জীবনানন্দের কোন আস্বাদ স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়ে পাওয়া যাবে না।…

হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ, কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?

এই তো সহজ কথা!

আমার নিজ জীবনে দেখেছি, যখনই কোন বিষয়ে স্বার্থের স্পর্শ লেগেছে তখনই হিসাবেও গরমিল হয়েছে, সিদ্ধান্তেও ভুল হয়েছে। এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি কখনো।…আবার যেখানে স্বার্থের স্পর্শ ঘটে নি সেখানে আমার বিচার বুদ্ধি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।…

'I find that whenever I have made a mistake in my life, it has always been because Self entered into the calculation. Where self has not been involved my judgment has gone straight to the mark.'

সে জন্য আমার মনে হয় যে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটি হওয়া উচিৎ শুধু গুণগান, শুধু অকুণ্ঠ প্রেম-নিবেদন। শুধু ভক্তি-বিনম্র চিত্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ!

'All praise and thanks. If only we were rid of self.'…

তিনিই পরম গুরু, তিনিই পরমাশ্রয়। তাঁকে প্রণাম করি।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই বিবেকানন্দের জীবনবাদ।

*　　　*　　　*

আবার একদিন। সেদিনও এ ধরণেরই একটি প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন,—দেখ নিবেদিতা, সমগ্র জীবনটির দিকে তাকিয়ে দেখ।

'The whole of life is only a swan song !' আর তার মূল কথাটি হচ্ছে :

'The lion, when stricken to the heart, gives
out his mightiest roar.
When smitten on the head, the cobra lifts
its hood.
And the majesty of the soul comes forth,
Only when man is wounded to his depths.'

*　　　*　　　*

এ সময়ই একদিন, তখন জাহাজ মধ্যসমুদ্রে, নূতন কোন দেশের তটরেখা আর দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে না, নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন,...

স্বামীজী তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে, দেশেরও উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন কিনা।

'Whether he was guilty of putting his sect above his country.'

উত্তরে স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় হাঁ বা না কিছু-ই না বলে সাধারণ ভাবে শুধু এই বলেছিলেন যে—

সমগ্র ব্যাপারটিই একটু বিচিত্র। এশিয়া খণ্ডের এটি একটি লক্ষণ। তবে এর তাৎপর্য অনুধাবন করবার মত অবসরও তাঁর নেই, মাথাব্যথাও তাঁর নেই।

'আমার মনোভাবই ঠিক এ ধরনের নয়। আমি দুঃখকে

ভালবাসি, ভয়ঙ্করকে ভালবাসি। অন্য কোন কারণে নয়, only for its own sake.'

সত্য মূল্য না দিয়ে জীবনের কোন সম্পদ আহরণ করা যায় না। হিপক্রিসি দিয়ে আধ্যাত্মিকতা হয় না। সুতরাং,

I am not one of those
Who put the garland of skulls round
Thy neck,
And then look back in terror
And call thee 'The Merciful'!

অপার সংগ্রামই জীবনের পাথেয়।

অতএব সংগ্রাম কর। অবিরাম সংগ্রাম কর।

'জয়-পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।'

Fight and fight on, though always in defeat···

এই আমার কথা।

আরও একটি বিষয় অনুধাবন করতে চেষ্টা করো,—শুধু মানবাত্মার নয়, সকল আত্মার সমষ্টিই সগুণ ঈশ্বর। সেই-ই বিরাট। সে বিরাটের ইচ্ছাও বিরাট। তাকে প্রতিরোধ করা যায় না। তাকে বিধির নিয়ম বা বিধান বলে আমরা মান্য করি, গ্রহণ করি।

শিব, কালী প্রভৃতির অর্থও তাই।

নিবেদিতা বলতেন, স্বামীজীর সে সব বাণী, সে সব তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আমার সমগ্র জীবনটিকেই তখন রসপূর্ণ করে দিয়েছিল। জগতের যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু শোভাময় তা যেন অধিকতর কমনীয় হয়ে, অধিকতর লাবণ্যময় হয়ে আমার দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল।···

স্বামীজীর কাছেই শিখেছিলাম এই অনুপম সত্য যে, সৌন্দর্য বাইরের জিনিষ নয়। কোন বস্তুর উপর সে নির্ভর করে না।

বস্তু-নিরপেক্ষ সে সম্পদ আমাদেরই অন্তরের নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে থাকে। সেই তার সূতিকাগৃহ।···

আজ কতদিন অতীত হয়ে গেল, তবু সেদিনটির কথা মনে পড়ে —যেদিন প্রায়ান্ধকার রক্ত-সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে আমাদের জলযান সিসিলির সমীপবর্তী হয়েছিল। অপরাহ্ণের সোনালী রৌদ্র সমুদ্রের বক্ষ থেকে দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। নির্মেঘ পাণ্ডুর আকাশে মহাশান্তি যেন ধ্যান-নিমগ্ন। দূরে অগ্নিগর্ভ এট্‌নার শিখরদেশ দেখা যায়।

আমি স্বামীজীর পাশে সন্তর্পণে ডেকের উপর হাঁটছি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনবার জন্য, ধরে রাখবার জন্য আমার উৎকণ্ঠার অবধি নেই।

অনতিবিলম্বে সূর্য অস্তমিত হল। চন্দ্র-কিরণ-ধৌত মেসিনা প্রণালীতে প্রবেশ করল আমাদের জাহাজ।···

মেসিনা, মেসিনা!···এক রূপকথার কল্পলোকের সে দেশ! স্বামীজী কিছুক্ষণ হিরাকসের মত পিঙ্গলবর্ণ দূর পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ মেসিনা প্রণালীর সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলেন অপলকনেত্রে, তারপর সহসা বলে উঠলেন—

ঐ মেসিনা, ঐ সুন্দরী মেসিনা! সে আমাকে ধন্যবাদ দেবে, কৃতজ্ঞতা জানাবে। কারণ, আমারই অন্তরের রস দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে ঐ অতুল সৌন্দর্য তাকে আমি দান করেছি। আমি ছাড়া তার সৌন্দর্যের অস্তিত্ব কোথায়, ভিত্তি কোথায়?

'Masina must thank me! It is I who give her all her beauty.'···

সকল সৌন্দর্যের এই তো জন্ম-ইতিহাস!

সে দিন, সেই বিচিত্র ক্ষণটিতেই তপস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন নিবেদিতা!

তপস্যা কি? যথার্থ তপস্যার সংজ্ঞা কি, তাৎপর্য কি? কি

ভাবেই বা তার সার্থক প্রয়োগ ঘটে জীবনে। উত্তরে স্বামীজী সংক্ষেপে বলেছিলেন—

মৃত্যুকে পূজা কর, ভীষণকে পূজা কর। আর সবই বৃথা। আর সবই নিরর্থক। তবে এটি ভীরুর কাকুতি নয়। দুর্বলের বা আত্মঘাতীর মৃত্যুকে ভালবাসা নয়।

It is the welcome of the strong man, who has sounded everything to its depths and knows that there is no alternative.

কাজেই,

'Worship the terrible ! Worship Death'—

এই-ই চরম শিক্ষা, এই পরম তপস্যা !

* * * *

এই জাহাজ-যাত্রার দিনগুলিতেই বহু মহৎ জীবনের মহতী কথাও শ্রবণ করেছিলেন নিবেদিতা। সিদ্ধযোগী পওহারী বাবা, শিব-বিগ্রহ ত্রৈলঙ্গস্বামী, রিক্ত-বিত্ত রামভক্ত রঘুনাথ—এঁদের অনবদ্য জীবন-কাহিনী স্বামীজীর স্বকীয় অভিজ্ঞতার আলোকে অপূর্ব গৌরব-মহিমায় নিবেদিতার কল্পনার সম্মুখে বিকশিত হয়েছিল।

একদিন শুনেছিলেন অজ্ঞাত-পরিচয় এক কুলবধূর আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকাটি এইরূপ :

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন দক্ষিণেশ্বরে। ভক্ত-সমাগমে দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দির তখন অহোরাত্র মুখরিত থাকে। সেই সময় একদিন একটি গাড়ীতে করে একটি অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা বধূ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই তাঁর প্রথম আগমন। কেউ তাঁকে চেনে না, ইতিপূর্বে কেউ তাঁকে দেখেনি।

কিন্তু তাঁকে দেখবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিনতে পেরেছিলেন। একবার মাত্র তাঁর দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন ইনি বিদ্যাশক্তির অংশ।

নিবেদিতার ভষোয়—'a fragment of the Madonahood of the worlds'—এঁকে সম্মান করতে হবে, শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

তারপর তাঁকে ধূপধুনা ও পত্রপুষ্প সহযোগে সত্য সত্যই পূজা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আর সেই পূজার সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছিলেন সেই রমণী। সে সমাধি স্থায়ীও হয়েছিল দীর্ঘ সময়। সমাধি ভঙ্গের পর বিশেষ যত্নে ও সাবধানতায় তাঁকে গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নাম, পরিচয়—কেউ জানে না, কেউ প্রশ্ন করবার কথাও ভাবে নি। আর কখনো তিনি দক্ষিণেশ্বর আসেন নি, তাঁর কথা কিছু শোনাও যায় নি। অকস্মাৎ তাঁর আবির্ভাব,—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা-স্পর্শ লাভ করে আবার অকস্মাৎ তাঁর বিলুপ্তি। কিন্তু তথাপি, 'like some beautiful legend'—তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে।···

এ সব পরলোকগত মহাপুরুষদের কথা-প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন নিবেদিতার মনে উদিত হয়েছিল এবং প্রশ্নটি তিনি স্বামীজীর কাছে এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন:

যে সব জীবন চিরদিনের মত এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে, যারা আজ শুধু অতীতের অন্তহীন নীলিমায় নক্ষত্রের মত দ্যুতিমান, —বাস্তব নয়, প্রত্যক্ষ নয়, তাদের কতটুকু স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, কতটুকু প্রভাব জাগ্রত অনুভূতির মধ্যে আনয়ন করা মানুষের সাধ্য? নিবেদিতার ভাষায়—

'I wanted to know whether, even in lives so far as theirs, it might perhaps be possible to forget the great experience of a day long years ago, so that the memory of the great Teacher and his touch would become to them also a far-away incident. a story heard in a dream, even as their visits had become to those who saw them pass.'

তখনও ধর্মের যে-সব জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া 'নিহিতং গুহায়াং' সে সব বিষয়ে সম্যক অবহিত হয়ে ওঠেন নি নিবেদিতা। স্বামীজীও হয়ত তাঁর মনের অস্পষ্টতা, নিবেদিতা নিজে যাকে বলতেন—'my mental twilight' সেটিকে যথাযথভাবে ধরতে পারেন নি। তাই উত্তরে শুধু বলেছিলেন,—

যাঁরা দৈব-পুরুষ বা অধিকারিক পুরুষ—তাঁদের স্পর্শ ছেলেখেলা বা কৌতুকের বস্তু নয়। তাঁদের স্পর্শে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে, নবজন্ম লাভ হয়। তাঁদের বীক্ষণে মোহ যায়। তাঁদের অব্যর্থ শক্তি কালক্ষয় করে বয়ে যায় যুগ থেকে যুগে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে। মানবগোষ্ঠীর বংশরক্তে তারা সক্রিয় থাকে। অতএব, তাঁদের টাচ্—'far away incident' মাত্র নয়।···

ধর্মের অনুভূতি তপস্যার পথ ধরে ধীরে ধীরে আসে। আত্ম-নিবেদনের দুর্গম পথে তার আবির্ভাব হয় নিঃশব্দ-চরণ।—যদিও আকস্মিক ব্যাপারও এ জগতে যে একেবারে নেই তাও নয়। তবে সে হচ্ছে ব্যতিক্রম, সাধারণ বিধি নয়। সে সব ক্ষেত্রে—বিদ্যুৎ-চমকের মত তত্ত্বের স্ফূরণ হয়। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে—'the thing comes in a flash'.

এই সূত্রেই নিবেদিতাকে নূতন করে স্বামীজী শুনিয়েছিলেন এ যুগের সাধন-মন্ত্র—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

আর বলেছিলেন,—'এই মন্ত্রটির মধ্যে সন্ন্যাসের নিগূঢ় তাৎপর্যও নিহিত। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বর্গ কামনা তুচ্ছ, স্বর্গ কামনা বর্জনীয়। তার পক্ষে—'the most stringent of stringent requirements is that he should renounce any thought of heaven'—

ত্যাগব্রত যে গ্রহণ করেছে, যে সন্ন্যাসী—সে যেন এ কথাটি কখনও বিস্মৃত না হয়, নিবেদিতাও যেন মনে রাখে এই নির্দেশ।···

তাই রেখেছিলেন নিবেদিতা, রেখেছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্তটি

পর্যন্ত। উত্তর জীবনে, তাই কোন এক প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—মুক্তির জন্য আমার কোন উদ্বেগ নেই। আমার এক চিন্তা—ভারতবর্ষ। আমার গুরুর জন্মভূমি এই দেশ। এর সেবার জন্য, এর উন্নতির জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগে আমি সক্ষম হলাম কিনা—সেই আমার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান।...

তবে সেদিন 'আত্মার মুক্তি আর জগৎ-কল্যাণ'—কর্মের এই দুইটি লক্ষ্যের বিষয়ও নিবেদিতা অবশ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

অপরকে সাহায্য করবার যথার্থ কৌশল কি? উপায় কি? আর যারা ব্রত-চ্যুত হয়, কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করে সে সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারে না—তাদেরই বা কি পরিণাম ঘটে?

সে দিন লোহিতসাগর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল জাহাজ। কাল ছিল একটি অতিক্রান্ত শান্ত-সন্ধ্যা, আর প্রশ্নের ভাষাটি ছিল,—

'What is the right method of helpfulness to others? and ···what becomes of those who failed to keep their vows?'

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী সাধারণতঃ নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রথমে উল্লেখ করতেন না। উল্লেখ করতেন শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত, উল্লেখ করতেন আপ্তবাক্যের নির্দেশ। কিন্তু তারপর তাদেরই সূত্র অবলম্বন করে নিজ অভিজ্ঞতার দু'টি-একটি উদাহরণ দিয়ে সমগ্র বিষয়টিকে জীবন্ত করে দিতেন। নিবেদিতা জানতেন স্বামীজীর এই স্বকীয় পদ্ধতি। তাই, প্রশ্ন দু'টি উত্থাপন করেই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। মুহূর্তে তাঁর কর্ণবিবরে প্রবেশ করল স্বামীজীর কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বর্গীয় সুর-ঝঙ্কার, যে ঝঙ্কার উত্তর জীবনে, একটু স্থির, শান্ত হয়ে বসলেই তিনি যেন শুনতে পেতেন—

'Even now, I hear the ring of his wonderful voice, repeating Arjuna's question':

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ় ব্রহ্মণঃ পথি॥

যে সকল মানুষ যোগাভ্যাস শুরু করে, নিষ্ঠার সঙ্গেই করে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সিদ্ধির সৈকত ভূমিতে পৌঁছাতে পারে না, মধ্যপথে থেমে যায়—হে কৃষ্ণ, তাদের কি পরিণাম ঘটে? তারা কি নষ্ট হয়ে যায়?···

অতীত যুগে এ-প্রশ্ন অর্জুনও একদিন উত্থাপন করেছিলেন। আর তারই উত্তরে উচ্চারিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের পরম আশ্বাস-বাণী।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

ভয় নেই, হে পার্থ, কল্যাণ-কৃৎ ব্যক্তি কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। কখনো নষ্ট হয় না।···

তবে কর্ম-পরিণাম? কর্ম-পরিণাম আছে বৈকি?, সেটি ধ্রুব, সেটি অনস্বীকার্য। কর্মফল যাথাকালে, যাথাসূত্রে উদিত হবে। তার অন্যথা হবে না। এক জীবনের অপূর্ণ কামনা জন্মান্তরে হলেও ফল প্রসব করবে।···

নিজ জীবনের দু'একটি পূর্বকাহিনী উল্লেখ করে উদাহরণও দিয়েছিলেন সেদিন। বলেছিলেন ঃ

'তখন আমি ছেলে মানুষ, অল্পবয়সের শিশুমাত্র। কিন্তু তখনই কোন সন্ন্যাসী ফকির দেখলে আমি আত্মহারা হয়ে যেতাম। হাতের কাছে যা পেতাম, তাই দিয়ে দিতাম। নিজে কৌপীন পরিধান করে, ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী সাজতে ভালবাসতাম।

আমার আত্মীয় স্বজনগণ বলতেন—আমি শিবের দানা, শিবের ভূত। পুনঃ পুনঃ সে-কথা শুনে আমার এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে

গিয়েছিল যে আমি শিবের ভূতই বটে! অত্যন্ত দুরন্তপনা করলে তাঁরা 'শিব, শিব' বলতে বলতে আমার মাথায় জল ঢেলে দিতেন। আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যেতাম।

এমন কি আজও, আমার এ পরিণত বয়সেও, আমার মাথায় যদি কোন দুষ্ট বুদ্ধি জাগে তবে সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে আর আমি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যাই। মনে মনে বলি—না, না—এবার আর নয়। No, not this time, not this time.'

এ বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর বিশাল নেত্রদ্বয় অর্ধ-নিমিলিত হয়ে এল, মৃদু থেকে মৃদুতর হল কণ্ঠস্বর। তারপরই গভীর নঃশব্দতা।...

উপরে স্তব্ধ নক্ষত্রখচিত আকাশ, নিম্নে ঈষৎ-তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র! কোলাহল মুখরা পৃথিবী দূরে, বহুদূরে অপসৃত।

স্বামীজীর পাদমূলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তপস্বিনী নিবেদিতা। জীবনের দুর্লভ পরম-মুহূর্ত সে সব, একবার ব্যর্থ হলে আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না।...

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানবুত্থিত স্বামীজী আবার কথা বলতে শুরু করলেন।...

'যত দিন যাচ্ছে, যত আমার বয়স বাড়ছে ততই আমি অনুভব করছি যে বৃহৎ কর্মের মধ্যে মহত্বের যথার্থ পরিচয় নেই। রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে ভীরুও সাহসী হয়ে ওঠে, অনুষ্ণ রক্তও উষ্ণ হয়। কিন্তু সেখানে মহত্ব কোথায়, বীর্য কোথায়?...

পরন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে নিরব-নিষ্ঠায় যারা নিরলস কর্ম-সাধনা করে চলেছেন, অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন নিজকে, তিলে তিলে, প্রহরে প্রহরে,—ফিলিপ সীড্নীর মতো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তটিতেও অপরের জন্য যাদের ব্যাকুলতার অবধি নেই, নিজ মর্মান্তিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে অন্যের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যাঁরা উৎকণ্ঠিত—যথার্থ মহত্ব তাঁদেরই মধ্যে, তাঁদেরই অন্তরের

মণিকোঠায় প্রচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করে। সেখানেই তাকে খুঁজতে হবে।'...

এমনি মহামূল্য উপদেশ-শতকে সমৃদ্ধ হয়েছিল অর্ধপৃথিবী পরিক্রমার দিনগুলি এবং সেইজন্যই নিবেদিতার কাছে এই যাত্রা তীর্থযাত্রারই মত পবিত্র হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল :

'Even a journey round the world becomes a pilgrimage, if one makes it with the Guru.'

শুধু তাই নয়, দিনে দিনে একথাটিও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে—স্বামীজীর এ সব বাণী-সম্পদ শুধু তাঁর জন্য নয়। তিনি উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে এক বৃহৎ ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠী।

একদিন আসবে, এবং সেদিনও খুব দূরবর্তী নয়, যখন বিবেকানন্দের পদানুগ হয়ে অসংখ্য নর-নারী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবন উৎসর্গ করবে।

এ সব মহৎ বাণী তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত। নিবেদিতার দায়িত্ব এদের ধারণ করা, যথাযথভাবে উত্তর-সাধকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।...

'For I knew that here I was but the transmitter, but the bridge, between him and that countless host of his own people, who would yet arise, and seek to make good his dreams'...

* * * *

আর একদিনের কথা। সেদিন অতি প্রত্যূষে এডেন বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছেছে জাহাজ। সেই সময় স্বামীজী নিবেদিতার কাছে তাঁর ভারতীয় কর্ম-কল্পনার মূল ধারাগুলি আরেকবার বিবৃত করেছিলেন। পুরাতন হলেও তাদের মধ্যে নূতনের সঞ্জীবনী রস মিশ্রিত ছিল, অনাস্বাদিত অনুপ্রেরণা ছিল।

আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা—নূতন ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে আপন

শক্তিতে গড়ে উঠুক। অন্যের অনুকরণে নয়, অন্যের উপর নির্ভর করে নয়।

প্রাচীনের উপকরণ আর বর্তমানের পদ্ধতি—এ দু'য়ের সংমিশ্রণে তার নব-যাত্রার সূত্রপাত হবে।

সে সংমিশ্রণটি একটি কঠিন ব্যাপার হলেও,—তাকে সম্ভব করতে হবে। আর শক্তির উৎকর্ষেই সেটি সম্ভব হবে।

এজন্য আমি শুধু উপনিষদের কথাই প্রচার করি, আর কিছু নয়। আবার উপনিষদেরও একটি মাত্র শব্দের উপর আমার অঙ্গুলি নির্দেশ সর্বাধিক—সে শব্দটি শক্তি, স্ট্রেংথ।

Strength and fearlessness—এই শব্দযুগলের মধ্যেই বেদ-বেদান্তের যাবতীয় শিক্ষা নিহিত।...

সেই অদ্ভুত পুরুষ, সেই বিচিত্র-চরিত্র সন্ন্যাসী - সিপাহী বিদ্রোহের সময় যাঁকে সৈন্যরা হত্যা করেছিল, আর যিনি অস্ত্রাহত হয়ে চিরদিনের মৌন ভঙ্গ করে শুধু এই কথাটি বলেছিলেন,—

তুমিও সেই, তত্ত্বমসি।...

আমার কাছে তিনিই আদর্শ জীবন, তিনিই আদর্শ চরিত্র।'

কাহিনীটি শুনে সে দিন নিবেদিতা স্বামীজীর গুরুদেব সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল—ঐ মৌনী সন্ন্যাসীই যদি স্বামীজীর চোখে আদর্শ পুরুষ হন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ? শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করা যাবে কি ভাবে? তাঁর চরিত-মহিমা চিত্রিত হবে কোন বর্ণ সুষমায়?...

এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটিই একটি প্রশস্ত পথ-স্বরূপ। আত্মভোলা এবং মগ্ন সে পুরুষ—নিজেই নিজকে জানতেন না, বুঝতে পারতেন না। ইংলণ্ডের কথা, ইংরাজী ভাষা—এসব তাঁর জানা ছিল না, 'Save that they are queer folk from over the sea.' কিন্তু এক অনন্য জীবন তিনি যাপন করে গেছেন। কখনো কারো

বিরুদ্ধে কোন কঠিন বাক্য তিনি প্রয়োগ করেন নি। সীমাহীন প্রেম আর সার্বভৌম মহাভাব, অতীতে ও বর্তমানে, গৃহে ও সন্ন্যাসে এক অভাবিত সমন্বয়—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। আমি সে অমৃত-রস-ক্ষরা জীবন-গীতার ভাষ্যই শুধু রচনা করে গেলাম আমার জীবনে।

এতকাল আমাদের দেশের ধর্মের মহাদোষ কি ছিল জান? সে কেবল দু'টি কথাই জানত। একটি ত্যাগ আর একটি মুক্তি। আর কিছুই তার চিন্তার মধ্যে আসত না।

কিন্তু এ জগতে শুধু কি মুক্তিই প্রয়োজন? গৃহীদের জন্য, বর্ণাশ্রমীদের জন্য আর কিছুই চাই না? কিছুরই প্রয়োজন নেই? আছে, অবশ্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এদের সকলের পরম ভরসা, পরমাশ্রয়।

সব আত্মাই তো স্বরূপতঃ এক, চরম গম্যস্থলও তো পৃথক নয়। তবে আর বৈষম্য কেন?…

এই দৃষ্টিকোণ্ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনটিকে অনুধাবন করতে হবে।…

কিন্তু যে শক্তির কথা বলছিলাম, সেটিই মূল কথা। আর শিক্ষার মধ্য দিয়েই সে শক্তি জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে, নান্যঃ পন্থা।…

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কেন্দ্রস্থ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, কেন্দ্রস্থ পুরুষ শ্রীবুদ্ধ!

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত সর্ব শাস্ত্রময়ী গীতা আমার কৈশোর জীবনে এক অপূর্ব প্রেরণার উৎস ছিল। নিয়মিত প্রতিদিন সে গ্রন্থ আমি পাঠ করতাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা-উপশিরায় এক অদ্ভুত স্পন্দন জাগ্রত হত। কী দুর্বার শক্তি, কী দুর্জয় বীর্যপ্রকাশ, প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে নিহিত!

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ॥

ওঠ, জাগ—তরঙ্গক্ষুব্ধ কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়। বিগতজ্বর হয়ে সংগ্রাম কর। আমি তোমাকে রক্ষা করব, সফলতার সৈকত ভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেব। ভয় নেই।

—এই তো গীতার সার কথা।···তাছাড়া গীতার সাহিত্যিক সৌন্দর্যও অতুলনীয়। বৌদ্ধ গ্রন্থরাজির উষরতার পর অমৃত-নির্ঝর গীতা হাতে পেয়ে দেশ যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।'···

তারপর আলোচনাটি আরও একটু এগিয়ে নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনদর্শনের তুলনাও করা যেতে পারে। সে তুলনায় এটাই প্রতিভাত হবে যে—

'In India, we have social communism with the light of Adwaita, ie spiritual individualism—playing on and around it; in Europe you are socially individualists, but your thought is dualistic, which is spiritual communism.'

মানুষ বড় হয়, অসামান্য হয়। কিন্তু শুদ্ধমাত্র গুণরাশীই তাকে বড় করে না, তার দোষগুলিও তাকে বড় হতে সাহায্য করে। কাজেই, কোন জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা ঠিক নয়– 'never seek to rob a nation of its character.'

ভারতবর্ষকে যদি তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে চাও তবে এ কথাটি তোমাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে—

'We Indians are man-worshippers after all. Our God is Man!'···

এই ভাবটিই ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাবধারার প্রধান, যদিও তার পুষ্টি এবং সম্প্রসারণ হয়ত ঠিক মত হয়ে ওঠেনি। সেটিই তোমাকে

করতে হবে। এ অনুভূতি নিয়েই কাব্য রচনা কর, শিল্প-সম্পদ গড়ে তোল। মধ্যযুগের ইউরোপ যেমনটি ছিল—ঠিক তেমনি ভাবে দীন দরিদ্রের উপাসনা কর।'...

এমনি শত শত অনবদ্য-প্রসঙ্গ, শত শত দুর্লভ দিব্য-অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে কেটেছিল তরঙ্গক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের বুকের সেই দিনগুলি। নিবেদিতা তাই বলতেন—গুরুর সঙ্গে, গুরুর সহাযাত্রীরূপে নিছক দেশ-ভ্রমণও শেষ পর্যন্ত মহৎ তীর্থযাত্রায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

উত্তরজীবনে, মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত এই সমুদ্র-যাত্রার দিনগুলির পুণ্যস্মৃতি মনে উঠত নিবেদিতার। কত স্মৃতি অস্পষ্ট হয়েছে, কত কথা একেবারে বিলুপ্তই হয়ে গেছে জীবনে। কিন্তু অনন্ত মহা-সমুদ্রের বুকের প্রসন্ন প্রভাতগুলি, নিস্তব্ধ, ধ্যান-উন্মুখ সন্ধ্যাগুলির স্মৃতি অক্ষয়। শুধু রাজবংশ বা রাজ্য-রাজধানীর ইতিহাস নয়, শুধু হিক্‌স্‌ বংশ, ফারাও বংশ, গ্রীস-রোমের প্রাচীন ইতিকথা নয়, পরন্তু তাদের অতিক্রম করে সাধারণ নর-নারীর সুখ-দুঃখের, হাসিকান্নার যে অলিখিত কাহিনী,—ইতিহাসে স্বীকৃত নয়, অথচ মহাকালের মহা-মিছিলের মধ্যে নিত্য মুখরিত, তাদের বিচিত্র বিশ্লেষণে নিবেদিতার সম্মুখে এক নূতন জগতের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কথা পূর্বেও বলেছি।

সূর্যের দৈনন্দিন আবর্তনে অসীম আকাশের বুকে যেমন আলো-অন্ধকারের উদয়াস্ত ঘটে, মহাকালের পার্শ্ব পরিবর্তনেও তেমনি যুগে যুগে আলো-ছায়ার প্রকাশ এবং বিলুপ্তি ঘটছে। আর এই মহালীলার কেন্দ্র-বিন্দুতে সর্ব মহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন এক দেবতা, —নরদেবতা। সত্যের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী, সত্যমেব জয়তে। দুঃখের অমা-রাত্রি শুধু কল-কাকলি ভরা প্রভাতের অগ্রদূত।...

সুতরাং, মানুষেরই জয় গীতি করিও রচনা।
সেই ধর্ম, সেই আরাধনা।

এই বিপুলা পৃথিবীতে নিরবধি কাল ধরে—একদল মানুষ বাহু

প্রকাশকে মুখ্য ভেবেছে এবং তাকেই অগ্রাধিকার দান করেছে। আবার আর একদল ভিতরের ভাবটিকে, সূক্ষ্ম আইডিয়াকে প্রাধান্য দিতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু কোন্‌টি আগে? পাখি আগে, তারপর ডিম; না ডিম আগে, তারপর পাখি? পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র?—এ সমস্যার কি সমাধান আছে?

কাজেই, ছেড়ে দাও এ-বিচার।

'Give it up and escape from Maya!'

অর্ধ-পৃথিবী পরিক্রমার এই শেষ শিক্ষা, এই পরম উপদেশ। নিবেদিতা তাই বলেছিলেন,—

'To this voyage of six weeks I look back as the greatest occasion of my life.'

॥ নয় ॥

জুলাই মাস।

সে মাসেরই শেষদিনে জাহাজ ভিড়ল টিল্‌বেরী বন্দরে!

মৌসুমী বায়ুর বিরুদ্ধতার জন্য সাধারণ সময়ের চাইতে অনেকটা বেশী সময় লেগেছিল এবার ইংলণ্ডে পৌঁছাতে। সেখানে তখন কর্মবিরতির অবকাশ, ভ্যাকেশন টাইম। স্বামীজীর পূর্ব-পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই ইংলণ্ডের বাইরে। নিবেদিতার মা সে সময়টায় তাঁর আত্মীয় পরিজন সহ উইম্ব্‌লডনে, ২১ নং হাই-স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে বাস করছেন। নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে স্বামীজী এবার তাঁরই অতিথি হয়েছিলেন। ফলে, নোবেল পরিবারের অনেকের সঙ্গে এ যাত্রায় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

এ-সময় মিস্ গ্রীন্‌স্টাইডেল্,—যিনি পরে ভগিনী ক্রিশ্চিন নামে ভারতবর্ষে পরিচিতা হন—তিনিও ছিলেন ইংলণ্ডে এবং নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও এ-সময়টিতেই সংঘটিত হয়েছিল। ক্রিশ্চিনের কথা অবশ্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

মাত্র দুই সপ্তাহ ইংলণ্ডে অবস্থান করে স্বামীজী এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার সমুদ্রপথে নিউইর্ক যাত্রা করলেন—আগষ্ট মাসের ১৬ই তারিখ। আর, নিউইয়র্কে পৌঁছাবার অব্যবহিত পরেই, লিগেট-দম্পতির সনির্বন্ধ অনুরোধে, হাড্‌সন নদীর তীরে তাঁদের এক মনোরম পল্লী-ভবনে গমন করলেন। ভবনটির নাম 'রিজলি ম্যানর'। স্বামীজীর পুণ্য জীবনাখ্যায়িকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই 'রিজলি ম্যানর' আজ বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

এদিকে, স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পর নিবেদিতা কতগুলি অপরিহার্য পারিবারিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেন ইংলণ্ডে,— বিশেষ করে কনিষ্ঠা ভগিনী মেরীর বিবাহ উপলক্ষ্যে।···

সে সব কাজ সম্পন্ন করে একমাস অন্তে, নিবেদিতাও পোঁছালেন আমেরিকায় এবং সেই 'রিজলি ম্যানরেই' আবার কিছুদিন, সেপ্টেম্বরের শেষভাগ থেকে নভেম্ববেব প্রথমভাগ পর্যন্ত, প্রায় ছয়-সাত সপ্তাহ, স্বামীজীর সান্নিধ্যে তিনি অবস্থান করেছিলেন।

প্রথমে একই বাটীতে, পরে নিকটস্থ আর একটি নির্জন কুটীরে, নিবেদিতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর কঠোর জীবন যাপন করতেন – এই দিনগুলিতে। দীর্ঘ দিন স্বামীজীর সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে চিন্তার যে অমৃত-সম্পদ তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, যে বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান তিনি লাভ করেছিলেন, এখন যেন তাদেরই রোমন্থন ও স্বাঙ্গীকরণের প্রয়োজন ছিল।

সেদিক থেকে 'রিজলি ম্যানরে'র শান্ত দিনগুলি নিবেদিতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তবে সে ছিল ধনীর গৃহ। স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের উপকরণে পরিপূর্ণ একটি প্রশস্ত স্বাস্থ্য-নিবাস। তার উপর স্বামীজীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য লিগেট-দম্পতির আগ্রহও ছিল সীমাহীন। সুতরাং, আহার-বিহারেব অতি-প্রাচুর্যে 'রিজলি ম্যানরে'র জীবনধারা নিবেদিতার তখনকার মনোভাবের, আর শুধু তখনকারই বা বলি কেন, কোন দিনের মনোভাবেরই অনুকুল ছিল না। সে জন্য মূল গৃহটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একটি নিঃসঙ্গ কুটীরে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় ও ধ্যানে তিনি নিরত হয়েছিলেন। এতে স্বামীজীর প্রসন্নতার অবধি ছিল না এবং তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আসত নানা পথে, নানা সূত্র অবলম্বনে।···

একদিন এই 'রিজলি ম্যানরে'ই, ভাবাবিষ্ট হয়ে, একখণ্ড গৈরিক উত্তরীয় তিনি নিবেদিতাকে প্রদান কবেছিলেন, সন্ন্যাসের প্রতীক রূপে, পরার্থে-উৎসর্গীত জীবনের চিহ্নরূপে।

ব্রহ্মচর্য-দীক্ষার বিবৃতি প্রসঙ্গে সে-কথা ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।...

'রিজলি ম্যানরে'র তপস্যা-সার্থক দিনগুলির প্রত্যক্ষ পরিণাম, নিবেদিতার প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ, Kali the Mother। কিঞ্চিদধিক একশত পৃষ্ঠায় গ্রথিত হয়েও সে গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক জগতের এক অতুলনীয় সম্পদরূপে স্বীকৃত। যে বীরেশ্বর শিবের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়ে একদা দেবী ভুবনেশ্বরী বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে লাভ করেছিলেন পুত্ররূপে, সেই বীরেশ্বরের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানি উৎসর্গীত, —'To Vireswar—Lord of Heroes'—গ্রন্থারম্ভে এই শব্দ কয়টি চোখে পড়ে।

* * *

কালী ভারতীয় চিন্তাধারার এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। পাশ্চাত্য মন এর যথাযথ তাৎপর্যটি সহসা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা। অথচ, সাধনার দুর্গম পথে মানুষ যত এগিয়ে যাবে, যত বিসর্জন দেবে অহংবুদ্ধি ও অভিমান ততই সে সরল হবে, ভাগবৎ-নির্ভরতা লাভ করে ধন্য হবে। মাতৃ-মন্ত্রের এইটিই নিগূঢ় মর্মকথা।... "

'The soul that worships becomes always a little child: the soul that becomes a child finds God offenest as mother.'

এই দিক থেকে কালী মূর্তির বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা তাঁর ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটিতে

'পিতা'রূপে ভগবানকে মানুষ কল্পনা করেছে, সম্বোধন করেছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্মে।

সেমিটিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। নিবেদিতা তাই বলেছিলেন:

'It was the Semitic mind that flashed across the

dim communing of the soul with the Eternal, the rapturous illumination of the great word 'Father.'

কিন্তু আর্য-চিন্তাধারাব বৈশিষ্ট্য একটু স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত। এখানে, শুধু পিতারূপে নয় মাতারূপেও তিনি বন্দিত এবং পূজিত। মাতৃ-প্রতীক সর্বকালেব জন্য গৃহীত। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যীশুমাতা মেরী অবশ্যই এক অতুলনীয় মর্যাদাব আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু কালী-কল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপাব। নিবেদিতাব মানস-মুকুরে সে কল্পনাব প্রতিফলনও এক মহাবিস্ময়।

কালী করাল-বদনা, নগ্নিকা, মৃত্যুরূপা ভযঙ্করী, তথাপি, হিন্দুব ধ্যান-নেত্রে তিনি অতুলনীয়া।

'Others we admire, others we love! but to Her we belong.

Life is but a game of hide and seek with Her, and if, in its course, we chance to touch Her feet, who can measure the shock of the divine energy that enters into us ?'—এই হিন্দুব অন্তবেব আবেদন।

যুগে যুগে এই মহাশক্তিব প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শন লাভ করেছেন ভারতীয় সাধককুল। শ্রীরামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ—বিচিত্র তাঁদের জীবন-কথা, বিচিত্র তাঁদেব সাধনা ও সিদ্ধি। তাঁরা শুনেছেন কালীর কণ্ঠধ্বনি, লাভ করেছেন তাঁর অব্যর্থ আশীর্বাদ-পরশ।

তাই তাঁরই পাদমূলে নিঃশেষ আত্মনিবেদনের ঐকান্তিক প্রয়াসই তাঁদের জীবন-সাধনা।

মা, আমাকে গ্রহণ কর। সর্বরিক্ত আমি উদাসীন, আমাকে আশার আলোতে উদ্দীপ্ত কর।

চক্ষু মোর অশ্রুভারে অন্ধ হয়ে গেছে—
দেখিতে না পাই।

তোমার আহ্বান ঐ ধ্বনিছে আকাশে
কেন আর পিছনে তাকাই?

'Mother, I yield. Take me. I pray thee into thine own heart. Let me not look back. If thou will call me I shall find my way there, surely, though my eyes now are blind with tears.'…

'রিজলি ম্যানরের'—ধ্যান-তপস্যার এই সব ছিল আংশিক অভিব্যক্তি।

মাতৃমন্ত্র সার্থক-সাধনা, মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে—এই ছিল নিজ আচার্যদেবের কাছে নিবেদিতার চরম নির্দেশ লাভ।

এরপর, নভেম্বরের প্রথম দিকেই স্বামীজী নিউইয়র্ক এবং তৎসন্নিকটস্থ কয়েকটি স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আর তার দু'দিন পর নিবেদিতাও যাত্রা করলেন শিকাগোর উদ্দেশ্যে।

শিকাগোতে আবার স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঐ নভেম্বর মাসেরই শেষ দিকে, কালিফোর্নিয়া যাত্রার পথে।

পরবর্তী জুলাইমাসে, অর্থাৎ সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে আরও একবার অল্প কয়েক সপ্তাহের জন্য স্বামীজীর দর্শন লাভ ঘটেছিল নিবেদিতার। উভয়েই তখন নিউইয়র্কে।…

এর পর প্যারিসে। অবশ্য সেখানেও বেশী দিনের জন্য নয়। সর্বশেষ, সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটানিতে, স্বামীজীর সান্নিধ্যে পক্ষকালের জন্য দিন যাপন।…

*　　*　　*

ব্রিটানি। ব্রিটানিও ঠিক নয়, ব্রিটানির অন্তর্গত লানিয়ঁ নামক সমুদ্র-উপকূলের এক ক্ষুদ্র জনপদ। শহরের কোলাহল থেকে দূরে বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অশান্ত গর্জনের পার্শ্বে একটি ভাব-গাম্ভীর্যে আচ্ছন্ন যেন লানিয়ঁ। স্বামীজীর অন্যতম অনুরাগী ভক্ত মিসেস

বুল—তখন সেখানে বাস করছিলেন। আর তাঁরই আমন্ত্রণে প্রথমে নিবেদিতা এবং পরে স্বামীজীও সেখানে গমন করেছিলেন। তবে সে পক্ষকালের জন্য মাত্র। কারণ, পক্ষকাল পরে প্রথমে নিবেদিতা রওনা হলেন ইংলণ্ডের পথে, পরে স্বামীজীও যাত্রা করলেন ভারতবর্ষ অভিমুখে।...

গুরু-সান্নিধ্যের সুদুর্লভ দিনগুলি নিবেদিতার জীবনে এ ভাবেই শেষ হয়ে গেল। এর পর যখন দেখা হল তখন শুধু শেষ বিদায়ের জন্য, শুধু অন্তিম আশীর্বাদ লাভের জন্য।...

'So ends the priceless memory of the years of my schooling under him. For when I next saw my Master, in India in the first half of 1902, it was only to receive his final blessing and take a last farewell.'

...এই ব্রিটানিতে স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্ব-সন্ধ্যায় নিবেদিতার জীবনে এক বিচিত্র মধুর অভিজ্ঞতা উপস্থিত হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাঁর 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে।—

সেদিন হঠাৎ নৈশভোজের অব্যবহিত পরে লতা-পাতায় ঘেরা তাঁর ছোট পড়বার ঘরের দরজায় স্বামীজীর কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। তখন রাত্রির প্রথম প্রহর, তমসাবৃত ব্রিটানির আকাশ। চারদিকে প্রগাঢ় নিরবতা। বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্বামীজী ডাকছেন নিবেদিতাকে, সঙ্গে জনৈক বন্ধু।

নিবেদিতা কাছে এলে স্বামীজী বললেন,—দেখ, মুসলমানদের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে। জনশ্রুতি এই যে সে সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত গোঁড়া, অত্যন্ত ফ্যানাটিক্। কোন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। দিয়েই বলে,—যদি আল্লা তোমাকে পয়দা করে থাকেন তবে তুমি

মরে যাও। আর যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি তবে বাঁচ, তুমি বাঁচ।

'If God made thee, perish! If Ali made thee, live!'

সেই ফ্যানাটিক মুসলমানরা তাদের শিশুদের উদ্দেশ্যে যে-কথা বলে থাকে, আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে, সে কথাটিই ঠিক বিপরীত দিক থেকে, in the oppsite sense, আমি তোমাকে বলছি।...

যাও কন্যা. কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। সংগ্রাম-মুখর এই সংসার— তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি তবে সেখানে, সে সংগ্রাম ক্ষেত্রে তুমি বিনষ্ট হবে। আর যদি বিশ্ব-জননী মহামায়া স্বয়ং তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন তবে, তবে তুমি চির-আয়ুষ্মতী হও, দীর্ঘকাল বেঁচে থাক।

'Go forth into the world, and there, if I made you, be destroyed! If Mother made you live!'...

এই বলে ধীরে ধীরে স্বামীজী নিজ শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান করলেন।

পরদিন প্রত্যূষেই স্বামীজীর নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন নিবেদিতা। যাত্রা করেছিলেন ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গুরুর সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা, শেষ বিদায়-গ্রহণ—the final farewell.

এর কতকাল পরে, স্বামীজীর দেহত্যাগেরও বহুবৎসর অন্তে এই বিদায়ক্ষণটির স্মৃতিকথায় নিবেদিতার চক্ষু সজল হয়ে উঠত। সমগ্র চেতনাই যেন বিগত অতীতের এক করুণ স্বপ্নে উদাস হয়ে যেত।

কল্পনার চক্ষে ভেসে আসত লানিয়োঁর সে নির্মেঘ প্রসন্ন আকাশ, প্রভাত-সূর্যের রক্তিমাভায় সবে মাত্র সে উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। বাতাসে এক স্নিগ্ধ মাদকতা। গ্রাম-পথে পণ্যবাহী শকটগুলি ধীর

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। দূরে, পথের এক পার্শ্বে স্বামীজীর উন্নত, দীর্ঘ বপুখানি—অমিতবীর্য এক পুরুষ-সিংহের পূর্ণাবয়বের মত দেখা যায়—'a man of Mongolian jaw, a man of bull-dog tenacity?'

তাঁর দক্ষিণহস্তটি উর্দ্ধদিকে প্রসারিত—আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, অভিবাদনের ভঙ্গীতে। সমগ্র মুখমণ্ডলে স্নেহ ও করুণার এক স্বর্গীয় মহিমা, কণ্ঠে ঈষৎ-ব্যক্ত ভারতবর্ষের এই মর্মবাণী—

'Not the soul for nature but nature for the soul'···

বিস্মৃত হয়ো না এ সত্যটি, বিস্মৃত হয়ো না জীবন-গীতার এই মহা পংক্তিটি।

পণ্যবাহী গাড়ীতে দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মান সে দৃশ্যটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছেন নিবেদিতা। ভবিষ্যৎ জীবনের কত সংকটময় দিনে, দুঃখভার-নত কত উদাসীন সন্ধ্যায়, কর্মমুখর কত মধ্যাহ্নে দেখতে পেতেন সেই অপরূপ দৃশ্যটি, শুনতে পেতেন স্বামীজীর সেই গম্ভীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর।

'Thou Mother of blessings,
Thou the Giver of desires,
Thou the Doer of all good,
To thee our salutation.
Thee we salute, Thee we salute,
Thee we salute.'···

এদিকে, নিবেদিতার ব্রিটানি ত্যাগের অব্যবহিত পরেই স্বামীজীও ত্যাগ করেছিলেন ব্রিটানি। পথে প্যারিস হয়ে—ভিয়েনা, হাঙ্গারী ও সার্ভিয়া পরিভ্রমণ করে তিনি গমন করেছিলেন কায়রো, এবং কায়রো থেকে সহসা, পূর্বাহ্ণে কাউকে কোন সংবাদ না দিয়ে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এসেছিলেন বাংলায়—সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে।

আর তারপর থেকেই নিবেদিতার একক জীবনের একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল।

শুধু দেহের দিক থেকেই নয়, অন্তরের দিক থেকেও স্বামীজী এখন দূরে, বহুদূরে অবস্থিত। একটি দুর্ভেদ্য আবরণ তাঁকে যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য করে তুলছে। মৃত্যুর মহাপ্রস্তুতির জন্য ধ্যানমগ্ন সে মহাপুরুষ—কারো প্রতি আর তাঁর কোন দায়িত্ব নেই, আদেশ নেই, নির্দেশ নেই।

'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া',—হে শিব হে শিব, আমাকে পারে নিয়ে চল প্রভু!—

এখন শুধু এই প্রার্থনাই তাঁর সমস্ত অন্তরের একমাত্র আবেদন। কর্মকোলাহল শেষ হয়েছে এবারের মত, এ জগতের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে ছায়াবাজীর মত মিলিয়ে যাচ্ছে—এখন, দেহ থাকতে থাকতেই মুক্তি আসুক অথবা দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হোক,—পুরানা বিবেকানন্দ আর ফিরে আসছে না কোন অবস্থাতেই।...

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের শেষাংশের সবটাই এই মনোভাবে রঞ্জিত।...

নিবেদিতার ভাষায়—

'The outstanding impression made by the Swami's bearing during all these months of European and American life was one of almost complete indifference to his surroundings.'

Both victory and defeat would come and go. He was their witness.'

স্বামীজী নিজেই এ-মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন নিবেদিতাকে—

আর আমি কারো প্রতিনিধি নই, কারো কাছে কোন ঋণও

আমার নেই।···ভারতেই হোক আর পাশ্চাত্যদেশেই হোক, সবার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার শেষ হয়েছে।

তবে, তুমি যদি সত্যি জগতের দায়-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত হয়ে থাক তবে সর্বান্তঃকরণে সেটি গ্রহণ কর, সর্বতোভাবে গ্রহণ কর।

বিলাপ করো না, কাউকে অভিশাপ দিও না। কোন নিন্দার কথা, কোন সমালোচনাব কথা কখনো যেন উচ্চারিত না হয়।···

যে জগৎকে ভালবাসে—সে তাকে, শত ত্রুটি সত্ত্বেও, আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে এগিয়ে চলে। সেই তার জীবন-সাধনা, সেই তাব মানস-স্বপ্ন।

আরও একটি কথা তোমাকে বলব। আমি পূর্বেও কোনদিন তোমাকে ·।দেশ করিনি। আব আজ, আজ যখন এ-জগতের সঙ্গে সকল যোগসূত্র আমি ছিন্ন কবে বসে আছি, তখন তো আদেশ দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি শুধু এইটুকু বলব যে যতদিন নিঃস্বার্থ কর্মে তুমি লিপ্ত থাকবে, মহামায়ার মহতী সেবায় নিজকে উৎসর্গীত বাখবে—ততদিন তিনি তোমার পথ নির্দেশ করে দেবেন, হাত ধরে সকল দ্বন্দ্ব সমস্যার পরপারে উত্তীর্ণ করে দেবেন।'···মাভৈঃ।

ইংলণ্ড নিবেদিতাব পিতৃভূমি, সে দেশের মাটির সঙ্গে, সে-দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর রক্তের বংশানুক্রমিক সংযোগ রয়েছে। সুতরাং দীর্ঘ, অনিশ্চিত কালের জন্য একাকী সে দেশে অবস্থান কালে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হবে, পুরাতন সাহচর্যে নূতন সংস্কার অঙ্কুরিত হতে পারে—অন্ততঃ সে সম্ভাবনা আছে। তাই একথাও লিখেছিলেন, উদ্ধৃত পত্রটিরই শেষাংশে—

'আমার আশঙ্কা—নূতন বন্ধুবর্গের সংস্পর্শে নব ভাবে তোমার মন ভাবিত হতে পারে। আর যদি তা হয়, তবে অপরের মধ্যে সে ভাব জোর করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টাও তুমি করতে পার।···

পাশ্চাত্য জাতিদের এই অদ্ভুত স্বভাব আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি। সেই জন্যই কখনো কখনো আমি তোমাকে সাবধান করতে চেষ্টা করেছি মাত্র —অন্য কোন কারণে নয়।

কিন্তু বস্তুত তুমি স্বাধীন, তুমি মুক্ত। নিজের ইচ্ছামত, বিবেক-বুদ্ধিমত তুমি এগিয়ে চল, কর্মক্ষেত্র বেছে নাও।

মনে রেখো, শত্রু হোক, মিত্র হোক—আপন হোক, পর হোক—সবাই মায়ের হাতের যন্ত্র মাত্র, ক্রীড়নক মাত্র। তিনিই যন্ত্রী, তিনিই পরমাগতি।'…

তাই বলছিলাম,—এখন থেকেই নিবেদিতার জীবনেতিহাসের এক নব অধ্যায়ের সূচনা, একক জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে, অজানিত-পথে অনিশ্চিত পাদ-বিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে।

*　　*　　*

আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনায় আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা আছে, আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে অটল হয়ে দাঁড়াবার কথা আছে।

'আত্মৈব আত্মনা বন্ধু আত্মৈবরিপুরাত্মনঃ—' এ বাক্য সর্বকালের জন্যে প্রসিদ্ধ।

আবার, আচার্যের অনুগামী হয়ে চলবার, অকপট বিশ্বাসে তাঁর কাছে আত্মসমর্পনের কথাও শাস্ত্রমুখেই বহুধা বর্ণিত হয়েছে। সকল ধর্মের বাহ্য আচার আচরণের ব্যর্থশ্রম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নির্ভর-শরণাগতির আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে অবশ্য রক্ষা করব। সর্ব পাপ, সর্ব গ্লানি অপসারিত করে ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করে দেব—মা শুচ।

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ।…

দু'টিই দুরূহ সাধনা, দুরূহ তপস্যা।…

পরস্পর পরিপূরক হলেও তাদের যুগপৎ বাস্তব-রূপায়ণ সুসাধ্য নয়। অবশ্য নিগূঢ় জীবন-সাধনার কোনটাই সহজ বা লীলাবলীল

•নয়। সে পথে দুঃখে-সুখে, হাসি-কান্নায় ও আনন্দ-বিষাদের দোলা-চাঞ্চল্যে—আত্মার যে মধুক্ষরা অভিযান, তা উপলব্ধি করতেও সাধনা চাই, ধ্যান-দৃষ্টি চাই।

রহস্যময় জীবনমঞ্চের অন্তরালে যে অপার্থিব সৌন্দর্য-খনি লুকিয়ে আছে তার যথাযথ উপলব্ধি থেকেই ঐ ধ্যানদৃষ্টি জন্ম লাভ করে। কিন্তু কয়জন তার সন্ধান রাখে, কয়জনই বা মাথা ঘামায় সে জন্য? ঘুড়ির লক্ষের মধ্যে দু'টি একটিরই সূতা কাটে, দু'টি একটিই শূন্য মার্গে ছুটে যায়, তার বেশী নয়।

আর আধ্যাত্মিক সাধনতত্ত্ব তো আরও নিগূঢ়, আরও গভীর ভাবে 'নিহিতং গুহায়াং'। তাই, সে পথের কঠিন সমস্যা শক্তিশালী সাধককেও বিচলিত করে, কখনও কখনও বিভ্রান্তই করে দেয়।

যতদিন স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন নিবেদিতা, ততদিন জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তাঁর জীবনের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায় তলেই যেন তদীয় তপস্যার আসনটি বিস্তৃত ছিল।

আশা করেছেন, নির্ভর করেছেন। নিজের যা কিছু, জীবন যৌবন ধন-মান—তাঁরই পাদমূলে উৎসর্গ করে সকল কর্ম-কল্পনা গ্রথিত করেছেন। সংঘর্ষ যে না হয়েছে এমন নয়, কঠিন সংশয়ও যে মনকে পীড়িত করেনি কখনো, তাও নয়। তথাপি, তখন মনোভাব ছিল—

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

অকথিত নিবেদন ছিল—

যৎ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

কিন্তু আজ?

আজ স্বামীজীর সঙ্গ-বিচ্যুত হয়ে, এবং তাঁর উপদেশ-নির্দেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিবেদিতা একদিকে যেমন শঙ্কিত হয়েছিলেন, অন্যদিক তেমনি বে[illegible] বোধ করেছিলেন।...

'Discipleship is always serenly passive, but it changes, at a moments notice, into strenuous effort and activity, when the personal presence of the Teacher is withdrawn'—

এই ছিল নিবেদিতার গুরু সঙ্গ-চ্যুত জীবনের প্রারম্ভিক সমস্যার যথার্থ রূপ।...তবে, ভরসা ছিল স্বামীজীর অফুরন্ত আশীর্বাদ, ভরসা-ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য উচ্ছ্বসিত কল্যাণ-কামনা, যে কামনা—সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করে অদৃশ্য ভাব-পথে ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে অভিসিক্ত করে দিত, নূতন আশায়, নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে তুলত। মুখ্যত তারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবার ইংলণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি স্থানে তাঁকে নানা কর্মে উত্তোগী হতে হয়েছিল! সে উত্তোগের ফল তদীয় অন্তর জীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে যুগপৎ দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সে কথা পরে বলব। কিন্তু তার আগে—আমেরিকার কর্ম-প্রচেষ্টার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, সময়ের দিক থেকে সেটিই পূর্বকালীন এবং, নিবেদিতাও তখন সম্পূর্ণ একাকী নন।...

আমেরিকায়, প্রথম তু'বৎসর শিকাগোতে, জ্যাক্সনে ও ডেট্রি-য়েটে—এবং তারপর ক্যানসাস সিটি, মিনিয়াপলিস ও বষ্টনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল।

তখনকার তু'একটি অভিজ্ঞতা, একান্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসাবে, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।...

একটি ঘটনা মেরী হেইলকে নিয়ে। স্বামীজীর আমেরিকার-জীবনের বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে হেইল-পরিবার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত। মেরী হেইল স্বয়ং স্বামীজীর অশেষ স্নেহের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব [illegible]আলাপ—তদীয় পত্র-

সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তার মধ্যে ছন্দ-গাথায় লিখিত যে কয়টি পত্র, সেগুলি অশেষ মাধুর্যে মণ্ডিত।—

'মিস্ আণ্ডারস্টুড,' শীর্ষক যে কবিতাটি স্বামীজীর পদ্য রচনাবলীর অঙ্গীভূত—সেও মেরী হেইলকে লিখিত একটি পত্র।…

In days of Yore
On Ganga's shore preaching,
A hoary priest was teaching—
How Gods they come
As Sita Ram
And gentle Sita pining, weeping—

ইত্যাদি সেই পত্রটির প্রথমাংশ। শেষাংশ আরও সুন্দর।

But this I say,
Remember pray,
That God is true, all else is nothing!
This world's a dream
Though true it seem.
And only Truth is He the living!
The real One is none but He
And never never matter changing!

জীবনের সন্ধ্যালগ্নে যখন সকল কর্ম-অবসানে নিরুৎসুক দ্রষ্টারূপে তিনি মহাপ্রয়ানের জন্য প্রতীক্ষারত, তখনও স্বামীজী মেরী হেইলকে ঐকান্তিক স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন—

তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ ছিল জানি না, কিন্তু মনে হয় ছিল। মনে হয়, শুধু এ জন্মের নয়, একাধিক জন্মের মণিহারে সে সম্বন্ধটি গ্রথিত।…

কাজেই সেই মেরী হেইলের কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্য এবং সহযোগিতাই নিবেদিতার স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু

তিনি যখন নিবেদিতার কোন কাজে কোন সাহায্য করতেই সম্মত হলেন না, যখন তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রক্ষা করতে পর্যন্ত অস্বীকার করলেন—তখন নিবেদিতা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, বিস্মিতও হয়েছিলেন কম নয়।

তাছাড়া, স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদেরও অনেকের কাছ থেকে এ সময় তিনি প্রচুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কখনো কখনো, যেমন শিকাগোতে কিংবা ডেট্রিয়েটে সভাস্থলে, বক্তৃতার মাঝখানেই, স্বামীজীর বিরুদ্ধে কিংবা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নানা তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। এমন কি, স্বামীজীর দেব-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষেরও অভাব ছিল না। সে সব অপ্রত্যাশিত আঘাতে নিবেদিতা স্বভাবতঃই অবসন্ন হয়ে পড়তেন, হতাশ বোধ করতেন। কিন্তু, যে-কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি, সেই সব সংকট-মুহূর্তে, কোন-না-কোন ভাবে স্বামীজীর অদৃশ্য স্পর্শ তাঁর কাছে যেন এসে যেত। কখনো কোন পত্রে, কখনো কোন বাণীতে সে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হত। আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীয়মাণ দীপশিখা যেন পুনঃ প্রদীপ্ত হয়ে উঠত।…

'ধৈর্য অবলম্বন কর। সবই যথাসময়ে ঠিক হয়ে যাবে। যারা নির্মম আর যারা কোমল ও স্নেহশীল—সবাই পথে এসে পড়বে। এই যে তোমার নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা হচ্ছে—এইটিই আমি চাই।

আমার নিজের অভিজ্ঞতাই কি কম হচ্ছে?…

আমরা সবাই নিজ নিজ ভাবে উৎসর্গীত। জগদ্ব্যাপী এক মহাপূজা চলেছে। একটি বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন ভাবে এর কোন অর্থ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়, অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু বাধা দিলে প্রতিবাধা আসবেই।

ভয় নেই, মা তোমার ভাবুকতা ধীরে ধীরে শান্ত করে আনছেন।

আমার নিজের স্নায়ু-প্রধান ধাতও নীরোগ হয়ে আসছে। তারপর মহামায়ার মহাপূজার সার্থক উদ্‌যাপন হবে বৈকি?'

অথবা,—

'আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো। নিরাশ হয়োনা, হতাশা বা অবসাদ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। তোমার শিরা-উপশিরায় ক্ষত্রিয় শোণিত বইছে। তুমি অভী হও।

আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের অঙ্গের গেরুয়া, সে তো যুদ্ধক্ষেত্রেব মৃত্যুর দেহাভরণ। ব্রত-উদ্‌যাপনের ঐকান্তিক প্রয়াসই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।

মা, নিবেদিতা—দৃঢ় হও, আত্মপ্রত্যয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াও। কাঞ্চনের দাস হওয়া আমাদের জীবনের কথা নয়। কোন কিছুর দাসত্ব গ্রহণ করো না, কখনো না। সিদ্ধি অবশ্য লাভ করবে।'

তাই বলছিলাম,—তখন এক নির্ভয় ভরসা ছিল পশ্চাতে। মহাশক্তিধর মহাগুরুর উত্তোলিত দক্ষিণ বাহুর বরাভয়ের নীচে সে ছিল এক নিশ্চিন্ত কর্ম-সাধনা।

কিন্তু ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে এবার নিবেদিতা যেন সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ। গুরুর উপস্থিতি নেই, তাঁর প্রসারিত পক্ষপুট গুটিয়ে গেছে, আশীর্বাদও শুধু অদৃশ্য পথে সঞ্চারমান, দেখা যায় না, সব সময় ধরাও যায় না।

কাজেই একালের কর্মপ্রয়াসে নিবেদিতার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আমরা লাভ করি, একটি বিশেষ রূপ যেন দেখতে পাই। দেখতে পাই, প্রচার কার্যে, অর্থসংগ্রহে এবং নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনায় তিনি এখন ধীরে ধীরে নিজকে নিয়োজিত করছেন। কর্মব্যপদেশে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট-সংস্পর্শে আসছেন,—যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক প্রেট্রিক গেডিজ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিও ছিলেন।

শৈশবের মধুস্মৃতি-বিজড়িত ইংলণ্ড আর তাঁর চক্ষে পূর্বের মত আকর্ষণীয় ছিল না। প্রাকৃতিক বিচারেও নয়, মানুষের বিচারেও নয়।

মনে হয়েছিল সমগ্র দেশটিই যেন বদলে গেছে। আর একে আগের মত আপন মনে হয় না, আর সে মনোবীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলেনা পূর্বের মত। নিবেদিতা নিজেও অবশ্য প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছেন ইতিমধ্যে এবং সে বিষয়েও তাঁর সচেতনতার অভাব ছিলনা। তিনি ভাবতেন,—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে তিনি অর্জন করেছেন তার প্রভাব অতিক্রম করা আর সম্ভব নয়। তাঁর জীবনে সে অভিজ্ঞতা এক নূতন অধ্যায় যোজনা করেছে, কালান্তর এনেছে। বিগত কয়েক বৎসরে পরাধীন-ভারতবর্ষের অশেষ দৈন্য দুর্দশার বাস্তব চেহারা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন ইংরাজ জাতির ঔপনিবেশিক অধিকারের নগ্নরূপ, তার সাম্রাজ্য লিপ্সার, তার ইম্পিরিয়ালিজমের নির্মম নিষ্ঠুরতা। আবার, তারই সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের জলে স্থলে, পর্বতে অরণ্যে, নদী-মেখলা শ্যাম ভূখণ্ডে যে বিপুল সাধন-সম্পদ, যে উদার জীবন-দর্শনের বেদমন্ত্র একদিন জন্মলাভ করেছিল—তারও নগূঢ় পরিচয় তিনি লাভ করেছেন। কাজেই, সব মিশিয়ে তাঁর দৃষ্টিতে ইংলণ্ড এখন আর পূর্বের মত মহিমান্বিত ছিলনা, আকর্ষণীয় ছিল না।

তথাপি, তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল, প্রচারের জন্যও বটে, অর্থ সংগ্রহের জন্যও বটে।

ভারতবর্ষের সমস্যা, ভারতীয়-নারী, নারীর আদর্শ, ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ব্যর্থতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি এ সময়ে—বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

'ধর্মশিক্ষায় কিণ্ডারগার্টেন'—বিষয়ে একটি বক্তৃতাও এ সময়কার বক্তৃতাগুলিরই অন্যতম।

একবার একটি বক্তৃতায় বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব ছোট-লাট, স্যার রিচার্ড টেম্পল, সভাপতিত্ব করেছিলেন। ভারতবর্ষে নিবেদিতার

শিক্ষাকার্যের তিনি একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। নিবেদিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং প্রীতিও ছিল ঐকান্তিক।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে—এডিনবরায়, ডাণ্ডিতে, গ্লাসগোয়-এইকালে নিবেদিতার যে কর্ম-জীবন মানুষের চোখে পড়ত, তার একটি চিত্র জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিকের লেখনীতে এইভাবে অঙ্কিত হয়েছিল ঃ

'পূর্বকালের মত অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্প্রতি এদেশে ভারতবর্ষের পক্ষাবলম্বী একজন বীরের অভ্যুদয় ঘটেছে। কোন দূর বা অজ্ঞাত দেশ থেকে তাঁর আবির্ভাব নয়। তিনি ভারতীয়ও নন, পুরুষও নন। পরন্তু, তিনি ভারতের শাসক শ্রেণীরই সমগোষ্ঠী একজন মনস্বিনী নারী, ভারতবর্ষের নারী জাতির সেবায় নিজেকে সর্বথা উৎসর্গ করেছেন এবং সেজন্য ইংলণ্ডে তাঁব যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিহ্নিত ছিল সেটিকেও স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মার্গারেট নোবল্।

কিন্তু আজ তিনি ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদস্যারূপে গৃহীত। 'নিবেদিতা' এখন তাঁব গুরুদত্ত নাম। আর সে নামেই এখন ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় জীবন, ভাবতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি নিরত।

দীর্ঘ ঋজুদেহ, একান্ত অনাড়ম্বব অথচ সুদৃশ্য, রুচিসংগত পোষাকে তাঁর দেহটি আবৃত। কণ্ঠে একটি বিচিত্র মালিকা, সেটি জপের জন্য প্রয়োজন হয়। জপে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজদের কাছে আজ তিনি এক মহা-বিস্ময়।'

কর্মে তিনি যেন আকণ্ঠ নিমগ্ন। বিশ্রামের অবকাশ নেই, সুযোগও নেই।...

ইতিমধ্যে সেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মিসেস ওলিবুলের কাছ থেকে একটি বিশেষ নিমন্ত্রণ এল নরওয়ে যাবার জন্য। ওলিবুল তখন নরওয়েতে।

নিবেদিতা যেন কয়েক দিনের জন্য নরওয়ে যান এবং পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

সে নিমন্ত্রণ নিবেদিতাকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেটি তিনি গ্রহণও করেছিলেন,—বিশ্রামলাভের আশায়ও বটে, পুস্তক-প্রবন্ধাদি রচনার সুবিধার জন্যও বটে। সুতরাং এর পরই নরওয়ে।

* * *

নরওয়ে, খাড়ি ও ফিয়র্ডের একটি ছোট দেশ।

ভৌগলিক বিচারে—স্কাণ্ডানেভিয়া উপদ্বীপের এক ক্ষুদ্রায়তন ও জনবিরল এই ভূখণ্ড।

প্রকৃতির রম্য লীলাভূমি। তিন দিকে অনন্ত নীল মহাসমুদ্র—দিক্ চক্ররেখার অস্পষ্ট নেমিতে বিলীন। অপর দিকে সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড আর সোভিয়েট দেশের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ।

একদিন বিগত অতীতে, ইউরোপের মধ্যযুগে—টিউটনিক্ জাতির আবাসভূমি ছিল এই নরওয়ে। রাজা চতুর্থ হ্যাকনের সে ছিল এক গৌরবময় যুগ। শেটলন্ড, অর্কনি (দ্বীপপুঞ্জ), আইস্‌ল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, হাইব্রিডস্ প্রভৃতি ভূখণ্ড—সেদিন সে গৌরবের সাক্ষ্য বহন করত। কত বন্ধুর পর্বতমালা, কত বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্যভূমি—সরল বৃক্ষশ্রেণীতে আকীর্ণ। আর তাদেরই মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা ক্ষুদ্র পথরেখা কখনো দেখা যায়, কখনো ঝরে-পড়া শুষ্কপত্রে আচ্ছন্ন হয়। কত নাম-না-জানা বনজ কুসুমের বিচিত্র গন্ধ শীতের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে।

পশ্চিম-বাহী পর্বত নির্ঝরিণীগুলি কি খরস্রোতা, কি কলস্বনা।

উত্তরাংশে তাকিয়ে দেখ, নর্থকেপে. হিম-কটিবন্ধের সীমারেখা পর্যন্ত বৎসরের তিনমাস গভীর মধ্যরাত্রিতেও সূর্য-দেবতাকে দেখতে পাবে। তখন অরণ্য ভূমির প্রগাঢ় নির্জনতার মধ্যে নীশিথ-সূর্যের দেশটিকে তুমি অভিনন্দিত করবে। কিন্তু দেখতে দেখতেই

পরিবর্তিত হবে পটভূমি। তখন নর্থকেপে আর সূর্যকে দেখা যাবে না দীর্ঘকাল। তখন তুষার-বর্ষী, তিনমাস-দীর্ঘ একটানা রজনীর প্রহরে প্রহরে দুর দিগন্ত-লগ্নতায় দেখতে পাবে আলোর বিচিত্র বর্ণবিন্যাস—অরোরাবোরিয়ালিস, ইন্দ্রধনুর রঙে রঙিন এক অপূর্ব মেরুপ্রভা।···

নিবেদিতার শ্রান্ত দেহ ও ক্লিষ্ট মন নিসর্গের সে বিচিত্র সমারোহে অবগাহন করে যেন পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

বার্গেন থেকে কিছু দূরে একটি খাড়ির ধারে, একটি ছোট কুটিরে সে বার প্রায় তিনমাস কাল বাস করছিলেন নিবেদিতা। একক জীবনের আত্ম-বিশ্লেষণের সে একটি তপস্যা-সমৃদ্ধ কাল। একদিকে অন্তর্মুখিন্ সাধনা অপরদিকে চিন্তার বহির্মুখিন্ প্রকাশে প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা।—নরওয়ের স্বপ্নকাল-স্থায়ী জীবনের এই ফলশ্রুতি।···

এখানে, ঐ ক্ষুদ্র অপরিসর কুটিরেই আচার্য জগদীশচন্দ্র, রমেশ চন্দ্র দত্ত, মিসেস সেভিয়ার, পেট্রিক্ গেডিজ্ প্রমুখ বহু মনীষী শুভাগমন করেছিলেন। এখানেই—Web of Indian Life নামক নিবেদিতার বিখ্যাত গ্রন্থটির অধিকাংশ লিখিত হয়েছিল।—

নিবেদিতার তৎকালীন মানসজীবনের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে সে গ্রন্থ শুধু যে বিদগ্ধ সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছিল তাই নয়, পরন্তু ভারতীয় নারী—মাতারূপে, জায়ারূপে, কন্যারূপে এবং জাতীয় সংস্কৃতির সার্থক সাধিকারূপে সেই প্রথম বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল—এই গ্রন্থটিরই নিরপেক্ষ ও নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ গ্রন্থের একটি অমূল্য মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের নিগূঢ় জীবনধারার অন্তরতম প্রদেশে নিবেদিতার সুকৌশল অঙ্গুলি-সংস্থাপন রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। আমাদের সঙ্গে প্রেমে, প্রীতিতে একাত্ম হয়ে এই মনস্বিনী নারী আমাদের একান্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ

করেছিলেন। সে প্রবেশ যেন অত্যন্ত সাবলীল ছিল, স্বাভাবিক ছিল। সমুচ্চ আকাশ থেকে করুণার বক্র দৃষ্টিপাত তিনি কখনো করেন নি। সে তাঁর স্বভাবও ছিল না, প্রণালীও ছিল না।…

'She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special purch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of its superior aloofness.'…

না, সেভাবে অগ্রসর হন নি নিবেদিতা। পরন্তু আমাদেরই মত জীবন যাপন করে, আমাদের প্রকৃত রূপটি তিনি ধরতে চেয়েছিলেন, প্রেমের মধ্যে দিয়ে, ভালবাসার মধ্যদিয়ে।

'She lived and came to know us by becoming one of ourselves.'

আবার, এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিবেদিতার স্বকীয় আইডিয়ালিজম্, তাঁর ঐতিহাসিক তত্ত্ব-পারঙ্গমতা। ফলে, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মহিমা ও জীবন-শৌর্য তাঁর চক্ষে যথাযথরূপে ধরা পড়েছিল এবং সার্থক ভঙ্গীতে তাঁর লেখনীতে রূপায়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'Nivedita uttered the vital truths about Indian Life.'

সে যাই হোক, মোট ষোলটি প্রবন্ধের সংযোজনায় 'Web of Indian Life'-গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভারতীয়-নারী নানা ছন্দে প্রকাশিত, ভারতের সমাজ-জীবন নানা দিক থেকে আলোচিত।

নিবেদিতার চক্ষে সর্বাগ্রে প্রতিভাসিত হয়েছিল হিন্দু-জননীর অতুলনীয় মহিমা, দি সুপ্রিম হিন্দু-মাদার, পরিবারের সর্বোচ্চ সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিতা। তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই সস্নেহ অঙ্গুলি

চালনায় সমগ্র পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত। স্বর্গাদপি তিনি গরিয়সী, তাঁর পদধূলি তীর্থরজ থেকে পবিত্র, তাঁর আশীর্বাদ দেবাশীর্বাদ অপেক্ষাও অব্যর্থ। তাঁর স্নেহের সীমা নেই, মাধুর্যের অবধি নেই। তাঁর পুণ্য প্রভাবের উজ্জ্বলতায় ছায়া পড়ে না, মালিন্য আসে না। হিন্দুর মাতৃত্বের এই পরিকল্পনা।…

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে—হিন্দু নারী জায়ারূপে প্রকাশিতা, জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষয়িত্রীরূপে পুষ্পিতা।

অবগুণ্ঠিতা বালিকা বধূ একদিন কম্পিত পাদবিক্ষেপে পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে প্রবেশ করে। সিঁথিতে সিঁদুর, হস্তে এয়োতির চিহ্ন,—শৈশবের অবাধ বিহঙ্গ-জীবনের অবসান যেন তাতেই সূচিত।

শ্বশ্রুমাতা আপন কন্যারূপে তাকে গ্রহণ করবেন, নিজ গর্ভজাত কন্যাটির স্থলাভিষিক্ত করে তাকে বরণ করবেন।

আশীর্বাদ করবেন,—'সতী-সাবিত্রীর মত হও। সীতার মত হও। ধর্মে নিষ্ঠা থাকুক। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।'

তারপর যথাকালে সেই বালিকা বধূ গৃহের গৃহিণী হবেন। জননীর আসন গ্রহণ করবেন।

The Hindu wife will be the Hindu mother in time.…

বস্তুত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বিপরীত দিক থেকে নিরূপিত হয়ে থাকে। নিবেদিতার বিশ্লেষণে—

'Women in the West may thirst for the glory of love or the power of wealth! In Asia, her characteristic dreams are prfectness, and purity and faith.'

পাশ্চাত্যের নারী সাম্রাজ্ঞীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা, কোন সংঘাতে তিনি বিচলিত নন, ভীত নন।

She is exposed to the fierce light that beats upon a throne.

প্রাচ্যে নারী যদি সাম্রাজ্ঞীও হন তথাপি তিনি অন্তঃপুরচারিকা। অর্ধাবগুণ্ঠনে তাঁর মুখকমল আবৃত। লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রচারোদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ তাঁর ধর্ম নয়, তাঁর রুচিতে শোভন নয়।

'Remoteness and shadow, silence and obscurity seem to it the true environment of holiness.'

সেই হোলিনেস্, সেই শুচিতা গৃহে গৃহে রক্ষিত হচ্ছে প্রাচ্য-বধূর কল্যাণে, হিন্দু-জননীর আশীষধারায়।···

হিন্দু পরিবারে স্বর্গত স্বামীর অক্ষয় স্মৃতি বুকে নিয়ে পরার্থে-জীবিতা বিধবা নারী আর এক অনন্য কল্যাণ-প্রতিমারূপে বিরাজিতা।

কী অনুপম ছন্দেই না নিবেদিতা তাকে বর্ণনা করেছেন! শ্বেতবস্ত্রে আবরিতা, তপস্যাকৃশ ও নিরাভরণ দীর্ঘ তনুখানি, তাহে মুণ্ডিত কেশভার। দিবসান্তে একবার মাত্র হবিষ্যান্নে তাঁর দেহধারণ।—এই হিন্দু-বিধবা।

তিনি মুক্ত, অপরের সেবায় তাঁর দেহ ও মন উৎসৃষ্ট। এ জীবনের শেষে আর এক অক্ষয়, অমৃত লোকে স্বামীর সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন—এই এক লক্ষ্যে তাঁর জীবন-সাধনা নিয়ন্ত্রিত।

'Wives have their thousand and one maternal cares. But the widow, and above all the childless widow, in her agony of solitude, can hear the sobs of children not her own, can stretch hands across the desert of her own mourning to those who are ill or in poverty, and desolation .'

—হিন্দু-বিধবার এ পবিত্র জীবন-চিত্র নিবেদিতার চক্ষে প্রত্যক্ষ ছিল, নিবেদিতার দৃষ্টিতে জীবন্ত সত্য ছিল।···

এমনি করে তাঁর কল্পলোকে—'Web of Indian life' ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করেছিল।

গ্রন্থের শেষ দৃশ্যাবলীতে জাতিভেদ প্রথার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন নিবেদিতা। আর গেয়েছেন অনবদ্য শিব-গীতি, শিব-মহিমা। বিবৃত করেছেন বুদ্ধের অপার্থিব জীবন কথা।—

'Worship! Worship! The very air is rent with prayer and hymns. From the Unreal to the Real! From the Many to the One!

Lord of Animals! Refuge of Weariness! Siva! Siva! the Free! the Free!'

ভারতের তীর্থ মহিমা, যুগে যুগে নন্দিত মহাছন্দ—
'মধুময় পৃথিবীর ধূলি।'—

মাতা বসুমতী,
পিতা ঐ নীল নভতল।
বায়ু মৃদুগতি—
অনুকূল অতি,
জলধারা স্বচ্ছ সুশীতল।
তমসার পারে
দিব্য জ্যোতিরেখা,
জীবনের সখা—
তীর্থভূমে দেখে যাত্রীদল।...

তাই ভারতবর্ষে প্রতি তীর্থে, বিশ্বব্যাপ্ত দেবতাকে সে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম করে।

বলে,—

যো বিশ্বভুবনং আবিবেশ
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

Oh, Mother Earth, Father sky,
Brother Wind, Friend Light,
Sweet-heart Water,
Here take my last salutation with
folded hands!

এমন বিচিত্র ভাব-প্রকাশ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। নরওয়ের কৃষ্ণাভ আকাশের নীচে বসে কত দীর্ঘ অবসরে একথা নিবেদিতার পুনঃ পুনঃ মনে হত যে ভারতবাসীরা তাদের একান্ত নৈকট্যের জন্য, আর তাদের প্রাত্যহিক সম্বন্ধের জন্যই নিজ জন্মভূমিকে সঠিক চিনতে পারে না, ধরতে পারে না।

নরওয়ের দীর্ঘশীর্ষ তপোমগ্ন দেবদারু বৃক্ষশ্রেণী দেখতেন নিবেদিতা, তার শত শত ঋজু-কুটিল ফিয়োর্ড, পার্বত্য নির্ঝরিণী সবই মুগ্ধ বিস্ময়ে অবলোকন করতেন শিল্পীর চক্ষু দিয়ে। কিন্তু তাঁর মন পরিতৃপ্ত হত না। কেবলই মনে হত—কোথায়, কোথায় সে স্তব্ধ, শান্ত, ধ্যান-তন্ময়তা, কোথায় সে মহাপুরুষদের স্মৃতি-বিজড়িত তীর্থ-ভূমি? নেই। নরওয়েতে নেই, ব্রিটানিতে নেই। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

'Beauty of place translate itself to the Indian consciousness as Gods cry to the soul.'

এই সত্য। আজকের ভারতবাসী যদি একটু স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, একটু দ্রষ্টার চক্ষু নিয়ে দেখত তবেই বুঝতে পারত। বুঝতে পারত—

'The old roads of Asia are the foot-ways of the worlds ideas.'

একদিন চরম সত্যের সাধনা করেছিল ভারতবর্ষ। মুক্তির জন্য সর্বরিক্ত হয়ে মহা ঐশ্বর্য সে লাভ করেছিল। সে দিন সে লাভ করেছিল আনন্দ, পান করেছিল অমৃত, আয়ত্ব করেছিল নির্বাণ। কিন্তু আজ, টু-ডে?

'To-day her gifts are decried by all men, for to-day the mighty mother is widowed and abased. She who had held open port to all fugitives is unable now to give bread to her own children.'

—এমনি করুণ তার পরিস্থিতি!

এই সব নিগূঢ় চিন্তার মুহূর্তগুলিতেই নিবেদিতার ধ্যানে জাগ্রত হতেন স্বামীজী। তাঁর অবয়ব, তাঁর কণ্ঠ ও স্বপ্ন সব যেন এক সঙ্গে শরীরী হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হত। আর সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হত এক কঠিন বেদনা বোধ, এক দুরপনেয় মর্ম যন্ত্রণা।

কেন এমনটি হল? কোন্ মহাপাপের রন্ধ্রপথে ভারতের ভাগ্যে এমন ভয়াবহ অধোগতি এল! —কে জানে?

বহু ভ্রান্তি হয়ত ছিল, বহু অকর্তব্য হয়ত করা হয়েছে, আর বহু কর্তব্য হয়ত করা হয়নি। সর্বোপরি ছিল পরাধীনতার নাগপাশ।···

এই নরওয়েব শান্ত, ধ্যানময় দিনগুলিতেই কাশ্মীরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও নূতন করে নিবেদিতার মনে উঠেছিল। নূতন করে যেন তিনি অনুভব করেছিলেন পরাধীনতার অভিশাপ। কি দুঃসহ, কি পরিমাণে 'গুণরাশী নাশি' তার প্রদাহ। অতএব, স্বাধীনতা ভিন্ন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভিন্ন তার অপরিমেয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। কিন্তু কোন্ পথে আসবে সে স্বাধীনতা? কারা হবে সে সংগ্রামের সেনানী? সে ব্যাপারে নিবেদিতার কর্মপন্থাই বা কি হবে?

শুধু ধ্যান, শুধু চিন্তা, শুধু প্রবন্ধ বা গ্রন্থ-রচনা? অথবা, অন্য কোন পথের অনুসরণ তাঁকে করতে হবে, অন্য কোন কর্মসূচী তাঁকে গ্রহণ করতে হবে? অদূর ভবিষ্যতের গর্ভগৃহে কোন্ জীবন-রহস্য নিহিত—কে তাঁকে বলে দেবে?

ভারতবর্ষ বহুযুগ মন্বন্তর ধরে স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন ছিল। একদল দস্যু সে সুযোগে তাকে আক্রমণ করল, অধিকার করল তার ভূখণ্ড। দস্যুদল কি তাকে কিছু শেখাতে পারবে? পারবে না, পারা সম্ভবও নয়। ভারতবর্ষের কর্তব্য হবে দস্যুদলকে বিতাড়িত করে স্ব-স্থানে ফিরে যাওয়া। মনে হয়, এ ধরণের কোন কার্যসূচী গ্রহণই আশু কর্তব্য।

ভারতের বুকে যা-কিছু ভারতীয়, তাই নিবেদিতার নমস্য। তা সে যত হীন হোক, যত তুচ্ছ হোক।…

স্বামীজী এখন দূরে, বহুদূরে। আর তাঁর কোন নির্দেশ পাওয়া যাবে না।

তিনি এখন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে, অন্তিমকাল-গণনায় নিরত।

'কুলায় যাবার কাল এল বিহঙ্গের।'

'Verily I am a bird of passage! Gay and busy Paris, grim old Constantinople, sparkling little Athens and Pyramidal Cairo are left behind…

It is so quiet and still. Everything is green and gold …and the air is cold and crisp and delightful'…

এই এখন স্বামীজীর মানস জীবনের ছবি। সুতরাং, তাঁর কাছ থেকে কোন আবাহনও নেই, নির্দেশও নেই।

অথচ, এই পটভূমিতেই ভারতবর্ষে ফিরে যাবার কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদিতার প্রাণে উদিত হল। মনে হল, ইংলণ্ডে বসে অথবা ইউরোপের কোন স্থানে থেকে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করা আর সম্ভব নয়! ভারতবর্ষের প্রতি প্রচণ্ড অন্যায় করেছে তাঁর দেশ, তাঁর স্বজাতি। কত নির্বাসন, কত কারাদণ্ড, কত অত্যাচার! ভারতে তো সন্ত্রাসের অবাধ রাজত্ব চলছে। পুরুষেরা প্রাণ হারাচ্ছে

মেয়েদের মর্যাদা বিপর্যস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

সে প্রায়শ্চিত্তের অংশই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। এদিকে হয়েও গেছে অনেকদিন। অর্থসংগ্রহ যতটা হয় হয়েছে, বাকীটা ভারতবর্ষের মাটিতেই দেখা যাবে।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এ কালে প্রচুর আশ্বাস দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে।

বলেছিলেন,—'অর্থের জন্য চিন্তা কেন? আপনার লেখা থেকেই অর্থ এসে যাবে। আপনার 'Web of Indian life' আমি ছাপিয়ে দেব।'

অতএব, ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়াই বোধহয় সঙ্গত। কিন্তু স্বামীজী? স্বামীজী কি অনুমোদন করবেন? নিবেদিতার মনে শঙ্কা ছিল। সে শঙ্কা তাঁরই লেখনীতে পরিস্ফুট।—

'আমার কাছে স্বাধীনতার একটি বিশেষ মূল্য আছে।...আমি জানি আমার কাজ মূলতঃ নারী-সমাজের মধ্যে, ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজন আমার কাছে এত স্পষ্ট যে সেটি আমি অস্বীকারও করতে পারছি না, পরিহারও করতে পারছি না।

স্বামীজীর বাণী অবিস্মরণীয়। আমার জীবনে তারাই তো অম্লান, তারাই তো 'জ্যোতি, ধ্রুব তারকার।' কিন্তু তাদের বাইরেও একটি ক্ষেত্র আছে। গত এক বৎসরে সে দিকটি আমার কাছে পরিস্ফুট হয়েছে।'

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এখন তাই নিবেদিতার অন্যতম জীবন-স্বপ্ন! আর তাঁর শঙ্কাও ছিল সেই দিক থেকে।

ঠিক এমনি দিনে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই নির্দেশ গেল আর এক শক্তি-কেন্দ্র থেকে, আর এক কল্যাণ-উৎস থেকে।

শ্রীশ্রীমায়ের চিঠি পেলেন নিবেদিতা।...

'ফিরে এস। ফিরে এস ভারতবর্ষে। আমার অজস্র আশীর্বাদ নিয়ত তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে।'…

মুহূর্তে শঙ্কা-সংকোচ অপসৃত হল। মুহূর্তে সংকল্প স্থির হয়ে গেল। পূর্ণ তিন মাস নরওয়েতে বাস করবার পর—ইংরাজী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ৯ই তারিখ, প্যারিস থেকে ভারতাভিমুখে তিনি যাত্রা করলেন—'মাঙ্গোসা' জাহাজের যাত্রীরূপে।

জীবনের আর একটি অধ্যায়ের একাংশও সেই সঙ্গে সমাপ্ত হল। অবশিষ্ট অংশটুকু নিয়ে আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের অঙ্গ-রচনা।…

সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের কথা এখন আমরা বলছি। এ সময়, অর্থাৎ জুলাই মাসের ৪ঠা তারিখ, ইচ্ছামৃত্যু স্বামী বিবেকানন্দ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছিলেন। আর এ বৎসরেরই প্রারম্ভে—ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে মাদ্রাজ পথে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নিবেদিতা। এবার সহযাত্রী ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্যারা সি. বুল। তাঁরা যখন এদেশে পেঁাছালেন স্বামীজী তখন কাশীতে।

এর ঠিক চার বৎসর পূর্বে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আর একদিন যখন ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন নিবেদিতা, তখন তিনি মার্গারেট ছিলেন। দেবোদ্দেশ্যে আত্ম-নিবেদনের মহাব্রত-গ্রহণ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। 'নিবেদিতা' নামের চন্দন-তিলক তখনও অঙ্কিত হয়নি শুভ্র ললাটে। তখনও সমুদ্র মেখলা এই ভারতবর্ষ একটি অজানিত রহস্যময় দেশ।

শুধু স্বামীজীর আদেশ-নির্দেশ, শুধু তাঁর মহৎ জীবনের অনিবার্য আকর্ষণই ছিল তখন পরম আশ্রয় ও চরম ভরসা।

কিন্তু আজ, চার বৎসর পরে, সেই ভারতবর্ষের বুকে পুনরাগমনের দিনটিতে অবস্থা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে।

এখনও মুখ্য-আকর্ষণ নিঃসংশয়ে স্বামীজী, এখনও চলার পথের অমূল্য সম্পদ সে অনন্য জীবনেরই মহদাদর্শ। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটি তীব্র আকর্ষণ এখন জাগ্রত হয়েছে। সে আকর্ষণ ভারতবর্ষের, স্বামীজীর মাতৃভূমি,—'Queen of his adoration' যে দেশটি, সেই দেশটির।

তাছাড়া, চার বৎসর পূর্বেকার মার্গারেটও আর নেই। সে মার্গারেটের সঙ্গে আজকের নিবেদিতার অনেক পার্থক্য, অনেক গড়মিল। এমন কি চার বৎসর পূর্বেকার স্বামী বিবেকানন্দ,—গুরু এবং নেতারূপে যিনি সর্বত্র নন্দিত তাঁর সঙ্গেও আজকের মহাপ্রস্থানোন্মুখ বিবেকানন্দের খুব বেশী সাদৃশ্য নেই।

কাজেই, বর্তমানের পরিবর্তিত-পরিস্থিতিতে একথা নিবেদিতার মনে হয়েছিল যে এখন নিজের কর্মপথ নিজের স্বাধীন চিন্তার মধ্য দিয়েই তাঁকে বের করে নিতে হবে। অন্য কোন সহায়তার সম্ভাবনা নেই।

স্বামীজী বলেছেন—Find a way or make it. হয় পথ খুঁজে বের কর, নতুবা পথ তৈরী করে নাও। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ একই আশীর্বচন নানাভাবে, নানা সময়ে উচ্চারণ করেছেন।

'সর্বশক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক। মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হোন, বাহুতে প্রতিষ্ঠিতা হোন। অপরাজেয় মহাবীর্য তোমাতে জাগ্রত হোক।…

যথাকালে, পরমা শান্তিও তুমি লাভ করবে। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন তবে তিনি যে-ভাবে আমাকে পথ দেখিয়ে, হাত ধরে নিয়ে গেছেন—তোমাকেও ঠিক সেইভাবে অথবা তদপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাবে, অবশ্য পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।'…

এরপর নিবেদিতা যা ভাল মনে করবেন, যেটা ভাল বুঝবেন—সে ভাবেই অগ্রসর হবেন।

এই পটভূমিতেই নূতন করে ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে নিবেদিতার পাদবিক্ষেপ।…

এদিকে, ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন-পথে মাদ্রাজেই প্রথম নিবেদিতা তাঁর তদানীন্তন চিন্তাধারার আভাস দিয়েছিলেন একটি বিখ্যাত ভাষণের মধ্য দিয়ে। সে ভাষণ অকস্মাৎ যেন সমগ্র দেশের

চেতনা-মূলে তীব্র আঘাত হেনেছিল। স্বামীজী স্বয়ং বহুদূরে বসেও তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত ছিলেন সে সভাটিতে এবং উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। নানা সংবাদপত্রে তার পূর্ণ বিবরণ সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিকৃত প্রভাবের অবিশ্বাস্য ব্যাপকতার বিরুদ্ধে নিবেদিতা সে দিনই যেন প্রথম প্রকাশ্য আক্রমণ করেছিলেন। নিবেদিতার তখনকার চিন্তাজীবনের সে একটি দিগ্‌দর্শন স্বরূপ।···

নিবেদিতার উক্তির সার কথা এইরূপ ছিল ···

ধর্ম-সাধনার পীঠস্থান এই ভারতবর্ষ। ধর্মক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে সে দাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই। তবে, যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-জীবনের নানাক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; কিন্তু সে পরিবর্তন আনয়ন করবে জাতি নিজে। অপর জাতির সেখানে হস্তক্ষেপ করবার কোন যুক্তি নেই, অধিকার নেই।

তিন হাজার বৎসর পূর্বে, মানব সভ্যতার প্রত্যূষ-লগ্নে যে ভারতীয় সভ্যতা উদ্ভূত হয়েছিল আজ ক্ষমতার মদগর্বে পাশ্চাত্যের নিতান্ত তরুণ জাতিগুলিই তাকে পরিচালিত করতে চায়! এ এক অসহ্য স্পর্দ্ধা। কোন মতেই এ ঔদ্ধত্যকে বরদাস্ত করা হবে না।

সহজ জীবন, অনাড়ম্বর সরল-জীবন—এই-ই ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, তার বিশিষ্টতা।

প্রকৃত উন্নত সভ্যতার এ লক্ষণ কালে কালেই স্বীকৃত হয়েছে।···

*　　*　　*

ভারতীয় নারীর মন্দভাগ্যের কথা শত শাখা-পল্লবে পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। কিন্তু সে প্রচার স্বার্থপ্রাণোদিত। সে প্রচার মিথ্যা।···

এদেশে নারী যে মর্যাদা লাভ করে—তেমন মর্যাদা অন্য কোন দেশে তার ভাগ্যে জোটে না।

আক্ষরিক বিচারে শিক্ষিত না হলেও ভারতীয় নারী তার পুরাণ ও মহাকাব্য, তার সাহিত্য ও জীবনদর্শনের মূল তত্ত্ব এবং আখ্যায়িকার সঙ্গে পরিচিত।

মা, ঠাকু'-মা, দিদি-মা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে সব অনবদ্য কাহিনী যুগে যুগে বংশানুক্রমিক ধারায় ভারতেব গৃহে গৃহে, কুটিরে কুটিরে প্রচারিত হয়ে এসেছে। তাদের ভিতর দিয়েই জাতীয় জীবনের স্নিগ্ধ বসুধারা নিত্য ফল্গুস্রোতে প্রবাহিত। একি অশিক্ষার লক্ষণ ?

বস্তুত, শুদ্ধমাত্র আক্ষরিক জ্ঞানই তো সভ্যতা-সংস্কৃতির যথার্থ পরিচায়ক নয়। আর্য জীবন-দর্শনের মূল কথা, কি পারিবারিক ক্ষেত্রে, কি সমাজক্ষেত্রে—শুচিতা, উদারতা ও ধর্ম !

সে মাপকাঠির বিচারে ভারতীয়-নারী যথার্থ শিক্ষার অধিকারিণী। তিনি মূর্খ নন, অশিক্ষিতা নন।

অতএব তাঁকে করুণা করবারও কোন প্রয়োজন নেই, অমর্যাদা করবারও কারো অধিকার নেই। সেটি অবৈধ অনধিকার চর্চা।...

ঐ অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের ভাবই ছিল তখন নিবেদিতার চিন্তায় অত্যন্ত প্রবল। এবং সে বিক্ষুব্ধ চিন্তা নিয়েই, দীর্ঘ চার বৎসর পর, মাদ্রাজ হয়ে কলিকাতায় ফিরে এসেছিলেন নিবেদিতা,—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের, ৯ই ফেব্রুয়ারী, বাগবাজার পল্লীর বোসপাড়া লেনে, সেই সতের নম্বর বাড়ীটিতেই। অনেকদিন পর বিদেশ থেকে আপন জন্মভূমিতে অথবা আপন পিতৃগৃহে ফিরে এলে মানুষ যেমন পরিতৃপ্তি বোধ করে, চতুর্দিকের সব কিছুকেই আপন জেনে উৎফুল্ল হয়, নিবেদিতার মনোভাবটিও ঠিক তেমনি হয়েছিল। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম কয়েকদিন পূর্ব-পরিচিত সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা-সাক্ষাৎ

করলেন। 'উদ্বোধনে' গিয়ে সকলকে প্রণাম জানিয়ে এলেন, কামারহাটিতে গিয়ে গোপালের মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলেন। সংবাদ পেয়ে বন্ধু-বান্ধব অনেকে নিজেরা এসেও দেখা করে গেল। গৃহে প্রত্যাবর্তনের আনন্দে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হল।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ-উদ্যমে শুরু হল কাজ। প্রথমেই হাত দিলেন বিদ্যালয়টিকে পুনঃ-গঠিত করবার কাজে। সম্মুখেই ছিল সরস্বতীর পূজার দিন। ঐ দিন বিশেষ সমারোহে দেবী ভারতীর পূজা-উদ্‌যাপন করে, চার বৎসর পরে, আবার বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হল। ছাত্রী-সংগ্রহ, উপকরণ-সংগ্রহ, অর্থ-সংগ্রহ এক সেঙ্গে সব দায়িত্ব পূর্বেরই মত নিজ স্কন্ধে তাঁকে গ্রহণ করতে হল। আবার, তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রবন্ধ-রচনা, গ্রন্থ-রচনা, নানা স্থানে ভাষণ দান প্রভৃতি কাজও শুরু হল পূর্বেরই মত।

আবার অন্যদিকে—আর একটি বিস্তৃত কর্মভূমিও এ সময়ই প্রস্তুত হতে শুরু করল। নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন, দেশের নানা কাজে হাত দিয়েছেন অথবা দিতে চাইছেন—এ-সংবাদ পেয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রের বহু খ্যাতনামা মনীষী, সাহিত্যে, সংবাদপত্র-পরিচালনায় যাঁরা কীর্তিমান এমনও অনেকে, নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। পরিচয়ও আরম্ভ হল ধীরে ধীরে।···

ইতিমধ্যে মার্চমাসের প্রথম দিকেই কাশী থেকে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বামীজী—ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও কর্ম-ক্লান্ত দেহটিকে নিয়ে।

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই। বেলুড় মঠে স্বামীজীর সুপরিচিত কক্ষটিতেই অনেকদিন পর আবার গুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন নিবেদিতা। স্বামীজীর স্বাস্থ্যের ভগ্ন-অবস্থা লক্ষ্য করে নিবেদিতা কতটা শঙ্কিত বা বিচলিত হয়েছিলেন—সে কথা সঠিক আমাদের জানা নেই। হয়ত অত্যন্ত

শঙ্কিত হয়েছিলেন; হয়ত চোখের জলই রোধ করেছিলেন অতি কষ্টে।

তখন শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজীর জাপান যাবার কথা হচ্ছিল। রেভাঃ ওডা এবং শিল্পী ওকাকুরা তখন কলিকাতায়। তাই, প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজী বলে উঠেছিলেন—তিনি চলে যাচ্ছেন। অতর্কিতে অমন একটি উক্তি যেন তীরের মত নিবেদিতার অন্তরে বিদ্ধ হয়েছিল। পরে অবশ্য জাপান যাওয়ার প্রস্তাবের কথা জেনে বহুলাংশে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তবে মনের উপর বিষাদের একটা গুরুভার যেন চেপেই বসেছিল।

স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তাও সেদিন বিশেষ কিছু হয় নি। শরীর সম্বন্ধেই প্রশ্ন করেছিলেন নিবেদিতা,—স্বামীজী কেমন আছেন, কাশীতে গিয়ে একটু ভাল বোধ করেছিলেন কিনা ইত্যাদি।...

উত্তরে, নিবেদিতার দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন,—

আত্মার বিনাশ নেই, কিন্তু দেহ ক্ষয়শীল। সে বিনষ্ট হবে। একথা গীতায় পাঠ করেছ।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥

—একথা যেমন সত্যি,

অন্তবন্ত ইমেদেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ—

একথাও তেমনি সত্য।...

এরপর সাধারণভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই নিবেদিতা বিদায় গ্রহণ করেছিলেন সেদিন।...

এরপরের তিন চার মাসের ঘটনা-প্রবাহ নিবেদিতার জীবনে নিরতিশয় দ্রুততালে অগ্রসর হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ দু'চারটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

১১ই মার্চ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব ছিল সে বৎসর। সেদিনও স্বামীজী খুব সুস্থ ছিলেন না। মঠ-বাটীর নিজ

কক্ষটিতেই নিজকে তিনি আবদ্ধ রেখেছিলেন। বাইরে উৎসব-প্রাঙ্গণে আর নেমে আসেন নি। কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখাও করতে দেওয়া হয় নি। দ্বারে প্রহরী ছিলেন স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

সেদিনও স্বামীজীকে দর্শন করতে নিবেদিতা এসেছিলেন বেলুড়ে, উপরে দ্বিতল কক্ষে গিয়ে তাঁকে প্রণামও করেছিলেন। তবে, স্বামীজী অসুস্থ বলে বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করেন নি।···

নিবেদিতার সুবিবেচনার কথা উল্লেখ করে স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেন,—দেখ, এরা কত সভ্য, কত এদের বিবেচনা। বাঙ্গালী হলে, অসুস্থ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা আমাকে না বকিয়ে ছাড়ত না। কিন্তু এদের ধরণ অন্য রকম।···

উৎসবের কয়েকদিন পর কলিকাতায় ক্লাসিক থিয়েটারে নিবেদিতা একটি বক্তৃতা দিলেন। বিষয় ছিল

'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন।'···

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সিষ্টার ক্রিশ্চিন কলিকাতায় পৌঁছালেন এবং নিবেদিতার সহকর্মীরূপে বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। নিবেদিতার পক্ষে সে একটি বিশেষ সুবিধা এবং সহায়তার ব্যাপার হল।

ক্রিশ্চিনের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, পরেও করব। বাহ্যদৃষ্টিতে ক্রিশ্চিনের প্রকৃতি বহুলাংশে নিবেদিতার প্রকৃতির বিপরীত ছিল। ক্রিশ্চিন ছিলেন শান্ত ও নির্ভরশীলা। ভাষা ও প্রকৃতি—উভয়ই তাঁর অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত ছিল। আর নিবেদিতা ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, আত্মপ্রত্যয়ের মূর্ত-প্রকাশ। কোন অন্যায় বা অসত্যের সঙ্গে তাঁর কোন আপস ছিলনা। তথাপি, উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্ব ছিল গভীর। ক্রিশ্চিন স্বামীজীরও বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, অন্যতম প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসায় স্বামীজী অত্যন্ত প্রীত

হয়েছিলেন। একদা একটি পত্রে ক্রিশ্চিনকে এইরূপ লিখেছিলেন স্বামীজী—

'জগজ্জননীর কাছে তোমাকে আমি সমর্পণ করেছি। তুমি নিত্যযুক্ত, তিনি তোমাকে অবশ্য রক্ষা করবেন। কোন বিপদ, কোন অশুভ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা।'—

নিবেদিতা বলেছিলেন,— ক্রিশ্চিনকে দেখলে বোঝা যায় লোক-নির্বাচনে স্বামীজীর কি অন্তর্দৃষ্টি ছিল. কি অসামান্য প্রতিভা ছিল।

ক্রিশ্চিনের স্বভাবে ঔদ্ধত্য ছিল না। স্বভাবতঃই সে শান্ত. সে নির্ভর-পরায়ণা।' ইত্যাদি।...

সে যাই হোক, এপ্রিল মাসটি এইভাবে দেখতে দেখতে অতীত হয়ে গেল। প্রত্যাসন্ন মে-মাসের প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মহানগরী কলিকাতা। চারদিকে যেমনি বদ্ধ গুমোট, তেমনি ধূলি আর প্রখর সূর্যতাপ। নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিন—হিমালয়ের বুকে, 'মায়াবতী আশ্রমে' গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়ে আসবেন স্থির করলেন। ওকাকুরাও তাঁদের সহযাত্রী হবেন। স্বামীজীর অনুমোদন নিয়ে তারপর তাঁরা যাত্রা করলেন।

স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার তখন হিমালয়ের এক রম্য প্রদেশে একটি ক্ষুদ্রায়তন সাধন-কুটীর স্থাপন করেছেন। সে কুটীর অদ্বৈত ভাবের তপঃক্ষেত্র। নির্জন পর্বতের বুকে, লোকালয় থেকে বহু দূরে সে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। কাঠগোদাম থেকে ভীমতাল, ভীমতাল থেকে ধারী, দেবীধুরা প্রভৃতি হয়ে পৌঁছাতে হত সে আশ্রমে। স্বামীজীর অতি প্রিয় ছিল সেই মায়াবতী আশ্রম।

কত বিচিত্র পার্বত্য কুসুম, কত দীর্ঘ, সারিবদ্ধ, ঋজু পাইন ও দেবদারু বৃক্ষ—'like senators of the wood' 'তপোমগ্ন ধরিত্রীর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ্ করে' দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগান্তের সাক্ষ্য বহন

করে।—উপরে নিঃসীম নীলশূন্য যেন অনন্তের ধ্যানে সমাহিত। দূরে কোথাও, শালবনের মধ্য দিয়ে উপলখণ্ড বিধ্বস্ত করে বয়ে যাচ্ছে কলধ্বনিমুখরা কোন পার্বত্য নির্ঝরিণী।··· অনেককাল পর আবার কয়েকদিনের জন্য হিমালয়ের ক্রোড়ে বিশ্রাম পেলেন নিবেদিতা।··· মন যেন স্বতঃই বিশ্বদেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

হিমালয়ের অরণ্য অঞ্চলে, গুহায়-গহ্বরে, তুষার-শুভ্র শিখরে শিখরে কত যুগ যুগান্তরের ধ্যান, অনুভূতি ও নীরব উপাসনার অম্লান রেখা অঙ্কিত আছে। সে সবের স্পর্শ অতীতে একদিন স্বামীজীর পার্শ্বে থেকে লাভ করেছিলেন নিবেদিতা। তারপর অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে। তাই এখন আবার নূতন করে যেন তাদের সুখস্পর্শ তিনি অনুভব করলেন। অবশ্য সেও বেশী দিনের জন্য নয়। মাত্র একমাস কাল মায়াবতীতে কাটিয়ে জুন মাসের শেষদিকেই বেরেলি ও লক্ষ্ণৌ হয়ে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করতে হল নিবেদিতাকে।

সেদিন তারিখ ছিল, জুন মাসের ২৬শে।

সেই তারিখে, একটু বেশী রাত্রিতেই নিবেদিতা বোসপাড়া লেনের নিজ গৃহটিতে পৌঁছেছিলেন। তার একদিন পর, অর্থাৎ ২৮শে জুন, স্বামীজী স্বয়ং অপ্রত্যাশিতভাবে নিবেদিতার গৃহে পদার্পণ করেছিলেন। কেন করেছিলেন, কি মনে করে করেছিলেন সেঁটা অনুমান সাপেক্ষ। তবে, সেদিন গৃহটির চারদিক ঘুরে ঘুরে, খুব ঔৎসুক্য নিয়েই সব কিছু যেন তিনি পরিদর্শন করেছিলেন।

কে জানে, হয়ত তাঁর স্বচ্ছ ধ্যানদৃষ্টিতে এ চিত্র সেদিন প্রতিভাসিত হয়েছিল যে ঐ ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যালয়টিতে স্থূল দেহে আর তিনি কখনো আসবেন না, সেই তাঁর শেষ আগমন। কালক্রমে বিদ্যালয়টি প্রসারিত হবে, স্ত্রীশিক্ষার একটি আদর্শ কেন্দ্ররূপে একদিন

সে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, খ্যাতি অর্জন করবে।' কিন্তু তিনি সেদিন আর এ পৃথিবীতে থাকবেন না। অতএব, বিদ্যালয়ের মাথায় শেষ স্পর্শ ও আশীর্বাদ দিয়ে যাবেন—যা বহু যুগ, মন্বন্তর ধরে অক্ষয় পাথেয় রূপে ক্রিয়াশীল থাকবে। তবে, এ সবই অনুমান।

নিবেদিতা এ ধরণের কিছুই কল্পনা করতে পারেন নি। তিনি শুধু অনুভব করেছিলেন এক মহা তৃপ্তি। লাভ করেছিলেন এক বিশেষ প্রেরণা—যা সহজ লভ্য নয়।···

পরদিন, ২৯শে জুন,—সেদিন নিবেদিতা গিয়েছিলেন বেলুড় মঠে।

তারপর চারদিনের একটি ব্যবধান। চারদিন পর আবার মঠে গিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন নিবেদিতা। সেদিন নিজের কর্ম সম্বন্ধে, বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বামীজীকে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। কিন্তু সে কথার কোন সুস্পষ্ট জবাব আর লাভ করতে পারেন নি। স্বামীজী শুধু বলেছিলেন :

আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে।

'A great tapasya and meditation have come upon me, I am making ready for death.'

কাজেই, আমি আর তোমার কথার মধ্যে প্রবেশ করতে পারব না। আমি মৃত্যু পথযাত্রী,—'I am going unto death.'

এ এক বিচিত্র ইঙ্গিত। মৃত্যুর দিকে সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ। কিন্তু তথাপি, একথা তখন নিবেদিতার মনে হয়নি যে স্বামীজীর মহাসমাধি একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনও তাঁর স্বকীয়, সহজ ধারণা—আরও তিন-চার বৎসর অন্তত স্বামীজী জীবিত থাকবেন।

তবে, স্বামীজীর কথা শুনে অতীত দিনের একটি কথা হয়ত তাঁর মনে এসেছিল—যেদিন, কাশ্মীরে অসুস্থ হয়েছিলেন স্বামীজী,

এবং অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে—দু'টি প্রস্তরখণ্ড দু'হাতে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে ঠুকে বলেছিলেন—

যখনই মৃত্যু আমার কাছে আসে, যখনই তার পদধ্বনি আমি শুনতে পাই, তখনই, মুহূর্তে আমার সব দুর্বলতা অপসৃত হয়।

মনে হয় আমি সেই সনাতন পুরুষ, 'বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ'—সেই মহা মুনি।...

কারণ, আমি ভগবানের পাদস্পর্শ করেছি,

'For I have touched the feet of God, for I have touched the feet of God,'...

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। পূর্বস্মৃতির সুখ-সঞ্চয়ন ভিন্ন আর নিবেদিতার মানসপটে কিছুই উদিত হয় নি।

চরম বিদায়ের দিন যে সত্যই প্রত্যাসন্ন সেটা তখন এতটুকু বুঝতেও পারেন নি নিবেদিতা, স্বপ্নেও আসেনি।

উত্তর জীবনে, করুণ অনুশোচনায় নিবেদিতা তাই বলেছিলেন—

'How strange it seem now, looking back on that time, to realise in how many ways the expected hint was given, only to fall on ears that did not hear, to reach minds that could not understand.'

এ দৃষ্টি-বদ্ধতার একটি কারণ হয়ত এই ছিল যে জগৎ সম্পর্কে একান্ত অনাসক্তি এবং নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও স্বামীজী আবদ্ধ ছিলেন তাঁর কর্ম-দুর্বলতায়। কারণ, মৃত্যুর চার-পাঁচ দিন পূর্বেও স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে এরূপ উক্তি নির্গত হয়েছিল—

'You know that work is always my weak point! When I think *that* might come to an end—I feel undone.'...

সে যাই হোক। এরপর, মৃত্যুর একদিন মাত্র পূর্বে নিবেদিতাকে নিজ হাতে খাওয়াবার জন্য স্বামীজী বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

সুতরাং, অবিলম্বে তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে সব ব্যবস্থা হল। সেদিন বুধবার ছিল, একাদশী ছিল। আর স্বামীজী নিজে উপবাসী থেকে, নিবেদিতাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে আহার করিয়েছিলেন। আহার্য ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর। একেবারে বাংলাদেশের নিজস্ব উপকরণে তৈরী। কাঁঠালের বিচি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, ভাত আর বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ—এই ছিল আহার্য। কিন্তু গুরুর স্নেহে ও আন্তরিকতায় সে সামান্য আহার্যই অসামান্য হয়ে উঠেছিল।···

আবার, আহার সমাপ্ত হলে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দেওয়া, তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দেওয়া—সবই স্বামীজী নিজ হাতে করেছিলেন সেদিন। আর অভিভূত নিবেদিতা যেন ভাল করে নিবারণ করতেও সক্ষম হন নি। একবার মাত্র ভয়ে ভয়ে, অর্ধস্ফুটভাবে একটু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—'স্বামীজি, এসব তো আপনার জন্য আমারই করা উচিৎ, আমারই করবার কথা। আমার জন্য আপনার নয়।'

কিন্তু সে আপত্তি স্বামীজী গ্রাহ্য করেন নি। মুখে বলেছিলেন,—তা কেন, তুমি তো জান যীশু তাঁর শিষ্যদের পা পর্যন্ত ধুয়ে দিয়েছিলেন।—

'Jesus washed the feet of his disciples'—

কিন্তু সে কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর মুখে সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিল উত্তর—'সে তো শেষ সময়ের কথা'। —But that was the last time.

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-কথা আর তিনি উচ্চারণ করেন নি। তবে মনটি আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল। তথাপি স্বামীজীর কথায়, তাঁর উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে, এমন আশার আলো মাখান ছিল যে সে আশঙ্কা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে নি। স্বামীজীকে প্রণাম করে নিবেদিতা চলে এসেছিলেন কলিকাতায়।···

কিন্তু বস্তুত, সেই ছিল জীবনের শেষ প্রণাম, শেষ গুরু-দর্শন।— নিবেদিতার আত্মজীবনীতে আছে—

'There was nothing sad or grave about Swamiji in those days'…

পরন্তু, একটি দিব্য জ্যোতির্মণ্ডল সর্বক্ষণ যেন তাঁর দীর্ঘ তনুখানি উদ্ভাসিত করে রাখত। মনে হত যেন তাঁর স্থূল দেহটি লঘু হয়ে সেই জ্যোতি-তরঙ্গে, সেই লুমিনাস্ প্রেজেন্সে ভেসে বেড়াচ্ছে।…

আর বাইরে তাঁর পালিত পশুগুলি, তাঁর বাগান, তাঁর গ্রন্থাগারের নানা পুস্তক—এই সব নিয়েই ছিল তাঁর কথাবার্তা, তাঁর আলাপ-আলোচনা।…

কাজেই, কি করে নিবেদিতা অনুমান করবেন যে আর একটি দিন পরে, ৪ঠা জুলাই তারিখেই, মহাপ্রস্থান করবেন স্বামীজী। অন্যেই বা কি করে অনুমান করবে?

তাছাড়া, সেদিন—অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই, অনেকদিন পর তিনি বেশ সুস্থও বোধ করেছিলেন। বহুক্ষণ মঠের দ্বিতল ঠাকুর-মন্দিরে একাকী ধ্যান করেছিলেন—ঘরের সমস্ত দরজা জনালা বন্ধ করে দিয়ে, যা তিনি সচরাচর করতেন না। তারপর যখন মন্দির-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন—তখন সর্ব অবয়বে এমন এক প্রশান্ত নির্লিপ্ততা মাখান ছিল যা ইতিপূর্বে স্বামীজীর মধ্যেও সহসা দেখা যায় নি।—

সেদিন নিজ ইষ্টদেবতার কাছ থেকে বোধকরি এ জন্মের মত শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলেন বিবেকানন্দ। বলে এসেছিলেন,—এবার আমাকে ছুটি দিতে হবে ঠাকুর। একদা সমাধি-দ্বারে তুমি চাবি লাগিয়েছিলে। বলেছিলে, 'এখন চাবি দেওয়া রইল, মহামায়ার মহাব্রত উদ্‌যাপিত হলে আবার চাবি খুলে দেব।'

আজ সেই চাবি তুমি খুলে দাও, আমি যাব।…

সোপানশ্রেণী দিয়ে অবতরণ কালে কেউ কেউ সেদিন শুনতে পেয়েছিল, আপন মনে বলতে বলতে তিনি নেমে আসছেন:

'আজ আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে অবশ্য আরও অনেক বিবেকানন্দ জন্মাবে।'

এ সবই নিবেদিতা পরে শুনেছিলেন অপরের মুখে! তিনি নিজে ৪ঠা জুলাই আর মঠে যান নি।···

৪ঠা জুলাই অপরাহ্নের দিকে কিছুক্ষণের জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃতও পড়িয়েছিলেন স্বামীজী। তারপর গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড্ পর্যন্ত বেড়িয়ে এসেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। বেড়াতে বেড়াতে অনেক কথা বলেছিলেন। মঠের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছিলেন, দেশের কথা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব নানা পরিকল্পনার বিষয়ও উল্লেখ করেছিলেন। স্বভাবতঃই সকলে মনে করেছিল—স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন এবং সেজন্য অনেকদিন পর সবাই বেশ স্বস্তিও বোধ করেছিলেন।···

তারপর সন্ধ্যা হল। আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিত হল মঠের ঠাকুর ঘরে, ধ্বনিত হল ভাগীরথীর তীরে তীরে অসংখ্য দেব-মন্দিরে। অস্তাচলশায়ী সূর্যের স্বর্ণকিরণ অজস্র ধারায় গঙ্গার মৃদু তরঙ্গ-দোলায় প্রতিফলিত হল, বিলুপ্ত হল। ঈষৎ তমিস্রায় আবৃত হল সর্বচরাচর।···

বর্ষণ-সিক্ত বায়ু প্রবাহে ভেসে এল এই অশরীরী সু-স্বর সঙ্গীত—

'মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে—
ভ্রম কেন অকারণে!'

স্বামীজী প্রবেশ করলেন আপন কক্ষে। গবাক্ষপথে একবার দর্শন করলেন পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, প্রণাম জানালেন দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থভূমিকে। তারপর ঐ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে মুখ করেই ধ্যানস্থ হলেন। সে ধ্যান আর ভাঙল না। নিবেদিতার ভাষায়—

'It was the last time. The moment was come that has been foretold by his Master from the beginning...'

মহাশূন্যের প্রস্থানপথে মহাপ্রয়ান করলেন বিবেকানন্দ। স্থূল দেহটি, তরবারিহীন কোষটির মত, পড়ে রইল ধূলি-মলিন এই পৃথিবীর বুকে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

—আমি মহেশ্বর, সর্বভূতাশ্রয় আমি সেই পরমতত্ত্ব। মানুষ তা জানে না। আর জানেনা বলেই শুদ্ধ, সত্ত্বময় দেহে মনুষ্যাকৃতি অবলোকন করে আমাকে অবজ্ঞা করে।...

* * *

সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা ততক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্বামীজীর পুণ্য জীবনলীলাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে।...

নিবেদিতা তখনও সে সংবাদ, সে মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ পাননি। তবে, রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন এর আভাস তিনি পেয়েছিলেন। কারণ, সে রাত্রে সত্যই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বিতীয়বার দেহত্যাগ করলেন।...

পরদিন অতি প্রত্যূষে তাঁর কাছে লোক পাঠান হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ ছোট এক টুকরো কাগজে লিখে জানিয়েছিলেন—'গতকাল সন্ধ্যায় স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন।

নিবেদিতা মঠে এসে দেখলেন গুরুদেবের দেহখানি তখনও উপরের কক্ষেই শায়িত রয়েছে। তাতে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। মুখখানি দেখলে মনে হয় যেন তিনি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, যেন পরিপূর্ণ বিশ্রামে চক্ষু মুদ্রিত করে শুয়ে আছেন।...

নিবেদিতা ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করলেন। শুভ্র,

দীর্ঘ-শীর্ষ এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা স্থাপন করলেন গুরুর শ্রীপদপ্রান্তে, তারপর একখানা হাত পাখা নিয়ে নিরবে বীজন করতে শুরু করলেন সে দিব্য তনুখানিকে! চোখে অশ্রু নেই, কণ্ঠে শব্দ নেই—প্রস্তর-মূর্তির মত স্তব্ধ, শোকাহত নিবেদিতা। শুধু বিশ্রামহীন ধীরগতিতে হাতের পাখাটি সঞ্চালিত হচ্ছে ঘড়ির কাঁটার মত। আর কি করবেন তিনি? আর তাঁর কিছুই করবার নেই। এ জীবনের একটি পরম অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। আর ফিরবে না, কখনো ফিরবে না। সম্মুখের দীর্ঘ জীবনপথটি তৃণহীন উষরতায় একেবারে মরুভূমির মত মনে হচ্ছে।

নিবেদিতার অন্তর জুড়ে সে কী দুঃসহ বেদনা, কী মর্মভেদী হাহাকার! বিবেকানন্দ আর নাই। কিন্তু তিনি বলেছিলেন নিবেদিতাকে—

'As for myself I shall be true to you unto death'···সে আশ্বাসবাণী কি এখন নিবেদিতার মনে হয়েছিল? কে জানে?

সে পরম বিষণ্ণতার মধ্যে নিবেদিতার মনে কি চিন্তা, কি ভাব উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল তার অনুমান করবার স্পর্দ্ধা আমাদের নেই। আমরা শুধু কল্পনায়, দূর-বিসর্পিত অনুমানে সে বিষাদ-প্রতিমাকে দৃষ্টির সম্মুখে আনতে পারি, তাঁর নিষ্কলুষ গুরুপ্রেমের অসামান্যতার উদ্দেশে অকুণ্ঠ প্রণতি জানিয়ে ধন্য হতে পারি।···

এরপরের শেষকৃত্যাদির যে করুণ বিবরণ সেটি ইতিপূর্বে আমরা বিবৃত করছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ করব না। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে, বিল্ব-বৃক্ষমূলে, যেখানে আজ স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে, যে স্থানটি তাঁর শেষ-বিশ্রামস্থান হবে বলে তিনি নিজেই নির্দিষ্ট করেছিলেন,

যেখানে বসে দূর ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে একদিন গান গেয়েছিলেন—

বিল্ব বৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনব চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী
যোগী জটাধারী।…

সেইখানে, সেই চিহ্নিত ভূখণ্ডে চিতাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। চিতাগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে অভাগিনী, পিতৃহীনা নিবেদিতা। অদূরে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।…সব কাজ শেষ হতে রাত্রি হল। তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রির প্রথম যামে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করলেন নিবেদিতা।…

প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্বস্ব গুণত্রয় বিভাবিণী
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।

কিন্তু সে দারুণ মহারাত্রিও শেষ হল। সূর্যোদয়ে আবার পূর্ব-দিগন্ত উদ্ভাসিত হল। নিবেদিতা ভাবলেন—তবে, তবে মৃত্যু কি? মহারহস্যময়ী অমৃতরূপিনী মৃত্যু কে?

'I am the resurrection and the life'—একথা যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন।

'He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live'—এও তাঁরই অক্ষয় উক্তি।

তবে, স্বামীজীও কি পুনরুত্থিত হবেন শ্মশানের মহাশয্যা থেকে? তাঁর মুখেও তো এমন পুনরাগমনের কথা একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।…

'Several times in my life I have seen returning spirits; and once—in the week after the death of Ramakrishna Paramhansa the form was luminous.'… এতো স্বামীজীরই কথা। তবে?…

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে এ-জাতীয় চিন্তাই যেন

নিবেদিতাকে আচ্ছন্ন করেছিল, পেয়ে বসেছিল। তারপর সে বৎসরেই শেষ দিকে, 'বড়দিন' উপলক্ষ্যে শিবতীর্থ ভুবনেশ্বরের অদূরে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি পাহাড়ের পাদদেশে—স্বামীজীর কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত সঙ্গে—নিবেদিতা এক বিচিত্র অনুভূতি লাভ করেছিলেন। সে অনুভূতিস্পর্শে তদীয় শিরা-উপশিরায় অমৃত-রসধারা সঞ্চালিত হয়েছিল। শ্রীগুরুর দিব্য জীবনের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধসূত্রে নিজ মানসজীবন গ্রথিত করে নির্ভয় হয়েছিলেন নিবেদিতা। সে কথাটি এখানে বলব।…

* * *

উদয়গিরি, খণ্ডগিরি।…

একটি অপরিসর লাল পথরেখার দুই পার্শ্বস্থিত দুই যুগ্মপর্বত। দূরে লিঙ্গরাজ মহাপ্রভুর বিখ্যাত ভুবনেশ্বর মন্দির।

উদয়গিরির শিখর-প্রদেশ থেকে সে মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশ দেখা যায়। দেখা যায়—এক দূর বিসর্পিত জনহীন পথ, সধবার সীমন্তের সিন্দুর-রেখার মত সবুজ বনানীর মধ্যদিয়ে দূরে দূরান্তরে প্রসারিত।

কত শতাব্দী পূর্বে, খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, খণ্ডগিরি-উদয়গিরির পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে অনেক গুলি ছোট বড় গুহা খোদিত হয়েছিল। জৈন সাধুপুরুষদের আবাস-ভূমি ছিল সে সব গুহা। তাঁদের সাধন ক্ষেত্রও ছিল সে সব গুহা।

আজ সেখানে গেলে দেখা যাবে—গুহার অভ্যন্তরে অপূর্ব ভাস্কর্য নিদর্শন—প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত। দেখা যাবে—উদয়গিরির ইতিহাসখ্যাত স্বতঃ-খোদিত বৃহৎ হস্তী-গুম্ফা। আর তার অভ্যন্তরে কলিঙ্গেশ্বর খারবেলের শিল্প-সুন্দর শিলালেখ।

খণ্ডগিরির শিরোদেশে আরোহণ করলে দেখা যাবে একটি সুপ্রাচীন জৈন-মন্দির, কালের ভ্রুকুটি তুচ্ছ করে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ঐ শিখর-দেশেরই একাংশ আকাশস্থ দেবগণের সমতল

বিহার-ভূমি। অদূরে গভীর অরণ্যানী—বহু বন্য পশুর আবাস-স্থল।...

এইখানে, এই জনবিরল বিখ্যাত স্থানটিতেই সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে—নিবেদিতা প্রমুখ স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যা ক্রীষ্টমাস্-ঈভ্ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলেন।...

যে সময়টির কথা বলছি—সেটি এক অদ্ভুত, নির্জন পর্বত-সানুদেশের সন্ধ্যা। স্বভাবতঃই এক মহাশক্তির অস্তিত্ব যেন স্থান ও কালমাহাত্ম্যের অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয়! মনে হয়, মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়, পূর্ণচ্ছেদ নয়। মহাজীবনের অন্তহীন পথে মৃত্যু একটি স্তব্ধতা মাত্র, যতি মাত্র।

'স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে'—সর্বত্রই তিনি। সর্বভূতাশ্রয়ী হয়ে তিনি নিত্য বিরাজমান।...

তৃণাসনে বসে, ধুনি প্রজ্জ্বলিত করে পাঠ হচ্ছিল যীশুখ্রীষ্টের অনবদ্য জীবন কথা।—

'The Great life as a whole passed in review, then the Death : and finally the resurrection.'...

আরও এগিয়ে, গ্রন্থের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের এক একটি আখ্যায়িকা যেন অচিন্ত্যপূর্ব তাৎপর্য নিয়ে সেদিন, সেই অদ্ভুত স্তব্ধ সন্ধ্যায় নিবেদিতাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছিল! তাঁরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছিলেন—এরা কোন মামুলি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। দিন, ক্ষণ, তারিখ মিলিয়ে এদের মূল্য নিরূপিত হবে না। এদের মূল্য নিরূপিত হবে অনুভূতির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে, সূক্ষ্ম ধ্যানগম্য পথে অগ্রসর হবার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।...

রিসারেক্‌সন কি একটি বাহ্য, প্রত্যক্ষ ঘটনা? স্থূল দেহটি নিয়ে ঈশামাসির পুনরুত্থানই কি এর মর্ম কথা?

না, তা নয়। এ একটি স্পিরিচুয়েল পারসেপ্‌সন্,—যে পারসেপ্‌সনে অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিভাবে গুরু-শিষ্যের ইচ্ছাশক্তির

বিচিত্র মিলন ঘটে, জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় সূত্রে চিরবাঞ্ছিত তন্ময়তা আসে। একে ভাষার রেখাঙ্কনে চিত্রিত করা সহজ নয়, হয়ত সম্ভবই নয়।···নিবেদিতার ভাষায়—

'It was of sudden and unforeseen meetings of the will, returns of thought and love, brief upliftings of prayer, from One who had been resumed into His shining Self, and moved now on subtler and more penetrative planes of action than we, entangled amongst the senses, could conceive'

আর এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই এক তীব্র তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হল অন্তরে।—আর একবার কি স্বামীজীর দিব্যদর্শন লাভ করা যাবে, আর একবার কি তাঁর আশীর্বাদের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হওয়া সম্ভব হবে জীবনে?

কে জানে? নিশ্চিতভাবে এ-সব ব্যাপারে কে-ই বা কি বলতে পারে?

তথাপি নিবেদিতা পরিপূর্ণ আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন:

'একথা সত্য যে সে দিন খণ্ডগিরির সে অরণ্য-বিজনতায়, গুহা-গহ্বরের শত ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত পটভূমিতে, যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কাহিনীটি এক অনাস্বাদিত কল্পলোকে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, জাগ্রত করেছিল এই দৃঢ় প্রত্যয় যে একদিন বিস্মৃত-প্রায় অতীত যুগে কোন মহাপ্রাণ মহামানব পুনরুত্থানের অমৃততত্ত্ব যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারই স্মৃতিচিহ্ন অর্ধস্ফুট ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন উত্তর কালের সাধকবর্গের জন্য।

আর আমরা, আজ এই অন্ধকার শীতের রাত্রিতে তাঁদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছি মাত্র।···

'So we believed, so we felt, because in all its

elusiveness, a like revelation, at a like time, has made itself evident to us also.'

এখন প্রার্থনা করি,—আমাদের আচার্যদেবের চৈতন্যসত্ত্বাও কালকে অতিক্রম করে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রদীপ্ত হয়ে বিরাজ করুক। শুধু যেন নিষ্প্রাণ স্মৃতিতে নয়, শুধু একটি স্মরণীয় বস্তু হিসাবে নয়, পরন্তু একটি জীবন্ত ও জাগ্রত উপস্থিতি রূপে, শক্তি ও শান্তির শাশ্বত উৎসরূপে—তাকে যেন আমরা ধারণ করতে পারি।...

তাঁর যে কল্যাণতম রূপ, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমম্', তাঁর যে নিরবয়ব নিত্য-প্রকাশ 'বিশ্বভুবনম্ আবিবেশ', সেটি যেন আমাদের দৃষ্টিতে, আমাদের অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়, বিধৃত হয়,—

আবিরাবির্মএধি—

'May God grant that this living presence of our Master, of which death itself had not had power to rob us, become never, to us his disciples, as a thing to be remembered, but remain with us always in its actuality, even unto the end.'

॥:—*—:॥

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের কথা পূর্বাধ্যায়ে বিবৃত করেছি।

বিংশ শতকের প্রারম্ভমুখে, সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজীর দেহত্যাগ,—বাংলার অতিদ্রুত-পরিবর্তনশীল তৎকালীন ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সমগ্র বাংলার, তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ তখন ধীরে ধীরে বিপ্লব-বহ্নিতে ধূমায়িত হয়ে উঠছে, পাংশুবর্ণ ধারণ করছে। ঈষাণের বিদ্যুৎগর্ভ পুঞ্জমেঘে দিগন্তের চক্ররেখার দৃশ্যটি ভয়ঙ্কর। নিঃসন্দেহে, ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলনের অবিলম্বতা তখন চতুর্দিকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।

আফ্রিকায় বুয়রযুদ্ধের নৃশংসতায় ইংরাজ রাজশক্তির এক বর্বর রূপ সমগ্র সভ্যজগতের সম্মুখে তখন উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। ফলে, সেখানে

'উন্মথিত ইতিহাস
প্রকাশ লভিতেছিল অকস্মাৎ সৃষ্টিতে প্রলয়ে।'—

আবার, দূরপ্রাচ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে রুষ-জাপান যুদ্ধও তখন আসন্ন। 'ওয়ান এশিয়া'—একটি প্রকৃষ্ট নবচেতনার প্রতীকরূপে সবেমাত্র ক্বচিৎ কোন চিন্তাশীল মনীষীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে।

সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্য।—

সে সব ক্ষেত্রেও নবজাগরণের যুগ-লক্ষণ তখন সদ্য প্রকাশিত। একাধিক যুগন্ধর পুরুষের সাধনা ও মনীষায় নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি ও প্রতিভা সে সব ক্ষেত্রে দূর প্রসারী বিপ্লবের সূচনা করছে।

নতুবা, দীর্ঘ ইংরাজ-শাসনের ফলে জাতির আত্মসম্বিৎ তখন বিলুপ্ত-প্রায়, অতীতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধাও ব্যাপক। আর ধর্ম বা অন্তর-জীবনের প্রশ্ন? সে তো অনেকটা 'পরিহাস বিজল্পিতম্'। ইংরাজি ভাষা, ইংরাজি রুচি, ইংরাজি ঢং চোখে মায়া-কজ্জল মাখিয়ে দেশকে যেন মোহগ্রস্ত করেছে। সে ভয়াবহ অবস্থার পঙ্কিলতা থেকে সদ্যোনির্মিত ও সন্নিকট প্রশস্তবর্ত্মে প্রত্যাবৃত্ত হবার জন্য কঠিন তীক্ষ্ণ আহ্বান—বাংলার, তথা ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে বিবেকানন্দের অসামান্য অভ্যুদয়ের অন্যতম মুখ্য সার্থকতা।

'মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্বার আসে না বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করেনা।···

হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তি ক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি। বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র প্রবর্তনের সহায়তা কর।'

এই আহ্বান-ধ্বনির মহাকম্পন দেশের সর্বত্র তখন বিচ্ছুরিত হয়ে গেছে। যদিও স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠধ্বনি তখন নিরব।

সেই পটভূমিতেই ভারতবর্ষের জাতীয় কর্মক্ষেত্রের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়েছিলেন নিবেদিতা। যদিও প্রায় সকল দিক থেকেই তখন তিনি নিঃসঙ্গ ও একক।

সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ নয় বৎসর কালের সবটাই প্রায় সেই এক অবস্থা। অর্থাৎ, স্বামীজীর লীলাবসানের পর থেকে নিজের মৃত্যুদিবসটি পর্যন্ত

নিবেদিতার বহু-বিচিত্র কর্ম-সাধনা ও জীবন-সংগ্রাম সবই স্বকীয় প্রয়াসে ও দায়িত্বে উদ্‌যাপিত। সে কর্ম-সাধনার মোটামুটি তিনটি স্রোতধারা ছিল। একটি রাজনৈতিক, অপর তুইটি শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত। বাংলার তৎকালীন শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার যে সক্রিয় যোগাযোগ সেটিও তাঁর সাংস্কৃতিক প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত বলে আমরা ধরে নিচ্ছি।···

* * *

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের' তুইটি ধারা ছিল, আজও আছে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'···এই মন্ত্র-সাধনার মধ্যেই সে ধারা তুইটি সহজভাবে মিলিত। যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে একটি ধারা আত্ম-মুক্তির নিগূঢ় তপস্যার জন্য পরিকল্পিত। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তার পন্থা, তার মোডাস্ অপারেণ্ডি। অপর ধারাটি নিষ্কাম জীবসেবার জন্য বিহিত। সে জীবসেবা একটি ব্রতস্বরূপ। তার উদ্‌যাপন কালে সেবককে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরে থাকতে হবে, গঠনমূলক পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। জীবসেবার মাধ্যমে শিববোধ সে অন্তরে জাগ্রত করবে, অথবা শিববোধ নিরবধি অন্তরে বহন করে জীব-সেবায় নিজকে বিলিয়ে দেবে, মিশিয়ে দেবে। কর্ম-মুখর হবে তার ধর্ম, ধর্মাশ্রিত হবে তার কর্ম। ফলে, যথাকালে 'যথার্থ মানুষ' তৈরীর শক্তিশালী যন্ত্ররূপে, ম্যানমেকিং মেশিনরূপে এ-সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ করবে।···

নিবেদিতার জীবন-সাধনার সঙ্গে এর কোন বিরোধ ছিলনা, প্রতিকূলতা ছিল না। কিন্তু বিরোধ ছিল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রশ্ন নিয়ে। তুর্ভাগ্যক্রমে, স্বামীজীর দেহত্যাগের পক্ষকাল মধ্যেই সে বিরোধ এক কঠিন সংকটের আকারে দেখা দিল।

'প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে'রই মত যেন সে বিরোধ।

স্বামীজীর জীবিতাবস্থায়ই অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি নানাভাবে নিবেদিতার গভীর সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতের মাটিতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করে মাদ্রাজে সর্ব-সাধারণে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন,—যে বক্তৃতার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি,—সে বক্তৃতা নিঃসন্দেহে ইংরাজ-শাসনের বিরূদ্ধ-সমালোচনায় পূর্ণ ছিল এবং রাজশক্তির শ্যেনদৃষ্টিও সে জন্য তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এমন কি, এরও পূর্বে, নরওয়ের নির্জন-বাসের দিনগুলিতেও ভারতের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে পরাধীনতার অভিশাপের বিরূদ্ধে নিবেদিতার যে তীব্র অভিযোগ ও ধিক্কার নানা পত্রের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল—ইংরাজ সরকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেটিও লক্ষ্য করতে ভোলে নি।

এখন স্বামীজীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে একেবারে প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি ভাবেই নিজকে যুক্ত করে দিতে লাগলেন নিবেদিতা। যদিও সেটি যথার্থ সক্রিয় সংযোগ নয়। তথাপি, বিরোধের উদ্ভব হল সেইখান থেকে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখটির কথা আমরা বলছি। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সভাপতি তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। উভয়েই নিবেদিতার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, উভয়েই তাঁর পিতৃতুল্য, নমস্য।

নিবেদিতাও তাঁদের একান্ত স্নেহাস্পদা, 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া'। নিবেদিতার নানা গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দের যে সব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে সে সব তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। নিবেদিতার উত্তর জীবনের আচার আচরণে, লেখনীর ছত্রে ছত্রে তদীয় অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের বহুল প্রকাশ দেখা যায়।

তথাপি, প্রশ্ন এল। নিবেদিতাকে স্থির করতে হবে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকবেন, অথবা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ থেকে

দূরে থাকবেন। রাজনীতি ও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এক কর্মপন্থায় বিশ্বাসী নয়। তাদের প্রণালী স্বতন্ত্র, লক্ষ্য স্বতন্ত্র। সুতরাং, তাঁর পক্ষে দু'দিকের সম্পর্ক একই সঙ্গে বজায় রাখা সঙ্গত হবে না। এক দিক তাঁকে বেছে নিতে হবে।

সাক্ষাৎ আলোচনা হল একাধিক দিন। তারপর নিয়মানুগ-ভাবে বা অফিসিয়েলি সঙ্ঘগুরুর নিকট থেকে পত্র প্রেরিত হল নিবেদিতার কাছে। তাঁর চরম সিদ্ধান্ত যেন যথাসত্বর তিনি জানিয়ে দেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল উত্তর। সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর যেটুকু সাধ্য সেটুকু তিনি করবেন। সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর শ্রমদান সামান্য হতে পারে কিন্তু সে তুচ্ছ নয়। ঠিক অনুরূপভাবে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর স্বকীয় দান সামান্য হলেও কালের বিচারে হয়ত সেটা তুচ্ছ হবে না, কাজেই তাঁর যথাসাধ্য তিনি করবেন এবং সেজন্য প্রয়োজন হলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দূরেই থাকবেন তিনি। ১৮ই জুলাই তারিখের পত্রটি তাঁর এইরূপ ছিল :

17 Bosepara Lane, Bagbazar.
Calcutta. July 18th, 1902

Dear Swami Brahmananda,

Will you accept on behalf of the Order and myself my acknowledgment of your letter received this evening. Painful as the occasion, I can but acquiesce in any measure that are necessary to my complete personal freedom.

I trust, however, that you and other members of the Order will not fail to lay my love and

reverence daily at the foot of the ashes of Sri Ramakrishna and my beloved Guru.

I shall write to the Indian papers and acquaint them as quietly as possible with my changed position.

Yours in all gratitude & good faith
Nivedita of Ramakrishna

বাংলায় এ পত্রখানির অনুবাদ এইরূপ হতে পারে :

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সন্ধ্যায় আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে তার প্রাপ্তি-স্বীকার গ্রহণ করবেন। ঘটনাটি আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। তথাপি, আমার ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ব্যবস্থা মেনে নিতেই আমি সম্মত।

তবে, আমার এই বিশ্বাস এবং আকুতি যে প্রতিদিন আপনি এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ যেন আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘটুকু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং আমার গুরুদেবের দেহভস্মের বেদীমূলে নিবেদন করে দেন। জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতে যথাসম্ভব সহজ ভাবে আমার পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দেব।

আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানবেন।
শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা।

পরদিনের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হল :

'We have been requested to inform the public that at the conclusion of the days of mourning for the Swami Vivekananda it has been decided between the members of the Order at Balur Math and Sister

Nivedita that her work shall henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction of authority.'

একদিন পূর্বে, অর্থাৎ ১৭ই জুলাই পর্যন্ত যাঁর উৎসর্গীত জীবনের পরিচয় ছিল—'Nivedita of the Ramakrishna Order,' রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নিবেদিতা,—একদিন পর, অর্থাৎ ১৮ই জুলাই তারিখেই তাঁর পরিবর্তিত পরিচয় হল—'Nivedita of Ramakrishna'—শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা। সঙ্ঘের আর তিনি কেউ নন। পরে অবশ্য আরও একটু পরিবর্তিত করে নিজকে তিনি—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা, 'Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং সে নামেই আমৃত্যু তিনি পরিচিতা ছিলেন সর্বত্র।

সে যাই হোক, এমনি ভাবেই এক মহাকালান্তর ঘটে গেল নিবেদিতার জীবনে,—তাঁর অন্তর-জীবনেও বটে, কর্ম-জীবনেও বটে।

এই বিশেষ ঘটনাটির উপর নিবেদিতার নানা চরিতকার নানাভাষ্য রচনা করেছেন, নানা দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণে। কেউ কেউ অনুমান করতে চেয়েছেন স্বামীজীর উপস্থিতির কথা, তাঁর জীবিতকালের কথা। যদি স্বামীজী জীবিত থাকতেন, যদি তাঁর দেহত্যাগ না ঘটত, তবে কি হত? নিবেদিতা কি তথাপি সঙ্ঘচ্যুত হতেন? অথবা, তাঁর কর্মপন্থাই কোন একটি আপস-সূত্রে নবরূপ পরিগ্রহ করত?

এ অনুমানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়, সম্ভব নয়।

স্বামীজীর সর্বগ্রাসি দেশপ্রেম নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সত্য। নিবেদিতারই ভাষায়—

'He was a born lover, but the queen of his adoration was his Mother-land.'

নিজ জন্মভূমির দোষ-ত্রুটি অবশ্য তিনি কখনো মার্জনা করেন নি। কঠিনতম ভাষায় তাদের উপর তিনি আঘাত হেনেছেন। কিন্তু সে কেবল এই মনোভাব থেকে যে সে-সব দোষ ও দুর্বলতা তাঁর নিজেরই দোষ, নিজেরই দুর্বলতা।

'There was no cry of fear, no tremor of weakness, no shrinking from mortification, that he had known and understood.'

সে ভারতবর্ষের পরাধীনতা ছিন্ন হোক, স্বাধীনতার চির-আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতে সে অবিলম্বে উত্তীর্ণ হোক—নিঃসন্দেহে এই তাঁর জাগরণের ধ্যান ছিল, নিদ্রার স্বপ্ন ছিল। প্রাচীনা এই ভারতভূমি নব-সাধনায়, নব-কলেবরে নূতন জন্ম লাভ করবে,—শতাব্দী অন্তে আবার এদেশের বুকে জন্মগ্রহণ করে যৌবন-শক্তিশালিনী জননী-জন্মভূমির কমনীয় কান্তি দর্শন করে তিনি কৃতার্থ হবেন, ধন্য হবেন—এই তাঁর অন্তরের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল।

'I feel myself to be the man born after many centuries. I see that India is young.'···এ সবই স্বামীজীর হৃদগত বাণী, নিভৃত মর্মকথা। কিন্তু তবু, তৎপ্রবর্তিত ধর্মচক্রের আবর্তন-বিধানে রাজনীতির কোন স্থান ছিল না। সেখানে ঈশ্বর এবং সত্যই ছিল নীতি। আর সব তুচ্ছ, আর সব গৌণ।

'God and truth are my only politics—all else is trash.'

শিক্ষার মধ্য দিয়ে, সেবার মধ্য দিয়ে বেদান্তের অভীমন্ত্র দেশের কুটীরে কুটীরে, দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে—রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সেই হবে সঙ্কল্প, সেই হবে সাধনা।

'My idea is to bring to the door of the meanest, the poorest, the noble ideas that the human race has

developed both in and out of India and leave them think for themselves.'

সুতরাং, সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ যখন নিবেদিতার সম্মুখে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন—'হয় তুমি রাজনীতির সম্পর্ক ছেদন কর, অথবা সঙ্ঘের সম্পর্ক ছেদন কর'—তখন তাঁরা স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। তার বিপরীত আচরণ করেন নি।

অপর দিকে, নিবেদিতা যে দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিষয়টি চিন্তা করেছিলেন এবং যে জন্য সঙ্ঘের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না রাখারই সিদ্ধান্ত করেছিলেন—তার পশ্চাতেও কয়েকটি বিশেষ যুক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তাদের মধ্যে প্রধানতম ছিল তাঁর রক্তধারা, তাঁর অসামান্য গুরুপ্রেম।...

আয়র্ল্যাণ্ডের মাটিতে নিবেদিতার জন্ম। সে দেশের জল বায়ুর প্রভাবে তাঁর ধমনীতে যে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত ছিল তার কণায় কণায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুপ্রবিষ্ট ছিল এক দুঃসহ জ্বালা, এক বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ কোন কম্প্রোমাইজ জানে না, কখনো মাথা নত করে না। হয়, পরাধীনতার কঠিন নিগড় চূর্ণ করে শিকলদেবীর পূজা-বেদীকে সে ধূলি-বিলুণ্ঠিত করবে, অথবা নিজের অন্তর্জ্বালায় নিজেই পুড়ে, ঝল্‌সে খাক্ হয়ে যাবে।
এই বিদ্রোহ-বহ্নি নিবেদিতার প্রকৃতির মধ্যেই নিরুদ্ধ ছিল।

স্বামীজীর সীমাহীন দেশ-প্রেম তাতে জুগিয়েছিল ইন্ধন। কতদিন, কত ঘটনাচক্রে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে, ভারতবর্ষের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে মুহূর্তে সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্রের অন্তরাল থেকে—এক রুদ্রমূর্তি যোদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হত।—

'And when he would lose himself, in splendid scorn of apology for anything Indian, in fiery repudiation of false charge or contemptuous criticism

or in laying down for others the elements of a faith and love that could never be more than a pale reflection of his own, how often did the habit of the monk seem to slip away from him, and the armour of the warrior stand revealed !'

এ দৃশ্য তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। কথিত আছে, একদা উত্তরকালে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র নিবেদিতাকে সস্নেহে ভর্ৎসনার সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করেছেন ? কেন স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন ?

তিনি স্বামীজীর মানস-কন্যা, তাঁর অতি সমাদরের পাত্রী। অথচ তিনিই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে রাজনীতির পথ ধরলেন,—যা স্বামীজী কখনো অনুমোদন করেন নি। জীবিত থাকলে আজও করতেন না।—এ সিদ্ধান্ত নিবেদিতা কেন করলেন ?

কিয়ৎক্ষণ নিরব থেকে, রুদ্ধ আবেগে উত্তর করেছিলেন নিবেদিতা,—শুনুন জি, সি—লুক হিয়ার। আপনি আমাকে স্নেহ করেন, আপনি হয়ত আমার কথা বুঝবেন।

স্বামীজীকে আপনারা কি চোখে দেখেছেন জানি না। ভারতবর্ষের পরাধীনতার বিষ-জর্জরতায় তাঁর যে কি মর্মদাহী বেদনা ছিল, সে আপনারা কতখানি লক্ষ্য করেছেন তাও আমার জানা নেই।

কিন্তু আমি দেখেছি। দেখেছি কাশ্মীরে, দেখেছি চলতিপথে তীর্থভূমিতে, সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায়, দেখেছি কথায়, আলোচনায় ও লেখনীর মধ্যে। দেখেছি বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে।...

জননী জন্মভূমির পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি কী তীব্র, তীক্ষ্ণভাবে তাঁর মর্মমূলে আঘাত হানত, রক্তোচ্ছ্বাসে থম্‌থম্‌ মুখমণ্ডল—রুদ্ধ, স্ফুরিত-কেশর সিংহের মত সে কি নিরুপায় অস্থির পাদচারণ—

'The struggle and torture of a lion caught in a net.'—

সে কি আমি দেখি নি? দেখেছি। দিনে দেখেছি, রজনীতে দেখেছি। এদেশে দেখেছি, বিদেশে দেখেছি।—

কাশ্মীর উপত্যকায় একটুক্‌রো জমির জন্য ইংরাজ-রাজকর্মচারীর কাছে তাঁর অবিশ্বাস্য অপমান, আর তার প্রতিকার-অসামর্থ্যে স্বামীজীর সেই অসহনীয় ব্যর্থ বিক্ষোভ! সে কি আমি ভুলব? আমার দেহের অণুতে পরমাণুতে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ত থর থর করে কাঁপছে।

যে দিন আমার শরীরের রক্ত শুকিয়ে যাবে, যেদিন মৃত্যুর স্পর্শে আমি ধূলিতে মিশিয়ে যাব—সেই দিন, হয়ত সেই দিন আমি ভুলব আমার গুরুদেবের সে দুঃসহ বেদনার মর্মান্তিক জ্বালার স্মৃতি। কিন্তু তার আগে নয়।

তাছাড়া, স্বামীজী পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন, পরাধীনতার গ্লানির মধ্যেই দেহরক্ষা করেছেন—এ চিন্তাটিও আমার কাছে অসহ্য। কাজেই, এদেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য আমার সাধ্যমত চেষ্টা না করে আমি পারব না, সে আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। তবে এও সত্য যে রাজনৈতিক আন্দোলনই তো জাতিব সর্বাবয়ব আন্দোলন নয়। এ তার একটি আংশিক প্রচেষ্টা মাত্র। সুতরাং, আমাকে এ অনুরোধ আপনি করবেন না জি, সি। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা কবি।

এরপর গিরিশচন্দ্র আর কোন অনুরোধ করেন নি নিবেদিতাকে।…

এ ভিন্ন আরও একটি কথা ছিল।

স্বামীজী বলতেন,…'It is good to be born in a church but it is dangerous to die there.'—সেকথাও নিবেদিতা কখনো বিস্মৃত হন নি। চার্চিয়ানিটির চাইতে খ্রীষ্টিয়ানিটি চিরদিনই তাঁর কাছে বরণীয় ছিল, অনুসরণীয় ছিল। কাজেই, নিবেদিতার যে সিদ্ধান্ত তার পশ্চাতেও যুক্তি ছিল, বিচক্ষণ বিশ্লেষণ ছিল।

সর্বোপরি, আমাদের দেশের ক্ষমতা-লোলুপ, স্বার্থবদ্ধ যে পঙ্কিল রাজনীতি তার আবর্তের মধ্যেও প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতা কোনদিন প্রবেশ করেন নি। তিনি যে রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন যে জাতীয়-জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মর্মকথা এই ছিল—

'National Union in India must be the gathering up of the scattered spiritual forces. A Nation in India must be the union of those whose hearts beat to the same spiritual tune.'

অতএব, কোন পক্ষকেই দোষারোপ করবার কোন হেতু নেই। কোন যুক্তি নেই।

বস্তুত, এই বিপুলা পৃথিবীতে নিরবধি কাল আপন প্রবাহে অনন্ত অভিমুখে চলেছে। অদৃশ্য মহাশক্তি তাকে নিয়মিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে। অসহায় মানুষ সে নিয়ন্ত্রণ-গণ্ডী অতিক্রম করে কোথায় যাবে? কি ভাবে যাবে? শুধু একটি কথা সূচি-বিদ্ধতার মত আমাদের মনকে ক্লিষ্ট করে। সেটি সময়ের প্রশ্ন। স্বামীজীর দেহত্যাগের ছ-মাস, ন-মাস পরে যদি ঘটনাটি হত, পনর দিনের মধ্যে না হত, তবে সেটি এত বেদনাদায়ক হত না, সাধারণ বিচারে দৃষ্টিকটুও হত না। কিন্তু যাক্ সে কথা।...

সঙ্ঘের নিয়মশৃঙ্খলা থেকে এ ভাবেই মুক্ত হয়েছিলেন নিবেদিতা, এবং মুক্ত হয়েই কর্মের আবর্ত-মধ্যে যেন তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মশক্তি, তাঁর প্রতিভা ও স্বাধীনচিন্তা— কর্মক্ষেত্রে অচিরে তাঁকে একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। দেখতে দেখতেই সতের নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ীটি যেন সমগ্র ভারতবর্ষের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল। শুধু বঙ্গদেশের নয়, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের যাঁরা নেতৃস্থানীয়, যাঁরা রাজনীতিক্ষেত্রে, সাহিত্য ও শিল্পেরক্ষেত্রে নবযুগ আনয়নের নেশায়

মেতে উঠেছেন, সংবাদপত্রে নূতন-ধারা প্রবর্তন করতে আগ্রহশীল, তাঁদের বহুজনের আসা যাওয়ায়, আলাপ-আলোচনায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় ঐ অপরিসর ক্ষুদ্র গৃহটি যেন একটি বিশিষ্ট কর্মকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়ে উঠল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধের সে সময়ে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলন আর সন্ত্রাসবাদের অগ্নু্যদ্গারের প্রত্যাসন্নতায় দেশের আকাশ প্রায় অন্ধকার, থম্ থম্ করছে।

সুতরাং, কোন বিলম্ব না করে স্বামীজীর দেহত্যাগের বেদনা ও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ থেকে বিচ্যুৎ হবার আকস্মিক আঘাত, সব দূরে ঠেলে দিয়ে সমগ্র বঙ্গদেশকে অনড়তার মহাপঙ্ক থেকে টেনে তুলবার দুরূহ কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন নিবেদিতা। ঠিক একালেই মিসেস লিগেটের কাছে লিখিত একটি পত্রে নিবেদিতার তদানীন্তন মনোভাবের আংশিক প্রকাশ আছে। পত্রটি এইরূপ :

আমাদের কাছ থেকে স্বামীজী চলে গেছেন, চিরদিনের মত গেছেন। জীবনের সান্ধ্যবন্দনা সমাপ্ত হয়েছে, সমাপ্ত হয়েছে মুক্তির সন্ধান। তাঁর সেবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ হয়ে আছে। পরিণাম যাই হোক।

এর জন্য যদি সুদীর্ঘকাল আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তবে তাতেও আমি সম্মত আছি।

সে কাজ করবার শক্তি, বিশ্বাস এবং জ্ঞান যেন আমি লাভ করি—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা, একমাত্র আকুতি। আর কোন কামনা আমার নাই।

আমাদের প্রিয় আচার্যদেব মরেন নি, তিনি আছেন। নিয়ত আমাদের সঙ্গেই আছেন।

শোক করবার অবকাশও আমার নেই। আমি তাঁরই কাজে ডুবে যেতে চাই, মগ্ন হয়ে যেতে চাই'—ইত্যাদি।

বস্তুত মগ্নই তিনি হয়েছিলেন। এবং সেই মগ্নতার মধ্য

থেকেই অপরিসর আট-নয় বৎসরের জীবিতকালে—বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে চিনতে পেরেছিল, তাঁর কল্যাণ-হস্তের সেবা লাভে কৃতার্থ হয়েছিল। সে নিবেদিতা শুধু বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতা নয়, শ্রীশ্রীমায়ের আদরের খুকুও নয়। সে নিবেদিতা ভারত-ভগিনী নিবেদিতা।

শিক্ষার দীপশিখাটি দৃঢ়হস্তে ধারণ করে সে নিবেদিতা বাংলার জন-জীবনের তমসাচ্ছন্ন পথে এগিয়ে চলেছেন,—শ্বাসে শ্বাসে জপ করেছেন এই মন্ত্র—আলো, আরো আলো। 'Light, more light.'···

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সে নিবেদিতা ধারণ করে আছেন এক শক্তি-উৎস লেখনী, যে লেখনী অশ্রান্ত রচনায় নিরত। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে, নানা মৌলিক গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সে লেখনী ভারতীয় জীবন-দর্শনের মর্মকথা চিত্রিত করছে, ভারতীয় সভ্যতার সার-নির্যাস বিশ্লেষণ করছে। আহ্বান করছে দেশবাসীকে আত্মচেতনার পথে, কর্মোদ্যমের পথে।

সে তপোবীর্যমহৎ নিবেদিতার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে পথিকৃৎ বিবেকানন্দেরই মহাশিক্ষার মহাভাষ্য ও তাৎপর্য।···

স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য জীবনে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতা ও গভীর দেশপ্রেম শোভন সামঞ্জস্যে সমন্বিত হয়েছিল। অমন মহৎ, হৃদিবান দেশ-প্রেমিকও যেমন পৃথিবীতে খুব বেশী জন্ম গ্রহণ করেনি, অমন অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারীও তেমনি খুব বেশী দেখা যায় নি।

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির এক সঙ্কটময় দিনে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। সে আবির্ভাবের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। প্রাচীনের দুর্লভ উপকরণে নবযুগের জীবনস্বপ্ন—ঐ আবির্ভাবের রসায়নেই সার্থক হবে।

হিন্দুধর্মের মধ্যে, বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে যে একটি সার্বজনীন

ভূমিকা রয়েছে তারই অনুসন্ধানে মহামরণের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছিলেন।

তাঁর মন্ত্র বীর্যের মন্ত্র, অভীর মন্ত্র। তাঁর স্বপ্নের যে ভারতবর্ষ সে এখনো ভাবীকালের গর্ভে নিদ্রিত।

আজ দিকে দিকে নানা দুঃখ-বেদনার সংঘাতে যে জাগরণ-লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সে শুধু এক মহাবিবর্তনের উদ্যোগপর্বের অবস্থা।...

'পরানুকরণের মোহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও। নিজের অতীতে বিশ্বাস কর, জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরব বোধ কর। আর সেখান থেকে, অতীতের সেই সম্পদ-সমৃদ্ধ গর্ভগৃহ থেকেই, ভবিষ্যতের জন্য উপকরণ আহরণ করে নূতন পথ নির্মান কর। Find away or make it.

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। ওঠ, জাগ। সংগ্রাম-সাধনায় বিরত হয়োনা, লক্ষ্যে না পৌঁছে থেমে যেও না।'

নিবেদিতার কণ্ঠে এখন এরই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।...

আবার শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রেও সে নিবেদিতা—তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাধকগণের সুযোগ্য সহকারিণী, উত্তম উৎসাহদায়িকা।

স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণকালে অর্থ-সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় নিবেদিতা যখন নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখনও তাঁর একটি বিশেষ মূল্যবান বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল—'ভারতীয় শিল্প।'

অবনীন্দ্রনাথ, অসিত হালদার, রণদা বাবু, কুমারস্বামী, হ্যাভেল—প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে তিনি একনিষ্ঠ এক শিল্প-সাধিকা, শিল্পের অন্তর্নিহিত শিব-সুন্দরের এক অনন্য উপাসিকা।...

রাজনীতি ক্ষেত্রেও সে নিবেদিতা এক অকম্পিত অগ্নি-শিখার মত দীর্ঘ ও দীপ্তিময়ী। পরাধীনতার সকল বন্ধনকে সে ভস্মীভূত করতে চায়, সকল অমর্যাদাকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়। তার

আচার্যদেবের জীবনে সে যেমন প্রত্যক্ষ করেছিল—মুক্তির জন্য এক অব্যাহত উন্মাদনা, এও তেমনি এক উন্মাদনা :

'To accept nothing, however, pleasant if it concealed a fetter ; at a word to stand ready to sever any connection that gives a hint to bondage.'...

তাই, এ ক্ষেত্রেও একাধিক নেতৃস্থানীয় মনীষীর তিনি সহায়িকা ও সহকর্মী।...

এরূপ বিচিত্র, বহুমুখী প্রতিভা ও অসামান্য কর্মশক্তি—অথচ তাদের পশ্চাতে এক ধ্যান-নম্র, নিরব জীবন-সাধিকা, অহর্নিশি গুরুদত্ত-মন্ত্রের অজপা জপে নিরতা—এই নিবেদিতা। একদিকে সিংহীর মত তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণধার ইস্পাত খণ্ডের মত অনমনীয়া, অপরদিকে সরলা গ্রাম্য বালিকারই মত একান্ত বিনম্র পদ-চারিণী, ভারতমাতার বেদীমূলে সর্বাংশে নিবেদিতা। সে সমন্বয় সুদুর্লভ, সে সমন্বয় বিচিত্র সৌন্দর্যে মহিমান্বিত। ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতি নিয়ত তার প্রকাশ হয়েছে।...

একদিনের কথা বলছি। সেদিন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে নিঃসঙ্গ নিবেদিতা—'হিন্দু' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করছিলেন আত্ম-সমাহিত অবস্থায়। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ, ক্লান্ত মন। তথাপি কর্মের শেষ নেই, লেখনীর বিশ্রাম নেই। লেখাটি পরদিনই কাগজে দিতে হবে।

বিষয়—জাতীয়-জীবনে বিবেকানন্দ।

লেখা যখন শেষ হল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। জীব-জগৎ ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগে। প্রবন্ধটি টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে হঠাৎ নিবেদিতার চোখে পড়ল ফ্রেমে-আঁটা স্বামীজীর পুরাতন ফটোখানার দিকে। একদিন নিজ হস্তে ফটোখানি উপহার দিয়েছিলেন স্বামীজী। সে আজ কতদিনের কথা। দেবার সময় আশীর্বাদ

জানিয়ে বলেছিলেন—'নিবেদিতা, ভারতের পুনরুদ্ধার কল্পে তোমার সেবা সার্থক হবে। চিন্তা করোনা, হতাশ হয়ো না।'…

আজ অকস্মাৎ রজনীর ধ্যান-মৌনতার মধ্যে সেদিনের মধু-স্মৃতি অকস্মাৎ কল্পনায় ভেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অতি গভীরে যেন স্পর্শ লাভ করলেন মৃত্যুঞ্জয় সে মহামানবের। শুনতে পেলেন—যেন এই আশ্বাস :

'আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।'…এই নিবেদিতা।

একদিন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই তিনি প্রথম জেনেছিলেন ব্রহ্মাবর্ত এই ভারতবর্ষকে। দেখেছিলেন তার অতীতের ব্রহ্ম-বিহার, বর্তমানের সমস্যা-কাতরতা আর ভবিষ্যতের শত স্বপ্ন, শত বিরাট পরিকল্পনা।

আর আজ, বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর যে পরিবর্তিত পট-ভূমি, সে পটভূমিতে তাঁরই পুণ্যস্মৃতির অঞ্জন চোখে মেখে তিনি দেখছেন ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দকে।

ভারতবর্ষ কি ছিল, কি হয়েছে আব অদূর ভবিষ্যতেই বা সে কি হতে পারে—সবই যেন মূর্ত হয়েছিল ঐ একটি জীবনের সীমারেখার মধ্যে।

A condensed India—ঘনীভূত ভারতবর্ষ, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি যেন এইকালে বাস্তব হয়ে উঠেছিল নিবেদিতার কাছে—ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

ভারতবর্ষের বাণীই বিবেকানন্দের বাণী। আবার বিবেকানন্দের মধ্যেই ভারতাত্মার জীবন্ত প্রকাশ। আর এ-দুয়ের মধ্যে যে সার্থক, সর্বতোভদ্র সমন্বয়—সে সমন্বয়ের সম্যক উপলব্ধিই নিবেদিতার কর্মজীবনের দিগ্‌দর্শন, তাঁর ধ্যান-জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি এবং ঐ ভিত্তির উপরই তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনাশৈলী—

* 'আমার আচার্যদেব—যেমনটি দেখিয়াছি'—গ্রন্থের প্রণয়ন।

ঐ গ্রন্থের মান-নির্ণয়ে অধ্যাপক টি, কে, চেইল এই মন্তব্য করেছিলেন :

'This book may be placed among the choicest religious classics, below the various scriptures on the same shelf with the Confession of St.Augustine and Sabatiers Life of St. Francis.'

শুধু তাই নয়, এরই ফলে এ-কালেই কলিকাতায়, অধুনা বহুখ্যাত 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' প্রতিষ্ঠা। সেদিন 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিবেদিতা যে উক্তি করেছিলেন সেটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নিবেদিতা বলেছিলেন :

'মানুষ-বিবেকানন্দের পূর্ণ পরিচয় আমাদের দেখা প্রয়োজন। অর্ধ-পৃথিবী পর্যটনের ফলে বিবেকানন্দের মনে যে বলিষ্ঠ ও উদার জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল সে বোধের উত্তরাধিকার আমাদের। কঠোর তপস্যা সহায়ে সে উত্তরাধিকার আমরা গ্রহণ করব। অখণ্ড এই আর্যাবর্তের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করে, স্বামীজীর গ্রন্থাবলী এবং পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে যথাযথ ইতিহাস বোধ আমরা জাগ্রত করব। নূতন যুগের আশা ও স্বপ্ন যাতে প্রাচীন যুগের সাধনার অনুবর্তী হয়ে সফল হয় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সভ্যগণ তাই করবেন। স্বামীজীই আমাদের মহান জাতীয় নেতা।'…

এম্নি চিন্তা এবং ব্যাপক কর্ম-অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে নিবেদিতার তৃতীয় নেত্র উন্মিলিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাঁর শ্রুতিযন্ত্রের পর্দায় পর্দায় ধ্বনিত হয়েছিল সেই রহস্যময় সুরতরঙ্গ, ইতিহাসের সেই অস্ফুট পদধ্বনি 'Foot-falls of Indian History'—গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যে পদধ্বনির বন্দনা-গীতি রচিত।

হে মাতা, হে বিশ্বজননী
শুনি মোরা অতি মৃদু তব পদধ্বনি।
যুগ যুগ ধরি,
হেথা-হোথা স্পর্শি ধরিত্রীরে—
উন্মিলিত করি তাহে শত পঙ্কজেরে
গড়িয়াছ শাস্ত্র তুমি,
গড়িয়াছ কাব্য, হর্ম্য, মহানগরীরে।
মহান প্রয়াস যত সত্যের সাধনা
তব পদধ্বনি হতে তারা লভেছে প্রেরণা।
কোন্ লক্ষ্যে মৃদু তব চলে পদধ্বনি,
কহ মাতা অর্থ তার, কহ মোরা শুনি।
করো দেবী, সেই আঁখি দান,
তমিস্রারে ভিন্ন করে,
উচ্চ ভাব ধরিবারে
        লভি যাহে দৃষ্টি সুমহান।
এসো মাগো, মুক্তি প্রদায়িনী
ভূমা তুমি, ধাত্রী তুমি—সবার জননী।
তোমারই সন্তান মোরা—
চির-শিশু মানবক দল;
অন্তরেতে রাখ মা চরণ
        অলক্ত বরণ,
প্রস্ফুটিত কর শতদল।
কহ পুনঃ কোন্ লক্ষ্য মানি,
চলে মাগো তব পদধ্বনি।...

ঐ পদধ্বনি, ঐ অস্ফুট, অদৃশ্য আহ্বানই নিবেদিতাকে অনির্দিষ্ট, দুর্গম কর্মপথে এনে দাঁড় করিয়েছিল। রাজনৈতিক বন্ধুর পথে তাঁর পাদবিক্ষেপেরও সেই যথার্থ মর্মকথা।...

আবার, ঐ আহ্বানই 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে—ভারত-পরিক্রমায়ও তাঁকে বহির্গত করেছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে, স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য, স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের ইতিহাস-খ্যাত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজীর বাণী-প্রচারই ছিল অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য।...

স্বামী সদানন্দ আর নিবেদিতা—এক আচার্যের দুইটি সন্তান, —ভ্রাতা-ভগ্নীর অনবদ্য স্নেহ-প্রীতিতে চিরদিন আবদ্ধ ছিলেন।

সদানন্দের জীবনকথাও সাধারণ নয়। একদা এক প্রসন্ন প্রত্যুষে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের প্রায় শেষ পর্বে হাত্‌রাস রেল স্টেশনে সদানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তিনি শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, হাত্‌রাস স্টেশনের স্টেশন-মাষ্টার।

বাস্তব ঘটনা অনেক সময় উপন্যাসের কাহিনীর চাইতেও বিচিত্র হয়ে থাকে। Facts are often stranger than fiction.—এ একটি জন-প্রবাদ। কথিত আছে—

প্রথম দর্শনেই কোন এক প্রাক্তন সংস্কার-প্রেরণায় শরৎচন্দ্র এই অজ্ঞাত-পরিচয় সন্ন্যাসীর পাদমূলে মন-প্রাণ সমর্পন করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই নিজগৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আহার ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারপর, আহারান্তে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে প্রার্থনা করেছিলেন দীক্ষা, প্রার্থনা করেছিলেন শিক্ষা।...

স্বামীজী রহস্য করে বলেছিলেন—'যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে থাক,—চাঁদমুখে তবে ছাই মাখ।...

সন্ন্যাস যদি সত্যি নিতে চাও তবে তার যোগ্যতার জন্য প্রমাণ দিতে হবে।...

যাও, এই ভিক্ষাঝুলি গ্রহণ কর। তোমার অধীনস্থ রেলের কুলীদের খোলার ঘরের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা কর।'... তাই করেছিলেন শরৎচন্দ্র। মুহূর্ত দ্বিধা না করে ভিক্ষাঝুলি নিয়ে

বেরিয়েছিলেন তিনি। স্বামীজীও আর কোন আপত্তি করেন নি, শিষ্যরূপে তাকে গ্রহণ করেছিলেন।

এর পরের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। দু'তিন দিন মধ্যেই চাকরি, ঘর-সংসার সব কিছু চিরদিনের মত পশ্চাতে রেখে দুর্গম পথযাত্রায় পাদবিক্ষেপ করেছিলেন শরৎচন্দ্র, স্বামী সদানন্দ রূপে। তাঁর মত একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সন্তান স্বামী বিবেকানন্দেরও খুব বেশী ছিল না।

স্বামীজীর দেহত্যাগের অনেক পরে, পরিণত-বয়সে স্বামী সদানন্দ দেহত্যাগ করেন।···

কলিকাতার প্লেগ-মহামারীর সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যে শুচি-সুন্দর সম্বন্ধটি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল—দিনে দিনে, নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেটি গভীরতর পরিণতি লাভ করে নিবেদিতা-চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিবেদিতার আত্ম-স্মৃতিতে স্বামী সদানন্দের কথার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।···

কিছু পূর্বেকার ঘটনা হলেও—আর একটি মানুষের সুন্দর জীবনকথাও এ প্রসঙ্গেই মনে আসে। তিনিও স্বামী বিবেকানন্দেরই অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য এবং তার প্রভাবও নিবেদিতার জীবনে অপরিসীম ছিল।

রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে স্বামী স্বরূপানন্দ নামে তিনি প্রসিদ্ধ।

একদা, নিবেদিতার ভারত জীবনের প্রথমাংশে ঐ স্বরূপানন্দই ছিলেন তাঁর উপাচার্য, তাঁর শিক্ষক। তাঁরই হাতে নিবেদিতার ধ্যান-শিক্ষার সূত্রপাত, জপ-শিক্ষার সূত্রপাত। তাঁরই কাছে হিন্দী এবং বাংলা ভাষায় প্রথমিক পাঠ গ্রহণ। তাঁরই কাছে গীতা অধ্যয়ন।

নিবেদিতার স্বকীয় উক্তিতে আছে ঃ

'Under the influence of the Swami Swarupananda, I began seriously the attempts at meditation. And

if it had not been for this help of his, one of the greatest hours of my life would have passsed me by,'…

নিবেদিতার প্রায় সমবয়সী এবং সমধর্মী ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। প্রায় একই কালে উভয়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বরূপানন্দের জন্ম হয়েছিল এবং যথাসময়ে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তখন তিনি এক স্বল্পভাষী, কৃশকায় যুবক। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের রঙ্গমঞ্চে দুর্বলের উপর সবলের নিত্য অত্যাচার তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। এক দয়াময়, প্রেমময় ভগবান এ-জগতের সব কিছুর নিয়ামক, ন্যায়-বিচারের তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তিনি বসে আছেন, তাঁর দৃষ্টিতে সব সমান—এ সব শাস্ত্র-ঘোষণা যুবকের মনে আর কোন রেখাপাত করত না। মনে হত, এ জগৎ এক কঠিন, নিষ্ঠুর স্থান। এখানে বিচার নেই, নীতি নেই—মহৎ জীবনের কোন স্বপ্ন এখানে দানা বাঁধে না। ক্রমে যুবকের মনে সঙ্কল্প এল—'He would break the dream.' এ দুনিয়ার ধাপ্পাবাজী সে সহ্য করবে না। কোন স্বেচ্ছাচারী, তথাকথিত ভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে সে বসে থাকবে না। সত্যের অনুসন্ধানে সে আত্মনিয়োগ করবে। সেজন্য যে কোন মূল্য দেবে, যে কোন কৃচ্ছ্রসাধনে পশ্চাৎপদ হবে না।…

স্বামী স্বরূপানন্দের এই ছিল পূর্বপরিচয়। একদিন অকস্মাৎ এ যুবকটিকে গঙ্গাতীরে, বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে দেখা গেল। সে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ-প্রার্থী, একাকী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই সে যুবক ব্রহ্মচারীরূপে মঠে গৃহীত হয়েছিল। আবার তার কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করে স্বামী স্বরূপানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিল।

শোনা যায়, একজন অপরিচিত, বিবাহিত যুবককে অতি অল্প

সময়ের মধ্যে ঐ ভাবে দীক্ষাদানে মঠের কোন কোন প্রবীণ সন্ন্যাসীরও আপত্তি ছিল। কিন্তু স্বামীজী দিয়েছিলেন তাঁকে সন্ন্যাস।

দীক্ষাদানকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পাহাড় থেকে যদি ঝাঁপ দিতে বলি, অগ্নিকুণ্ডে যদি প্রবেশ করতে আদেশ করি—বিনা দ্বিধায়, অম্লানবদনে তা পালন করতে পারবে তো ?···

দীর্ঘাঙ্গ যুবক মুহূর্তে ইস্পাতখণ্ডের মত ঋজু হয়ে উঠেছিল, চোখে মুখে এমন একটি ভাব মুদ্রিত হয়েছিল যার একমাত্র অর্থ—আদেশ করুন, পরীক্ষা করুন—এই প্রার্থনা।···

সন্ন্যাস দীক্ষাদানের পর স্বামীজী স্বরূপানন্দের কথা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিলেন—

'We have made an acquisition to-day'···

একটি বিশেষ সম্পদ আজ আমরা লাভ করেছি।···

সে মন্তব্য উত্তর কালে, স্বামী স্বরূপানন্দের পুণ্যজীবনে সর্বাবয়ব সার্থকতা লাভ করেছিল।···

তাঁর চরিত্র, তাঁর ধ্যান-প্রবণতা, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ—সবই নিবেদিতার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, কত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে স্বামী স্বরূপানন্দের পুণ্যকথা আপন আত্ম-চরিতে উল্লেখ করে তাঁকে অক্ষয় কীর্তি দান কবে গেছেন নিবেদিতা।···

কিন্তু থাক্ সে কথা। আমার পূর্ব-আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। স্বামী সদানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে যাত্রার কথা বলতে গিয়েই এ-প্রসঙ্গে আমরা এসে পড়েছিলাম।···

এবারেব যাত্রায় প্রথমে উত্তর-ভারতে, পরে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর অগ্নি-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন নিবেদিতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পরিচিত হয়েছিলেন বহু দেশ-বরেণ্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে।···

দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে—বোম্বাইয়ে, পুণাতে, সুরাটে, গুজরাটে—বরোদায়, নাগপুরে; তারপর মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায়—এই ছিল নিবেদিতার পথ-পরিক্রমার একাংশের পদ-চিহ্ন।

বরোদায় তিনি পরিচিত হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে, নাগপুরে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে।

তিলকের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তিলকের গৃহে অতিথিও হয়েছিলেন স্বামীজী একবার। উভয়ের মধ্যে দেশ, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল দূর-বিস্তৃত ভাবে। আবার স্বামীজীর দেহাবসানের অব্যবহিত পূর্বে বেলুড় মঠেও উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিলকের দেশপ্রেম স্বভাবতঃই স্বামীজীকে আকৃষ্ট করেছিল। অপর পক্ষে স্বামীজীর জীবন এবং বাণীও তিলককে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। উভয়েই ছত্রপতি শিবাজীর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। সুতরাং, স্বামীজীর মানস-কন্যাকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন বালগঙ্গাধর। নিবেদিতার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা তাঁকে যেন বিস্মিত করেছিল।

···এই নিবেদিতা?

বিবেকানন্দ-দুহিতার মানসদীপ্তি এত ভাস্বর? তাপে ও ঔজ্জ্বল্যে এত প্রভাময়? ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য, আত্মবিস্মৃতির জন্য —এত তীব্র বেদনাবোধ, এত অন্তর্জ্বালা? কৈ ভারতবাসীর মধ্যেও তো এমনটি তিনি আর কোথাও দেখেন নি! তাই চমকিত হয়েছিলেন, শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন বালগঙ্গাধর।

আর নিবেদিতাও দেখেছিলেন—মহারাষ্ট্রকেশরী সে প্রতিভাধর পুরুষকে। দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ত্যাগ-স্বীকারে যিনি প্রস্তুত। ভারতবর্ষের অতীতে শ্রদ্ধাবান, ভবিষ্যতে আস্থাশীল। স্বভাবতঃই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

নাগপুরে একটি বৃহৎ জনসভায় একালে বক্তৃতা করেছিলেন নিবেদিতা। সে বক্তৃতার বিবরণ আছে।

দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত 'দশেরা' উৎসবের সময় ছিল সেটি। উৎসবের ঠিক পূর্ব দিন মরিস কলেজের ছাত্রদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভানেত্রী রূপে সে ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল।

বক্তৃতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—শুধু উদ্দীপনাময় এক আবেদন, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য শুধু এক দুর্জয় প্রয়াস। ছাত্র ও অধ্যাপক—উভয় পক্ষকে উদ্দেশ্য কবেই তাঁর বজ্রগর্ভ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।···

* * *

'আজ দশেরা। তোমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, একটি চিহ্নিত দিবস। এ দিনে তোমাদেব নিজ দেশের ক্রীড়াকে উপেক্ষা করে বিদেশী ক্রীড়াতে তোমরা উৎসাহ দেখালে কেন, গর্ব বোধ করলে কেন?

আজ এই পুণ্যতিথি শস্ত্র-পূজার জন্য নির্দিষ্ট। শক্তি-স্বরূপিণী মহামায়ার পূজা করাই তো আজ বিধি। শক্তি-সাধনার এই পীঠস্থানে দশেরা উপলক্ষ্যে যে দেবীর অর্চনা হয়ে থাকে, তিনি দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা, তাঁর দশহাতে দশটি প্রহরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা সেই দেবী দুর্গাকে বিস্মৃত হয়েছ, বিস্মৃত হয়েছ তাঁর হাতের কৃপাণ, তাঁর শক্তির বাণী। এর চাইতে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

বীর ভোঁসলা রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত এ রাজধানীতে এসে মারাঠা বীর্যের কিছু নিদর্শন দেখতে পাব—এ আমার বড় আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সেটি পূর্ণ হল কোথায়?'—ইত্যাদি।

একটি কঠিন, অথচ ন্যায়সঙ্গত তিরস্কার, যা কেউ আশঙ্কা করেনি, যার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

তড়িৎ-স্পৃষ্ট ব্যক্তির মত সে-আঘাতে সবাই যেন সজাগ হয়ে

দাঁড়িয়ে উঠেছিল। এবং পরদিনই আর একটি ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

সেদিন, লাঠি-খেলা, অসি-চালনা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শক্তি চর্চার প্রভূত নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। নিবেদিতা যেন তাতে শান্ত হয়েছিলেন, তাঁর পূর্বদিনের ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছিল। এদিনও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন :

'আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। প্রচুর সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এদের দিকে তাকালে মন হতাশায় ভরে ওঠে। দেহে শক্তি নেই, মনে সাহস নেই, বীর্যহীন, উদ্যমহীন একদল যুবক, নিজেদের মা-বোনের সম্মান রক্ষায়ও যেন অসমর্থ। এদের দিয়ে দেশের কোন্ উপকার সাধিত হবে?

আজ দেশ চায়—একদল কর্মী, এ ব্যাণ্ড অব্ ওয়ার্কার্স—যারা স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়, আর দেশপ্রেমে মাতোয়ারা। এমন প্রাণবন্ত তরুণ দল।

পরাধীনতার অগৌরব তারা বরদাস্ত করবে না। বিদেশী শাসকের শাসন-যন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে তারা ঘৃণা বোধ করবে। তাকে তারা পঙ্গু করে দেবে, ব্যর্থ করে দেবে।···

এ যেন স্বামীজীর আহ্বানেরই নিখুঁত প্রতিধ্বনি। কোন পার্থক্য নেই; ভাবেও নেই, ভাষায় কিংবা ব্যঞ্জনায়ও নেই। আর এ শুধু একটি বা দু'টি বক্তৃতার কথা নয়। নিবেদিতার প্রতিটি বক্তৃতা সম্বন্ধেই মোটামুটি ভাবে একথা সত্য।

যে সময়ের কথা বলছি—তখন এক দক্ষিণ-ভারতেই নিবেদিতা অনেকগুলি বক্তৃতা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, এশিয়ার জীবন, আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন, ভারতীয়-নারী—প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর চিন্তা তখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এক বক্তব্য, এক মূল মর্মকথা।···

'আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালবাসি। তার বিশেষ কারণ এই যে জগতের বহু বিচিত্র ধর্মের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, যা-কিছু উদার ভারতবর্ষই তার জন্মদাত্রী।

আমার গুরুদেব বলতেন,—'আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত নয়। আমার সঙ্কল্প—মানুষ তৈরী করা। 'Man making is my only task.'—এই বাণী বিশাল ভারতেব গ্রামে-প্রান্তরে, প্রাসাদে-কুটীরে, কোলাহলময় নগবে-পত্তনে প্রচার করতে হবে। সেই আমার কাজ, সেই আমার ব্রত।'

আর রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে কর্মানুষ্ঠান তার মূল-রহস্যটি এরই মধ্যে নিহিত। কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ কি ছিল, কতটা ছিল, স্বদেশী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেই বা নিবেদিতার সম্বন্ধ সক্রিয় কি নিষ্ক্রিয় ছিল—সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে।

আজ পর্যন্ত নিবেদিতার জীবনকথা যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে সক্রিয় বিপ্লবে নামিয়েছেন, হাতে পিস্তল দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের একেবারে পুরোভাগে তাঁকে দর্শন করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অভিনন্দন জানিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন। অভিহিত করেছেন 'নাগমাতা' রূপে। সে একদিক।

অপর দিকে, কোন কোন চরিতকার নিবেদিতাকে হিংসামূলক কোন বিপ্লবকার্যে লিপ্ত কবেন নি, এমনকি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ সেটিকে একান্ত ভাসা-ভাসা বলেই মনে করেছেন। তাঁরা দেখেছেন শুধু লেখা বা কথার মধ্য দিয়ে জন-জাগরণের প্রচেষ্টায়ই নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মানুষ্ঠান সীমাবদ্ধ।

এ দুই মতবাদের কোন্‌টি ঐতিহাসিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা জানিনা। কালই যথাসময়ে সে সমস্যার সমাধান করে দেবে।

তবে, আমাদের ধারণা নিবেদিতার আত্ম-পরিচয় মিথ্যা নয়। তাঁর স্বকীয় নামকরণ ছিল,—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' Nivedita of Ramakrishna Vivekananda—সর্বভাবে, সর্ব কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেটিই শনৈঃ শনৈঃ তাঁর জীবনে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল। উর্মিবহুল সে জীবন-কলস্বিনীর মর্মকথা অনুধ্যানের ঐটিই নিরাপদ অঙ্গুলি-সংকেত, অভ্রান্ত দিগ্-দর্শন।···

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয়ের কথা বলছিলাম। সে পরিচয়ও এ সময়েই হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের নাম এবং তাঁর বিচিত্র জীবনকথা ইতিপূর্বেই নিবেদিতা শুনেছিলেন। শৈশবের সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল ইংলণ্ডে যাপন করেছেন অরবিন্দ। শিক্ষিত হয়েছেন পাশ্চাত্য ধরনে, পাশ্চাত্য পরিবেশে। অথচ, আজ সেই অরবিন্দ আচারে-ব্যবহারে, চিন্তায় ও রুচিতে একান্তভাবে ভারতীয়। অদ্ভুত তাঁর মনীষা, অসামান্য প্রতিভায় তিনি প্রদীপ্ত। সুতরাং নিবেদিতার নিবিড় কৌতূহল ছিল। এবং যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দও কম উৎসুক ছিলেন না।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ-সাধনার নিগূঢ় তাৎপর্য ও মহিমা শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাসিত ছিল। তাঁদের সমকক্ষ শক্তিধর পুরুষ সহসা কোন দেশে আবির্ভূত হন না। হাজার বৎসরের কম ব্যবধানে তেমন আবির্ভাব সম্ভবই নয়। শ্রীঅরবিন্দের একাধিক গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ আছে। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর মাটির ডেলা, মানিকতলার অগ্নিগর্ভ বোমার চাইতে সহস্র গুণে শক্তিশালী—এও শ্রীঅরবিন্দেরই সুচিন্তিত অভিমত ছিল।

সেইহেতু, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, অর্থাৎ প্রত্যাসন্ন মহা-বিপ্লবের মুখে স্বামী বিবেকানন্দের অকাল তিরোভাব শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে এক চরম জাতীয়-দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। তাঁর চিন্তায় নিয়ত তখন এ-প্রশ্নটিই প্রকট হয়ে উঠেছিল—ততঃ কিম্?

বিবেকানন্দের পর বাংলাকে পথ দেখাবে কে? ভারতবর্ষকে নির্দেশ দেবে কোন্ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা? প্রেরণা আসবে কোন্ মহাজীবনের সাধনমন্ত্র থেকে?...

সুতরাং, নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরিচয় শ্রীঅরবিন্দের কাছে তখন বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার ছিল।...

কথিত আছে—প্রথম সাক্ষাতের দিনে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের একখণ্ড 'রাজযোগ' উপহার দিয়েছিলেন, এবং প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে বঙ্গদেশে আসবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—'বাংলাদেশে চলুন। সেখানেই আপনার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। সেখানেই আপনার নেতৃত্ব প্রয়োগ করুন।'

প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা। করমর্দন করে স্থাপন করেছিলেন সৌহার্দ্য। সে সৌহার্দ্য দেশ-সেবার নানা কার্যের মধ্য দিয়ে ক্রমে নিবিড় ও অটুট পরিণতি লাভ করেছিল।...

তখন থেকে চার-পাঁচ বৎসরের পরবর্তী ঘটনা হলেও—শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গে নিবেদিতার আত্মকথায় যে অধ্যায়টি আছে এখানেই সে অধ্যায়ের মূলকথা আমরা বিবৃত করছি।—

স্বদেশী আন্দোলনের একান্ত অশান্ত দিনগুলিতে, সন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে—শ্রীঅরবিন্দ বরোদার অধ্যাপক-পদ পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর ১৯০৭খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দু'বৎসরের জন্য ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন নিবেদিতা। সুতরাং, কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কালের জন্য শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়েছিল।

আবার, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ছদ্মবেশে ও গুপ্তনামে তাঁর কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, চন্দননগর পথে, পণ্ডিচারী অভিমুখে শ্রীঅরবিন্দের গোপন

প্রস্থানের দিনটি পর্যন্ত—নানা সূত্রে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।—ইতিহাসে তারও স্বাক্ষর রয়েছে।

ইউরোপ থেকে যখন ফিরে এসেছেন নিবেদিতা তার প্রায় তিন মাস পূর্বে, এক বৎসর কারাবাস করে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ করেছেন। সেই কারাবাসের একটি বৎসর শ্রীঅরবিন্দের জীবনে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।—

'ইংরাজের কারাগার আমার বৈকুণ্ঠ, আমার ভগবান-দর্শনের পুণ্যভূমি। সেখানকার নির্জন কক্ষেই আমি পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলাম।'—এ উক্তি শ্রীঅরবিন্দের স্বকীয় উক্তি। অতএব, ইউরোপ থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা যে অরবিন্দকে দেখেছিলেন, তিনি আর পূর্বেকার বিপ্লবী অরবিন্দ নন। এ অরবিন্দের দৃষ্টি বহিঃ-বিশ্ব থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে অন্তরের রহস্যাবৃত গভীরতায় প্রবেশ করেছে। প্রত্যক্ষের স্থূলতা থেকে অতীন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির দুর্গম গহনে সে এখন অভিযাত্রী। নিবেদিতার কোন একটি চরিতাখ্যায়িকায় আছে যে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়েই ইউরোপ থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা প্রথম অরবিন্দকে দেখেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কারাবাসের অভিজ্ঞতা। জানতে চেয়েছিলেন, কিভাবে শ্রীঅরবিন্দ কাটিয়েছিলেন—কারাবাসের দীর্ঘ এক বৎসর সময়। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন তার সারমর্ম এই ছিল যে—

গীতা ও উপনিষদের সূত্র অবলম্বন করে তিনি ধ্যান করেছেন, যোগাভ্যাস করেছেন—ঐ এক বৎসর কাল। ফলে, স্বামীজীর সান্নিধ্য অনুভব করেছেন অতি গভীরভাবে, এবং প্রেরণাও লাভ করেছেন প্রচুর।...

কিন্তু এদিকে কারা-প্রাচীরের বাইরে এসে দেখছেন—দেশের পরিস্থিতি অনেকাংশে পরিবর্তিত, বাতাস বইছে বিপরীত স্রোতে।...

কাজেই, তাঁর স্বকীয় কর্মপন্থাও তিনি বহুল পরিমাণে পরিবর্তন

করেছেন। এখন নূতন জীবনবাদের নব-আদর্শ আর সনাতন ধর্মের শাশ্বত-বাণী তিনি প্রচার করতে চান। 'কর্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম' নাম দিয়ে দু'টি পত্রিকাও সে উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন। এখন, নিবেদিতার কাছে তাঁর এই আবেদন—তিনি যেন পত্রিকা দু'টির দিকে দৃষ্টি দেন, রচনাদি দ্বারা তাদের সমৃদ্ধ করেন।...

এর পরের ব্যবধান অতি সঙ্কীর্ণ।

শ্রীঅরবিন্দেকে নির্বাসনদণ্ড দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ইংরাজ-রাজসরকার। গোপনে সে সংবাদ নিবেদিতাই পেয়েছিলেন প্রথম। এবং এক সন্ধ্যার অন্ধকারে গোয়েন্দা পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সতর্কও করেছিলেন নিবেদিতা।

এরূপও কথিত আছে—যে সংবাদ পেয়ে সেদিনই শ্রীঅরবিন্দ গোপনে নৌকাযোগে ফরাসী-শাসনাধীন চন্দননগরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর, কোন্ পথে, কিভাবে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেছিলেন, নিবেদিতার সক্রিয় অংশই বা তাতে কতটা ছিল—সে সব বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

যাত্রাপথে, বাগবাজারে দেবী সারদামণির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারপর গঙ্গার ঘাটে আরোহণ করেছিলেন নৌকায়। নিবেদিতা জুগিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় অর্থ। সমস্ত রাত্রি স্রোত কেটে নৌকা অগ্রসর হয়েছিল, এবং রজনীর শেষযামে নোঙর ফেলেছিল চন্দননগরের ঘাটে। অপরিসর বালিয়ারির একাংশে, অস্পষ্ট উষালোকে—ছোট নৌকাখানি চন্দননগর ঘাট থেকে দেখা গিয়েছিল।

জনহীন ছিল গঙ্গার ঘাট। ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল আকাশ। চন্দন-নগরের ৺মতিলাল রায় সে দিন দৈব-চালিত হয়েই যেন এসেছিলেন

গঙ্গার ঘাটে। তিনিই নিভৃত-আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে—নিজ প্রবর্তক-সঙ্ঘের মন্দির-সংলগ্ন গৃহে। সে গৃহ আজও রক্ষিত আছে, বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। চন্দননগর গেলে কতদিনের পুরানো সে ঘরটি আজও সেই আগেকারই মত অবস্থায় দেখা যাবে।

নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কিন্তু এখানেই শেষ হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যে সংযোগ তারও সমাপ্তি ঐখানে। ফলে, নিবেদিতার জীবনাখ্যায়িকায় এর পর শ্রীঅরবিন্দের আর কোন সংযোগ বা স্পর্শ ছিল বলে মনে হয় না।...

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম, প্রবলতম আকর্ষণ এবং সংস্কার, উভয়ই ছিল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-পথে প্রবাহিত। সেদিক থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তর-সাধক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আবার, ভারতবর্ষের নব-জাগরণের ইতিহাসেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এক অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন, স্বামী বিবেকানন্দের মত তাঁরও জীবন-স্বপ্ন ছিল।

স্বামীজীর মানস-পুত্রী নিবেদিতাও গুরুর কাছ থেকে অনুরূপ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেই বলেছিলেন:

'This is an age, not of thrones, but of democracies; not of empires, but of nationalities; and the India that faces the sun-rise of nations, is young and strong.'

অতএব, নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধের যে একটি গভীর ভাবগত ঐক্য ছিল, একটি আধ্যাত্মিক সূত্র ছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সে দিক থেকেই উভয়ে উভয়ের জীবনে একটি কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে মনে হয়। আর মনে

হয় যে—ঠিক এ-জাতীয় সম্বন্ধ রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্তত আর কারো সঙ্গেই স্থাপিত হয়নি নিবেদিতার। যদিও, ঐ রাজনীতি ক্ষেত্রেই আরও অনেক শক্তিধর পুরুষের সংস্পর্শে তিনি গিয়েছিলেন স্বদেশী-আন্দোলনের সংগ্রাম মুখরতার দিনগুলিতে।…

উদাহরণ স্বরূপ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, উল্লেখ করা যেতে পারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা।…

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্বদেশী-যুগের এক প্রতিভাদীপ্ত, মহাতেজস্বী পুরুষ।

একদিন, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের বেদনাবিদ্ধ দিনটিতে নিবেদিতা প্রথম দেখেছিলেন সেই বীর্যবান মানুষটিকে। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে একজন শিক্ষক মাত্র। স্বামীজীর শশ্মান-শয্যার পার্শ্বে নিষ্পলক চক্ষে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, লক্ষ্য করছেন কেমন করে স্বামীজীব দিব্য তনুখানি ধীরে ধীরে অগ্নি-স্পর্শে ভস্মীভূত হয়ে গেল,—সে দৃশ্যটি বহুদিন নিবেদিতার মনে ছিল।…

পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে জেনেছিলেন—যে উপাধ্যায়ের মত বীর্যবান, দেশপ্রাণ—পুরুষ-সিংহ বিংশ-শতকের প্রথম দশকে বাংলার শ্যামল মাটিতে খুব বেশী দেখা যায়নি। সে যুগে যাঁদের নির্ভীক দেশপ্রেম ও বিপ্লব-প্রয়াস জনমানসে এক দুর্জয় সাহস সঞ্চারিত করেছিল—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নিঃসংশয়ে তাদের মধ্যে একজন এবং অসাধারণ একজন। তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সেদিনের দ্বিধা-জড়িত, স্খলিত-চরণ বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে রুদ্রের ডমরু নিনাদ ধ্বনিত করেছিল।

History of Bengal can be summed up in four words—'Traitor in the Camp'…

এ বৈদ্যুতিক কশাঘাত উপাধ্যায়েরই লেখনী-প্রসূত।

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ডন্' সোসাইটির মাধ্যমেই

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। 'ডন্' সোসাইটিরই মুখপত্র ছিল সে-যুগের বিখ্যাত 'ডন্' পত্রিকা।··· স্বদেশী-শিক্ষার একটি বিদ্যালয় বলেই সে-কালে 'ডন্' পত্রিকার পরিচয় ছিল, বিশেষ মর্যাদা ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ যে-সময় দূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বেদান্তের মহান-তত্ত্ব প্রচারে নিরত ঠিক সে সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার কল্পে 'ডন্' পত্রিকা নানা দিকে, নানা ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং অক্লান্তভাবে প্রায় পনর বৎসর কাল দেশ-সেবা করে সার্থক হয়েছিল। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের স্নেহ এবং আশীর্বাদ-ধন্য ছিলেন সতীশচন্দ্র।

এই 'ডন্' সোসাইটির এক সান্ধ্য-আসরেই নিবেদিতার সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল এবং ঐখানেই দু'টি অচঞ্চল বহ্নিশিখা যেন এক স্বাভাবিক আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

বাংলার মাটি, বাংলার জল উভয়েরই কাছে স্বর্গ-সম্পদের মত পবিত্র ছিল। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই ধমনীতে অতি উষ্ণস্রোতে প্রবাহিত ছিল। সে জন্য কোন কোন জীবন-চরিতকার এরূপ মন্তব্য করেছেন যে

'বিবেকানন্দের জ্বলন্ত চিতা থেকে যে দু'টি অগ্নি-শিখা বের হয়ে এসেছিল—তার একটি ভগিনী নিবেদিতা, আর একটি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ঐ দু'টি অগ্নি-শিখাকে কখনো পৃথক, কখনো একত্র করে দেখলেই বাংলার স্বদেশী-যুগকে পুরাপুরি দেখা যাবে।'

স্বামীজীর দেহত্যাগের অনতিকাল পরেই ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

উপাধ্যায়ের মৃত্যু-কাহিনীটি বড় বেদনাদায়ক।··· ইংরাজের বন্দীশালার হাসপাতালে বিচারাধীন অবস্থায় অত্যন্ত আকস্মিক-

ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি ধৃত হয়েছিলেন, কিন্তু আদালতে কোন কৈফিয়ৎ তিনি দেন নি।

উপাধ্যায়ের যখন মৃত্যু হয় নিবেদিতা তখন ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডেই তিনি মৃত্যু-সংবাদটি পেয়েছিলেন। শোনা যায়, সে মর্মান্তিক সংবাদ নিবেদিতার দু'চোখে তপ্ত অশ্রু নির্গত করেছিল। অত শক্তি, অনমনীয় অত দুর্জয়তা, অত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য—একাধারে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না—সেকালে।···

* * *

এরপর রবীন্দ্রনাথের কথা বলব। নিবেদিতার কর্ম-জীবনের যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই উভয়ের কাছে এক মহাবিস্ময়, এক মহা-আবিষ্কার। উভয়ের মধ্যে সংযোগও ঘটেছিল নানা ক্ষেত্রে, নানা উপলক্ষ্যে। সে সংযোগ সর্বদা, সর্বক্ষেত্রেই যে পারস্পরিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধ ছিল তাও নয়, তথাপি তারই ক্রম-পরিণতিতে উভয়ে উভয়ের প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, একটি মধুর প্রীতিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উক্তির একাংশে এইরূপ স্বীকৃতি আছে:

'আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি (নিবেদিতা) আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আব কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।···

নিজকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব

য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাঁহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ-স্বীকারের অভাব —কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্য রূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে, সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

নিবেদিতার লেখাতেও বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ বর্ণনা আছে, স্বীকৃতি আছে। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।—

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস সে-সময়টা। বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব তখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গেছে। সমগ্র বঙ্গদেশ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের মত উত্তাল। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আসন্ন। উর্দ্ধ আকাশ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে।

নিবেদিতা তখন অসুস্থ দেহ নিয়ে দার্জিলিং-এ। সেদিন, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে বিমূঢ় জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র বাণী নিয়ে, বিচিত্র আবেদন নিয়ে।

'বিজয়া-সম্মিলন'—শীর্ষক অতুলনীয় প্রবন্ধে এ-কালেই বাঙালী জাতিকে সকল সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠবার জন্য, অখণ্ড, অবিভাজ্য-রূপে দেশকে গ্রহণ করবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন কবি।...

যা ক্ষুদ্র, যা অনুদার ও স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাময় তাকে পরিহার কর।

'আজ থেকে, বাংলাদেশের ঘরের মিলন আর দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে এসে সংগত হয়। যে মিলন আমাদের

বর দান করবে, জয় দান করবে, অভয় দান করবে—সে মহামিলন গৃহ-প্রাঙ্গণের মধ্যে নয়, সে মিলন দেশে,—এই ছিল আবেদন।

তারপরই দূরদর্শী কবির অনবদ্য বাণী-ঝঙ্কার। নিত্যকালের জন্য যার সুর-তরঙ্গ বাংলার নক্ষত্র-খচিত হৈমন্তী আকাশে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর শীকর-সিক্ত বাতাসে;—নদীজাল-জড়িত পূর্ব সীমান্তের একাংশ থেকে শৈলমালা-বন্ধুর পশ্চিমের অপরাংশ পর্যন্ত, সর্বত্র স্পন্দিত হচ্ছে, ধ্বনিত হচ্ছে।···

'আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্ব পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়া-তরু-নিবিড় গ্রামগুলির উপর এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না-ধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি-রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের হৃদয়ের বন্দেমাতরম্-গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

* * *

বাঙালির পণ বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন

এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।'...

সেদিন কবিগুরুর এ অপূর্ব আবেদন, এ অনন্য প্রার্থনা সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার চিত্তকে যে-ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যে-ভাবে আলোড়িত করেছিল তেমনভাবে বোধহয় রাজনীতি ক্ষেত্রের অন্য কোন ব্যাপার, অন্য কোন কাজ আর কখনো করে নি।

সেদিন বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে মহাকবিকে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তিনি জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁর মহা সম্ভাবনাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দান করে নিজেই যেন কৃতার্থ হয়েছিলেন।

আর কবির মনোভাবের কথা তো পূর্বেই বলেছি। 'সতী' নামে তিনি নিবেদিতাকে অভিহিত করেছিলেন—সম্বোধন করেছিলেন 'লোকমাতা' বলে।

তাঁরই ভাষা আবার কতকটা উদ্ধৃত করছি :

'বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি ত ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই! এ সম্বন্ধে যে কর্তব্য-বোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people, তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটিত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি না—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি না।'

'শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্দ্ধাশনে, অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্দ্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্রা হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই।...

ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিলনা। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?' ইত্যাদি..."

নিবেদিতার অকপট দেশপ্রেমের এমন বিবরণ, দেশমাতৃকার বেদীমূলে তাঁর নিঃশেষ আত্মনিবেদনের এমন নিখুঁত চিত্র সম্ভবতঃ আর কেউ অঙ্কিত করেন নি। পরাধীনতার দুঃসহ বেদনা এই তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনীর সমগ্র চেতনাকে কী ভাবে উন্মুখ করে রাখত, কেন, এবং কি হেতু রাজনীতির বন্ধুর পথ থেকে নিবৃত্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি—সে রহস্যও বোধহয় এর চাইতে স্পষ্টতর করে আর কেউ প্রকাশ করেন নি।

পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে কার্য-কলাপ তার একটু আভাসমাত্র এখানে আমরা দিতে চেষ্টা করেছি। সন-তারিখ সম্বলিত কোন ঐতিহাসিক চিত্র আমরা অঙ্কিত করিনি—কারণ, বর্ত্তমান অনুধ্যান-গ্রন্থের উদ্দেশ্যই সেটি নয়।

আমরা শুধু—নিবেদিতার জীবন-শতদলটি এক অপরিণত কোড়ক অবস্থা থেকে কীভাবে ও কোন্ পথে শনৈঃ শনৈঃ সহস্রদল রক্ত-কমলরূপে ভারতবর্ষের জীবন-জলাশয়ে বিকশিত হয়েছিল তারই সূত্রানুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। বুঝতে চেয়েছি কোন্ ধারা-পথে সে জীবন-স্রোতটি সাগর-সংগমের মহা-আকর্ষণের দিকে নিত্য গতিশীল ছিল।

নিবেদিতার চরিতকার অনেকের বিশ্লেষণে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কার্যাবলী বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁদের মতে উত্তর-বিবেকানন্দ-যুগে নিবেদিতার সমগ্র শক্তি ও সাধনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যেই বহুল পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক জীবনকেই তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর যে বিচ্ছেদ সেটা শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, সেটা আন্তরিক।...

আবার, অন্য পক্ষে যাঁরা ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করেছেন, যাঁরা নিবেদিতাকে অন্যভাবে দেখেছেন, তাঁদের মতে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলী তদীয় জীবন-সাধনায় কোন সময়েই মুখ্যস্থান লাভ করে নি। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল, যোগাযোগ ছিল—সেকথা সত্য, কিন্তু তাঁর বহুমুখী-কর্মজীবনে রাজনৈতিক প্রয়াসগুলি সর্বদাই গৌণস্থান অধিকার করেছিল। অগ্নিযুগের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংযোগের যে-কথা নানাভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে সে সব বহুলাংশে নিছক কল্পনা, নিতান্তই wishful thinking বা অনুমানের ব্যাপার।...

আমাদের ধারণা, এ-দুই বিরুদ্ধ মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য নিহিত। কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তি নিবেদিতার পরম কাম্যবস্তু ছিল, তাঁর নিভৃত-ধ্যানের সামগ্রী ছিল। এবং সে জন্য তাঁর চিন্তা ও লেখনী, তাঁর কণ্ঠ ও হস্ত অকুণ্ঠভাবে দেশ-সেবায় তিনি নিয়োজিত করেছিলেন।

আবার, সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে সে-সব নিয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য কখনো নিবেদিতার জীবনের চরম আদর্শকে অতিক্রম করে নি, কখনো স্বকীয় পরম লক্ষ্য-পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করে নি। তাঁর যে-সব অমূল্য রচনা কালের সীমা অতিক্রম করে আজ আমাদের হাতে এসেছে সে-সব রচনার ছত্রে ছত্রে এর সমর্থন আছে। সমর্থন আছে এই সত্যটির যে নিবেদিতার অনন্য জীবনের যা-কিছু সাধনা, যা-কিছু আরাধনা ও সঙ্কল্প তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যও ছিল একটি, কাম্য লক্ষ্যও ছিল একটি, অন্য কিছু নয়। সে লক্ষ্য এই :

নিজের স্বল্পায়ু জীবনে সার্থক করবেন গুরুর শুভ-আশীর্বাদ, রূপায়িত করবেন তাঁর নিষ্কলুষ কামনা—

'Be thou to India's future son
The Mistress, servant, friend in one.'

তদীয় রাজনৈতিক জীবনেরও এটিই সারকথা।···

তবে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ আর তাঁর অদ্ভুত ভারতপ্রেম—শুধু যে ভারতীয়দের মধ্যেই একটি বিমুগ্ধ-বিস্ময় জাগ্রত করেছিল তাই নয়, পরন্তু সমগ্র ইউরোপীয় সমাজও যেন এই মনস্বিনী ইংরাজ-মহিলার অস্বাভাবিক কার্যকলাপে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ক্রমে তদানীন্তন বড়লাটের পত্নী লেডি মিণ্টো নিবেদিতা সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করে একাধিকবার বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে স্বয়ং এসে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, আলাপ-পরিচয় করেছিলেন। ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের সে-সব দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ এক অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু ঘটনাটি সত্য এবং লেডি মিণ্টোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা আছে, নিবেদিতার চরিতানুধ্যানে সেটিও নিরতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ।···

বর্ণনাটি এইরূপ :

'মার্চ-১, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ :

সম্প্রতি জনৈকা মিস্ নোবল্‌কে দেখবার জন্য আমি কলিকাতার এক অতি দরিদ্র পল্লীতে গিয়েছিলাম। মিস্ নোবল ভারতীয় ধরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তিনি আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি সুগভীর মহিমা উপলব্ধি করেছেন! অবশ্য, তাঁর যুক্তি আমি ঠিকমত বুঝতে পারিনি।...

তিনি আমাকে বলেছিলেন, যাঁদের মধ্যে তিনি বাস করেন, তাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দু। কিন্তু তাঁরা গরীব হলেও অত্যন্ত মর্যাদা-বোধসম্পন্ন। নিবেদিতা তাঁদের আচার-ব্যবহারের খুব প্রশংসা করলেন। পৃথিবীর নানা জাতির ধর্ম এবং দর্শনের বহু পুরাতন ইতিহাস তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছেন, অনুশীলন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ভারতবর্ষই দর্শন ও জ্ঞানের ধাত্রী।...

অনিন্দ্যসুন্দর তাঁর মুখ। সে মুখ প্রতিভা-দীপ্ত। সহজেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেল। তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করলেন আমি যেন বেলুড়ে, গঙ্গার তীরে, যেথায় তাঁর আচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ বাস করতেন সে-স্থানটি একবার দেখে আসি।

সে জন্য, কয়েকদিন পর, ভিক্টর রুক্‌কে নিয়ে নিবেদিতার বাসায় গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে তাঁকে এবং তাঁর সহকারিণী সিস্টার ক্রিশ্চিনকে নিয়ে বেলুড় গিয়েছিলাম। স্থানটি বড় মনোরম। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের শয়ন-ঘরটি আমাদের দেখিয়েছিলেন। সে ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার মুখে সহসা যে ভাবান্তর দেখেছিলাম তা ভুলবার নয়। একটি স্বর্গীয় পবিত্রতায় যেন তাঁর সমগ্র সুন্দর মুখখানি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল।...

নিবেদিতা তাঁর চতুষ্পার্শ্বের সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখে থাকেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অতি মধুর, অতি সুমিষ্ট। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে-ভরা সে-কণ্ঠস্বর সেদিন আমার বড় ভালো লেগেছিল।'

॥ বারো ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর, এদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগাযোগের কথা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই যে কাল, সেটি একটি বিস্ময়কর ভাব-বিপ্লবের কালরূপে আবির্ভূত হয়েছিল ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়।

অখণ্ডিত বঙ্গদেশের রূপই তখন ছিল স্বতন্ত্র। ভৌগোলিক বিচারে সে ছিল তখন সোনার বাংলা, সুজলা ও সুফলা। আর কর্ম-বিচারে সে ছিল তখন দিশারী, পথনির্দেশক।

'What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks tomorrow'—

এই ছিল তখনকার দিনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। সেদিন এ গাঙ্গেয় উপত্যকার ভূমি ছিল স্বর্ণপ্রসূ, বায়ু ছিল স্নিগ্ধ ও শীতল, কলধ্বনি-মুখরা ছিল এর নদ-নদীর জলধারা। সে বাংলা দেশের বন্দনা ছিল কবি-কণ্ঠে এই মন্ত্রে ঝঙ্কৃত :···

'বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

সে দেশের সঙ্গে আজকের দ্বিধাখণ্ডিত, সমস্যা-জর্জর পশ্চিমবঙ্গের কোন তুলনা নেই। সেদিনকার সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ সকলকে পর্যাপ্ত আহার দিত, প্রেরণা দিত, নির্দেশ দিত। সুতরাং স্বাধীনতা

-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন শিল্পবিপ্লবে, সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় বাংলার নেতৃত্ব ছিল বলিষ্ঠ, অবদান ছিল মৌলিক।

নিবেদিতার কর্মজীবনের সঙ্গে সে সব বহুমুখী প্রচেষ্টার সংযোগ কতদূর ব্যাপক বা গভীর ছিল—বর্তমান অধ্যায়ে সেটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তাছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে নিবেদিতার শিল্প-শিক্ষার বিবরণ এবং তাঁর গ্রন্থাদি রচনার আংশিক পরিচয়ও এ অধ্যায়েই আমরা প্রদান করব।...

শিল্প-প্রতিভা ছিল নিবেদিতার জন্মগত সংস্কার। প্রবন্ধাদি রচনার দক্ষতা তিনি আয়ত্ব করেছিলেন সুদীর্ঘ সাধনায়। লণ্ডনের শিক্ষকতা জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই তাঁর সে সাধনার সূত্রপাত। তখনই নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনায় পূর্ণ বলে সমাদৃত হয়েছিল। তারপর, ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত-কর্মভূমিতে জীবনের এক অভাবিত পটভূমি বিরচিত হল। গুরু-প্রেমের আনুগত্যে ধীরে ধীরে ভারতের মাটি হ'ল তাঁর জন্ম-মৃত্তিকা। ভারতের বন হ'ল তাঁর যৌবনের উপবন, ভারতের তীর্থ হ'ল তাঁর বার্ধক্যের বারাণসী।—

ফলে, ভারতের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য—সবই নিবেদিতার জীবন-সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সংযুক্ত হয়ে গেল। কাজেই বিচারটিকে বিভিন্ন পর্যায়ে, স্বতন্ত্র ভাবে বলা প্রয়োজন।...

প্রথমেই শিল্প-বিপ্লবের কথা বলছি।

একথা আজ বহুধা স্বীকৃত যে ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ-সাধনায়, তাদের তাৎপর্যের অনুশীলনে ও ব্যাখ্যায় নিবেদিতার স্বকীয় সাংস্কৃতিক জীবনটি যেমন পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছিল, তাঁর শিল্পানুভূতি এবং শিল্পানুরাগের সাহায্যে ভারতবর্ষের শিল্পজাগরণও তেমনি নানাভাবে প্রাণবন্ত ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর প্রেরণা

এবং নির্দেশ এক্ষেত্রেও নিবেদিতার পক্ষে অতি অমূল্য সম্পদরূপে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তাঁরই অনন্য শিল্প-চেতনা যেন সূক্ষ্ম অনুভূতি-পথে নিবেদিতার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল।

পরিব্রাজক জীবনের তপস্যার কালে ভারতবর্ষের নানা মঠে-মন্দিরে, নানা প্রাসাদে-ইমারতে, পর্বত-গাত্রে ও গুহা-গহ্বরে ভারতীয় শিল্পের বিচিত্র রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বামীজী। নিবেদিতা জানতেন সে কথা। উত্তর-ভারত পরিভ্রমণের সময়ই প্রথম তার পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন। সে সময় প্রাচীন ভরেতের শিল্প-মহিমা নানাভাবে, নানাপ্রসঙ্গে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছিলেন স্বামীজী।

কখনো বিতস্তা-তীরের মার্তণ্ডদেবের মন্দির, কখনো পণ্ড্রেস্থান, কখনো বা দিল্লী-আগ্রার মধ্যযুগীয় স্থাপত্য-কলা। স্বামীজী এদের প্রত্যেকটির উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করতেন। হিন্দু-স্থাপত্যের ব্যাখ্যা করতেন, বৌদ্ধযুগের কিংবা মুসলমান-আমলের স্থাপত্য-কলার অভিনবত্ব তুলে ধরতেন। তুলনামূলক আলোচনায় তাদের বিশিষ্টতা যেন সজীব করে দিতেন।

মার্তণ্ড মন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্য-নিদর্শন লক্ষ্য করে মুগ্ধ-বিস্ময়ে নিবেদিতা নিজ আত্মস্মৃতিতে লিখেছিলেন :

'Each building had been so perfect and the motive of the two epochs of construction was so clear that the plan of the temple was pure delight.'

অথবা,

'The cloister, round the central building, was extra-ordinarily Gothic in shape, and to one who has seen this, and the royal tombs of Mohammadanism in the north of India, it is at once suggested

that the cloister is ideally, the whole of a monastery …its presence is a perpetual reminder that East was the original home of monasticism.'

হিন্দু-স্থাপত্যের এসব নিদর্শন, এদের অর্থ ও তাৎপর্য স্বামীজীর সহায়তায়ই বুঝতে শিখেছিলেন নিবেদিতা।

মার্তণ্ড মন্দিরের একটি বিশেষ অংশে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বামীজী একদিন বলেছিলেন,—ঐ দেখ, এই তক্ত থেকে সমগ্র কাশ্মীর-উপত্যকাটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নীল জলরাশির মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছে লোহিতাভ ঐ হর-পর্বত। মনে হচ্ছে যেন একটি সিংহ মাথায় মুকুট ধারণ করে অর্ধশায়িত ভাবে অবস্থান করছে। যথাযথ ভাবে দেখলেই দৃষ্টিতে ধরা পড়বে।…

পাণ্ড্রেস্থানের মন্দিরে বৌদ্ধ-স্থাপত্যের এক স্মরণীয় নিদর্শন দেখিয়ে আর একদিন বলেছিলেন,—এই মন্দির বৌদ্ধধর্মের একটি অক্ষয়-ক্ষেত্র।

কাশ্মীরের ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যায়। বৃক্ষ ও সর্প-পূজার যুগ, বৌদ্ধধর্মের যুগ, সৌর-উপাসনার মধ্যদিয়ে-প্রবর্তিত হিন্দুধর্মের যুগ, আর ইসলামের যুগ।—পাণ্ড্রেস্থান-মন্দিরটি দ্বিতীয় যুগের অন্তর্গত।

নিখুঁত ভাস্কর্যই বৌদ্ধশিল্পের বৈশিষ্ট্য। সূর্যচিহ্নিত চক্র বা প্রস্ফুটিত পদ্ম সে শিল্পের খুঁটিনাটি কারুকার্য মাত্র।

সর্প-সম্বলিত যে-সব মূর্তি, সেগুলির মধ্যে প্রাক্-বৌদ্ধযুগের চিহ্ন আছে। কিন্তু সৌর-উপাসনার যুগে যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল ভাস্কর্যের। সেজন্য, পাণ্ড্রেস্থান মন্দিরের যে সূর্যমূর্তি সেটি নৈপুণ্য-বর্জিত ও অসুন্দর।

মন্দিরের অনতিদূরে শিক্ষাদান-রত বুদ্ধমূর্তি। ভারতবর্ষের প্রাণ-পুরুষ, স্বামীজীর চোখে আদর্শ মহামানব। বৌদ্ধযুগে আর্ট বল, সাহিত্য বল—সবই ঐ পুরুষোত্তমকে ঘিরে।

অশুচি অম্বপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও তাঁর আপত্তি নেই।

অন্ত্যজের গৃহে, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও তিনি ভোজন করেছেন। কারণ, তার আহ্বানের মধ্যে যে আন্তরিকতা, যে অকপট ভক্তি নিহিত ছিল, বুদ্ধের কাছে সেই ছিল অতি মূল্যবান।

বিচার, বুদ্ধি এবং সহৃদয়তার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নি, কখনো দেখা যায় নি।

'Such a mixture of rationalism and feeling was never seen! Surely, surely there was none like him.'...

ভারতীয় শিল্পকলার অনুশীলন-ব্রতে এ ভাবেই নিবেদিতা দীক্ষা লাভ করেছিলেন।...

মোগল-যুগের স্থাপত্য, মোগল-যুগের ইতিহাস,—সেও এক গৌরবময় অধ্যায় ছিল ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে এবং স্বামীজীও যখনই সে অধ্যায়ে প্রবেশ করতেন তখনই যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন, অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন।

আলমোড়ার পথে সেকেন্দ্রার সমাধি-প্রসঙ্গে কিংবা তাজমহলের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী যে রহস্যময় মন্তব্য করেছিলেন—জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত নিবেদিতার স্মৃতির ফলকে সেটি মুদ্রিত ছিল। নিবেদিতার লেখায় আছে:

'Once he described Taj as a dimness, and again a dimness, and then—a grave! Another time, he spoke of Shah Jehan, and, then, with a burst of enthusiasm,—'Ah! He was the glory of his line! A feeling for, and discrimination of beauty that are unparalleled in history. And an artist himself! I have seen a manuscrift illuminated by him, which is one of art-treasures of India, What a genius!'...

মনে হয়, তাজমহল এবং সাজাহান সম্বন্ধে স্বামীজীর এ সব অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতই নিবেদিতার 'সাজাহান ড্রিমিং অব দি তাজ', কিংবা 'পাসিং অব সাজাহান'-প্রবন্ধের যথার্থ প্রেরণা, যদিও অবনীন্দ্রনাথের দু'টি চিত্রের পরিচয় প্রদানই ছিল তাদের আশু লক্ষ্য।…

'The soul that came to him out of the infinite, like a great white bird, bearing love and compassion in its wing is withdrawn once more into the bosom of God.…The wife, the mother, the queen is gone. but in Heaven there kneels a Saint before God, praying to Him for her beloved on earth'…এ বর্ণনার মাধুর্য অতুলনীয়।

নিবেদিতার রচনায় আরও আছে।…

'সেকেন্দ্রা অথবা মহামতি আকবর—এদের কথা, কতদিন কতভাবেই না স্বামীজীর মুখে শ্রবণ করতাম। আকবরের কীর্তিকথায় স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত, চোখে অশ্রু নির্গত হত। বলতেন…

আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজহীন, অনাচ্ছাদিত মুক্ত সমাধিটি দেখ, স্থাপত্য-নিপুণতার অমন নিখুঁত নিদর্শন অতি দুর্লভ।

আবার কখনো কখনো মধ্য-এশিয়ার কিংবা গ্রীসদেশের শিল্পোৎকর্ষের আলোচনায়ও প্রবেশ করতেন স্বামীজী। সে সব আলোচনার ভিত্তি ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা আর গভীর রসবোধ।…

ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীক প্রভাব—তখনকার দিনে প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত মতবাদে পরিণত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সে মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন, প্রতিপন্ন করেছিলেন তার অসারতা।

এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে তথ্যবহুল সে সব প্রতিবাদ শ্রবণ করে নিবেদিতা অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করেছিলেন

অবশ্য এসব অনেক আগেকার কথা, নিবেদিতা তখন স্বামীজীর সঙ্গে প্যারিসে।...

এ কালের বিবরণ-প্রসঙ্গে ডাঃ কালিদাস নাগের একটি উক্তি এইরূপ ছিল ঃ

'প্যারিস থেকে নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজী আবার শুরু করেছিলেন শিল্প-তীর্থ পরিক্রমা। এ পরিক্রমায় শুধু চিত্র-ভাস্কর্যাদি দেখান নয়, এবার তুলনামূলক আলোচনা এবং মন্তব্যও করেছিলেন প্রচুর।

অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া—ইউরোপের বৃহৎ বৃহৎ চিত্রশালা, পাশ্চাত্য শিল্প-সাধনার এক একটি পীঠস্থান। ছায়াছবির মত সে সব পীঠস্থান তাঁদের চোখের সম্মুখ দিয়ে ভেসে গিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে, ইস্তাম্বুলে, কায়রোতে প্রাচ্য শিল্পসংগ্রহের কত সম্পদ!...

পূব থেকে পশ্চিমে শিল্পপ্রভাব কতভাবে, কতধারায় প্রবাহিত হয়েছে, কত সূক্ষ্ম, অদৃশ্য পথে তাদের গতি, সে সব বোঝাবার জন্য, ব্যাখ্যা করবার জন্য স্বামীজীর কি আগ্রহ ও প্রয়াস!

মিশরের ইতিহাস-খ্যাত পিরামিড তাঁকে মাতিয়ে তুলত, শিল্প-চেতনায় তন্ময় করে দিত।

অথচ, তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে কিংবা এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পের ইতিহাস নিয়ে কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় নি। 'কারণ, শুধু শিল্পী নয়, শিল্পও তখন পর্যন্ত যেন অস্পৃশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ।'...

সেই পথিকৃৎ সন্ন্যাসীর কাছেই ধর্ম-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাধনার প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতা, পরিচ্ছন্ন করেছিলেন স্বকীয় শিল্পদৃষ্টি। তাঁরই অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখতে শিখেছিলেন—উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্পের সৌন্দর্য, দারু-শিল্পের নিপুণতা আর পাঠ করতে পেরেছিলেন—

সুন্দরের যত লেখা, মন্দিরের গায়ে আঁকা—

দক্ষিণ-ভারতে, রাজস্থানে, জয়পুরের সংগ্রহশালায়, প্রাচীরগাত্রে ও চিত্রলেখায়।—বুঝতে পেরেছিলেন,

'The greatness of the part of Indian Art, and the direction in which to expect for it a mighty future'···

ফলকথা, এভাবেই হয়েছিল নিবেদিতার শিল্প-অনুশীলনের সূত্রপাত, এবং এরই ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় জীবন-দর্শনের একটি বিশেষ তত্ত্বও তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই সত্য যে—

'the highest art is always charged with spiritual intensity, with intellectual and emotional revelation. It follows that it requires the deepest and finest kind of education'···

অতএব, ভারতবর্ষের শিল্প-বিপ্লবে নিবেদিতার অবদান সে দিন স্বভাবতঃই অতি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এবং তাঁর মত অমন দৃষ্টিতে ও দরদে, অমন ভাষা ও ছন্দে, অমন বিশ্লেষণে ও ভঙ্গীমায় ভারতীয় শিল্পের মর্মকথা আর কেউ প্রকাশ করতেও সক্ষম হননি।

আত্ম-বিস্মৃতির অভিসম্পাত থেকে জাতীয় সংস্কৃতির এই বিশেষ ধারাটিকে উদ্ধার করবার জন্য, পাষাণী অহল্যাকে আবার জীবন-চাঞ্চল্যে জাগ্রত করে তুলবার জন্য তেমন শুদ্ধ তপস্যাও সেদিন পর্যন্ত আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি।···

'Art is charged with a spiritual message in India to-day, the message of the nationality'···

এই ছিল নিবেদিতার বিশ্বাস। কাজেই, আর্টের নবজন্ম যদি আমাদের কাম্য হয় তবে দেশের যাঁরা চারণ-কবি, অখণ্ড জাতীয়তার

স্বপ্নে যাঁরা উদ্বুদ্ধ তেমন তরুণ কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। আত্ম-নিয়োগ করতে হবে শিল্প-সাধনায়।

বিশাল ভারতের পথে-প্রান্তরে, তার জলভরা নদ-নদীর কূলে-উপকূলে—আর্টের অজস্র অমূল্য উপকরণ ছড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে হবে, প্রকৃত শিল্পবোধ নিয়ে অনুভব করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে—ভারতীয় শিল্পের নব-উদ্বোধন।

ভারতের পল্লীবধূ সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে তুলসী তলায় ক্ষীণ-রশ্মি তৈল-দীপটি স্থাপন করে। বস্ত্রাঞ্চল গলায় জড়িয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণের অকুণ্ঠ প্রণতি জ্ঞাপন করে।···অপরাহ্ণে গ্রামের পথে জলভরা কলসী নিয়ে ধীরে ধীরে তারা গৃহে ফিরে আসে—আর তাদের সিক্ত বস্ত্রের জলধারা পল্লী-পথে দাগ কাটে, চিহ্ন রাখে,—আর্টের অমূল্য উপকরণ তো এদেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

রাজপথে, দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের দল ভিক্ষা মেগে ফেরে—দিনে-রজনীতে ; চাষী ক্ষেত্রে হাল চালনা করে, পাথর ভেঙে শ্রমজীবি তৈরী করে পথ, নদীর বুকে ভাটিয়ালির সুরতরঙ্গে নৌকা ভেসে চলে—উজান-স্রোতে, ভাটার-স্রোতে।···

হে ভারতের নবীন শিল্প-সাধক,—এদের অন্তরালে শিল্প-রচনার আলোছায়া কি তোমার চোখে পড়ে ? এত বিচিত্র ঐশ্বর্য, এত বিচিত্র সম্পদ যা ইউরোপে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সে কি তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ?

'Can you not go through life seeking for the glimpses that open up the great vistas ? They are seen oftener in this country than anywhere in Europe'—এ-ধরণের আহ্বানও নিবেদিতা ভিন্ন আর কারো কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় নি সে দিন।···

প্রতি শুভকার্যে বরণডালা সজ্জিত করবার একটি অনবদ্য প্রথা আছে হিন্দু পরিবারে, শান্তিবারি সিঞ্চন করবার নিয়ম আছে প্রত্যেকটি

অনুষ্ঠানের শেষে। তাদের মধ্যেও অতি উন্নত আর্টের উপকরণ লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে সব তত্ত্ব অনুধাবন করা চাই, উপলব্ধি করা চাই। একথা স্মরণ রাখা চাই যে বাহ্য চাকচিক্য বা বর্ণবিন্যাস কোন মহৎ শিল্পের লক্ষণ নয়, ভারতীয় শিল্পের তো নয়ই। আজকের আত্মবিস্মৃত ও দৈন্যপীড়িত ভারতবর্ষের পক্ষে শিল্প-সাধনার মূল লক্ষ্য হবে শুধু জাতীয়তার উদ্বোধন, শুধু সমষ্টি-জীবনের নব-রূপায়ন ঃ

'The re-making of the Motherland and no other'···

যা চির-সুন্দর, যা ঋতময়, শিবময় তার উদ্বোধনই হবে শিল্পের কাজ।···

'Art is not science. The pursuit of the beautiful,—not necessarily the sensuously beautiful, is her true function···এই নিবেদিতার অভিমত ছিল।

সে দুর্দিনে একমাত্র হ্যাভেলের 'Indian Sculpture and Painting'—নামক গ্রন্থটি ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের পৃষ্ঠায়ই এই বিশেষ ভারতীয়-সুরটি ধ্বনিত হয় নি, নব-জাগরণের এই আবাহন-মন্ত্রটি উদ্গীত হয় নি।

ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে বিচিত্রতা—তার একটি ধ্যান-মগ্ন অখণ্ড শিল্পমূর্তি আছে। সে শিল্পমূর্তির রূপ এবং গৌরবও ঐ দুই অ-ভারতীয় শিল্প-সাধক ভিন্ন অপর কেউ তেমন দরদের সঙ্গে সে দিন পর্যন্ত প্রকাশ করেননি।···

'Hinduism, in one of its aspects, is neither more nor less than a great school of symbolism. Every peasant, every humblest bazar-dweller, understands and loves a picture, a pot, a statue, a decorative emblem of any sort. The culture of the eye is perfect in this land, as it is said to be in Italy; and the ancient habit of image worship has made straight

and short and much travelled, the road from eye to heart.'···

এ সবই নিবেদিতার লেখনী-নিঃসৃত অতুলনীয় অভিমত।

সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে যে এঁদেরই প্রভাবে বহুলাংশে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের শিল্প-সাধনার নবজন্মলাভ, এঁদেরই প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ, অসিতকুমার প্রমুখ শিল্পাচার্যগণের ভারতীয় শিল্পভূমির পরিত্যক্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে সেদিনের নবযাত্রায় প্রথম পাদ-বিক্ষেপ। সেইহেতু নিবেদিতার জনৈক চরিতকার এ-প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

'ভারতের শিল্প-মহিমার প্রচারে নিবেদিতা সত্যই ছিলেন শিল্প-ভারতী। ভারতের শিল্প-লক্ষ্মী যেন সেদিন এই অ-ভারতীয় ভারত-দুহিতার লেখনী আশ্রয় করিয়াই নিজকে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।···সেদিন নিবেদিতা না থাকিলে বিপ্লবী রূপদক্ষ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথেব প্রতিভা এমন সার্থক হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।··· রূপরাজ্যে অবনীন্দ্রনাথেব অভিসার-পথের তিনিই ছিলেন অভিসাবিকা। জাতীয় শিল্প-জাগরণে নিবেদিতা নিজেই একটি অধ্যায়।'···

এ উক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কেউ এর সত্যতা স্বীকার করবেন, কেউ হয়ত করবেন না। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার যে সম্বন্ধ সেটি অতি মধুর ছিল, অতি প্রীতিপূর্ণ ছিল। নিজের বহু গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ অবনীন্দ্রনাথ সেকথা লিপিবদ্ধ কবে গেছেন।

নিবেদিতার দীর্ঘ দেহখানিই যেন অবনীন্দ্রনাথের চোখে আর্টেব একটি মহিমময় প্রকাশ ছিল।

এক আকস্মিক ঘটনাসূত্রে, তদানীন্তন আমেরিকান কনসালের বাড়ীতে নিবেদিতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

'গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগবা, গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা ; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।

সে যে কী দেখলুম কি করে বোঝাই?'—এই ছিল অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে নিবেদিতার প্রথম আবির্ভাব।

দ্বিতীয় আবির্ভাব জাষ্টিস হোম্‌উডের বাড়ীতে, একটি বৈকালিক চা-পানের আসরে। সে দিনের বর্ণনা আরও মনোরম:

'পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসেছিলেন নিবেদিতা। বড় বড় রাজা-রাজড়া, সাহেব-মেম গিস্‌গিস্‌ করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজ-সজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্পে গানে বাজনায় মাত্‌। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, রূপোলী নয়, সোনালী-রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্‌রফ্‌ ব্লাণ্ট এসে বললেন, কে এ?

তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।...

'সুন্দরী, সুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা —সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল,—নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। সাজ-গোজ ছিলনা, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর-স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা! দু'টি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।'

আরও একটি আখ্যায়িকা আছে 'আলাপচারী'র পৃষ্ঠায়। সেটিও অতি অনবদ্য।...

'নিবেদিতা মারা যাবার পর তাঁর একটা ফটো গনেন মহারাজকে দিয়ে জোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। লর্ড কারমাইকেল, তাঁর মত আর্টিষ্টের নজর বড় কারো ছিল না। আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল। আর্টেরই সখ তাঁর। জার্মান যুদ্ধের ঠিক আগে জাহাজ বোঝাই তাঁর যা কিছু ভালো-ভালো জিনিষ ও আমাদের আঁকা এক প্রস্থ ছবি বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। সেই জাহাজ গেল ডুবে ভূমধ্যসাগরে। তিনি দুঃখ করেছিলেন,—আমার আসবাবপত্র সব যাক্ কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তোমাদের ছবিগুলো যে গেল এইটেই বড় দুঃখের কথা। নন্দলাল যখন এসে দুঃখ করলে তাঁকে স্তোকবাক্য দিয়েছিলুম,—'ভালোই হয়েছে, এতে দুঃখ কি! আমি দেখছি জলদেবীরা আমাদের ছবিগুলো বরুণালয়ে টাঙিয়ে আনন্দ করছেন। গেছে যাক, ভেবোনা।'

সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন,—এ কার ছবি?

বললুম—সিষ্টার নিবেদিতার।

তিনি বললেন, 'এ-ই সিষ্টার নিবেদিতা? আমার একখানি এই রকম ছবি চাই।' বলেই, আর বলা-কওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাবা করে চলে গেলেন। ছবিখানি দেখলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে।'

এমনি আরও বহু আখ্যায়িকা আছে যাদের মধ্য দিয়ে নিবেদিতা এবং অবনীন্দ্রনাথের সুমধুর প্রীতি-সম্পর্কের একটি অনুপম চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সে সব দিনের 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের কত চিত্র-ভাষ্য যে নিবেদিতা রচনা করেছিলেন তার সংখ্যা নেই।...

অবনীন্দ্রনাথের দু'টি চিত্রের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নন্দলালের 'সতী' চিত্রের পরিচয়-কথাও প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ সতী অবশ্য দক্ষকন্যা সতী নয়। সতীদাহের যে নিষ্ঠুর প্রথা এদেশে একদিন প্রচলিত ছিল—তারই বর্ণচিত্র অঙ্কিত করে নন্দলাল নাম দিয়েছিলেন 'সতী'। এবং তারই চিত্রভাষ্যে নিবেদিতা লিখেছিলেন :

'In this perfect fearlessness, this absence of any self-consciousness, what a witness we find to the Indian conception of the Glory of Women !...

And certain it is that in the race that has borne them, their courage and high fealty can never die, but remain hidden, not again to be used in this form truly, but to find new utterance and fresh expression in the world-shaking crisis of future ages.

From the cloistered wife-hood of the old Indian home to the martyr-death of the Great Saint—was it not in truth a path of glory, on which each foot-print should receive our Salutation ?'

এ নির্ভিকতা, দেহ-বুদ্ধির নিঃশেষ বিলোপ—ভারতীয় নারী-আদর্শের এক মহিমময় আত্মপ্রকাশ সন্দেহ নেই !

যে জাতি এই সাহসিকতা, এই আনুগত্য যুগ যুগ ধরে বহন করে এনেছে—সে নিঃসংশয়ে মৃত্যু অতিক্রম করেছে। দূর ভাবীকালে এ প্রথা বিলুপ্ত হবে, হয়ত ঠিক এভাবে সে আর কোনদিন আত্মপ্রকাশও করবে না, কিন্তু অনাগত কালে, বিশ্বব্যাপ্ত মহাসংকটের দিনে এ আদর্শই হয়ত নূতন ভাবে নূতন পথে প্রকাশিত হবে।

প্রত্যুত, প্রাচীন ভারতবর্ষের অবগুণ্ঠনাবৃত বধূ-জীবনের নিভৃত অন্তঃপুর থেকে মহামনীষীগণের আত্মাহুতির গৌরবদীপ্ত মুক্ত-ক্ষেত্র পর্যন্ত এক ঋজু ও প্রশস্ত পথ বিসর্পিত। সেই পথ-পৃষ্ঠে যে পদচিহ্ন অঙ্কিত, তাকে আমরা প্রণাম করি, অভিবাদন করি।'...

নিবেদিতার লেখনী-নিঃসৃত এরূপ অসংখ্য অমূল্য চিত্র-ভাষ্য সেদিনের শিল্প-বিপ্লবকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, পথ দেখিয়েছিল।

চিত্র ও ফটোগ্রাফ একবস্তু নয়। আর্টের দৃষ্টি স্বতন্ত্র, ধ্যান স্বতন্ত্র। অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ করবার যে সূক্ষ্ম পথটী, সেটি তাকে জানতে হয়, চিনতে হয়। 'Art is not Photography'

হিন্দু-বিধবার উদাস, অনাসক্ত দৃষ্টিতে, তপস্যা-কৃশ মুখমণ্ডলে যে করুণ সৌন্দর্য নিহিত, স্বাস্থ্য ও বিলাসের উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যে সে সৌন্দর্য নিহিত নেই। অভিজ্ঞ শিল্পী মাত্রেই সে কথা অবগত আছেন। ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার প্রয়াসে, এযুগের শিল্প-সাধক যেন সেকথা বিস্মৃত না হন।

'The worn face of a Hindu widow with its fugitive smile and deep abiding sorrow may be better worth drawing, as well as more difficult to draw than the admired and boasted charms of wealth and youth and health.'

এমন অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ, শিল্পের আধ্যাত্মিক ভিত্তির দিকে এমন সুস্পষ্ট অঙ্গুলি-সঙ্কেত সেকালে নিবেদিতা এবং হ্যাভেল ভিন্ন আর কারো কাছ থেকে এসেছিল বলেও মনে হয় না।

জাপানের শিল্প-সমালোচক ওকাকুরার 'Ideals of the East' গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিলেন নিবেদিতা। সেখানও তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে— মানব সভ্যতার প্রসূতি এশিয়া। চিরদিনই সে অখণ্ড, চিরদিনই সে এক।

ভারতের উর্বর মৃত্তিকায় জন্মলাভ করেই মানবসভ্যতা সমগ্র মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।'...

শিল্পের নবজাগরণ-মুখে নিবেদিতার এ-সব ঘোষণা বিশিষ্ট প্রেরণার মতই কার্যকরী হয়েছিল।...

* * *

অবনীন্দ্রনাথের পর শিল্পাচার্য নন্দলালের কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় শিল্প-সাধনার তিনিও একজন সমর্থ সাধক এবং অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তর-পুরুষ। নিবেদিতার সংস্পর্শে শিল্পী-জীবনের যাত্রাপথে তিনিও প্রচুর উৎসাহ এবং আনুকূল্য লাভ করেছিলেন এবং তার প্রাপ্তি-স্বীকারও তাঁর স্বকীয় বর্ণনায়ই খুঁজে পাওয়া যায়।···

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

'তাঁর কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্তু প্রকাশ করে বলা কঠিন।···নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। আমি তখন গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের ছাত্র।

একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল দেখতে এলেন। আমি তখন দু'খানা ছবি করেছিলাম। একখানা মা-কালীর আর অন্যখানা সত্যভামার মানভঞ্জন। নিবেদিতা অনেকক্ষণ ধরে খুব যত্ন করে ছবি দু'খানা দেখলেন, প্রশংসা করলেন এবং আমাকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজ-সজ্জা বেশী থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে।'···

একদিন বোসপাড়ায় নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।··· নিবেদিতা বললেন, তোমরা নীচে আসন করে বস, আমি দেখি। আমরা বসলাম। নিবেদিতা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের প্রতি চেয়ে রইলেন। আমরা নিবেদিতার এই অদ্ভুত আচরণে মনে মনে আশ্চর্য বোধ করলেও মুখে কিছু বললাম না। দেখলাম, কী প্রশান্ত উজ্জ্বল সেই দৃষ্টি—এমনটি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। তারপর ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি এনে আমাদের দোখয়ে বললেন—কি দেখছ, বল দেখি? আমি উত্তর করলাম—একটি বুদ্ধমূর্তি।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দেখ, আমার গুরুদেবের চেহারার সাথে এ মূর্তির কি আশ্চর্য মিল!

তারপর নিবেদিতা আমাকে স্বামীজীর একখানা ছবি তৈরী করতে অনুরোধ করেন। দিনকয়েক পর আমি স্বামীজীর একখানা ছবি করে নিবেদিতাকে উপহার দিলাম। ছবি দেখে নিবেদিতার আনন্দের সীমা ছিল না।

আমাকে প্রশংসা করেছিলেন, আর বলেছিলেন, ছবিতে কাপড়-চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।...

তারপর থেকে আমি প্রায়ই নিবেদিতাব বাড়ী যেতাম। মিসেস হ্যারিংহ্যামের সঙ্গে আমার আর অসিতেব অজন্তা যাওয়াব সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন এবং তিনিই একরকম জোর করে আমাদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন।' ইত্যাদি।

শিল্প অসিতকুমারেব স্মৃতি-কথায়ও শিল্পক্ষেত্রে নিবেদিতার অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।

'শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিতা আমাদেব ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদেব মধ্যে একজন। ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদেব জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে যেতাম।...আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাবধান করতেন, আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দিই। আমাদেব হাতে দেশেব অবলুপ্ত আর্টের নব-জাগবণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সে কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন'।..

এ-উক্তি অসিত হালদারের স্বকীয় উক্তি।

এছাড়া, আরও একটি দিক ছিল—নিবেদিতার শিল্প-চেতনার এবং শিল্প-অবদানের ইতিহাসে।

সে ইতিহাসে বাংলার পল্লী-জীবনেব অনাড়ম্বর সাধারণ-মানুষ বড় অনুপম মাধুর্যে রেখাপাত করেছিল। সে সবই যেন এক নূতন

দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন, এক নূতন রস-বোধ নিয়ে আস্বাদন করতেন।

তখন বাংলাদেশ অবিভক্ত ছিল। তার শ্যাম-শোভাময় পল্লীজীবন বড়ো মধুর ছিল, বড়ো শান্ত ছিল। সে জীবনের কত নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, তার বেত, বাঁশ, খড়ের তৈরী ছোট ছোট কুটীর, সেথাকার ডালা-কুলো, হাতে-সেলাইকরা কাঁথা, মাটির পুতুল, দেয়ালে-আঁকা, মেঝেতে-আঁকা আলিম্পন, অগ্রহায়ণের ধানের কনক-মঞ্জরী, নিবেদিতার কাছে সে সবই ছিল সুন্দর, সে সবই ছিল উন্নত শিল্পের অমূল্য উপকরণ।

তাদের পশ্চাতে যে স্নিগ্ধ লাবণ্য ও কমনীয়তা লুকিয়ে আছে, যুগ যুগান্তরের যে ভাষা অদৃশ্য-লিপিতে লিখিত আছে, আর 'অধরাকে ধরবার' যে বিপুল প্রয়াস প্রচ্ছন্ন আছে তাদের সম্মিলিত উপচারেই তো শিব ও সুন্দরের উদ্বোধন হবে।

কিন্তু কোন্ পথে সেটি হবে, কারাই বা হবেন তার পথিকৃৎ, সেটিই ছিল প্রশ্ন এবং সে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছিলেন নিবেদিতা। সে উত্তরই বাংলার শিল্প-বিপ্লবের আদিযুগে তাঁর অবদান সম্পর্কে আমাদের শেষ কথা।…

'The highest art is always charged with spiritual intensity, with intellectual and emotinal revelation. It follows that it rquires the deepest and finest kind of education. The man who has not entered into the whole culture of his epoch can hardly create a supreme expression of that culture.'

অথবা,

'And so with Art. Its re-birth in India a to-day can only take place, if it be consciousy made the servant and poet of the migl y dream of an Indian Nationality.'—ইত্যাদি।

* * *

এরপর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে অবদান, নানা মৌলিক গ্রন্থাদি রচনায় তাঁর বহুমুখী মনীষার যে প্রকাশ,—রাজনীতি ও শিল্পক্ষেত্রে কর্মপ্রয়াসের সমান্তরাল ধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল, তারই কথা সংক্ষেপে আমরা বিবৃত করব।

লণ্ডনের শিক্ষকতা জীবনেই নিবেদিতা সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেকথা পূর্বে বলেছি।

এখন, ভারতবর্ষে, ১৯০৩ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর যে ব্যাপক কর্মকাল—সে কালে নানাকারণে এবং নানা অবস্থার মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

প্রথমতঃ, নিজ বিদ্যালয়ের অর্থাগমের জন্য তাঁকে লিখতে হয়েছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণেই লিখতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, জাতির নবজাগরণকে যদি যথাযথ পথে পরিচালিত করতে হয়, যদি 'ভারতে বিবেকানন্দের' মর্মকথার আলোকে এ-দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয় তবে তার জন্যও ব্যাপক প্রচার চাই, ঘরে ঘরে তাঁর বাণীর আবেদনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গণ-সংযোগ চাই।

তাছাড়া, আরও একটি চিন্তার বিষয় ছিল, যেটিকে তৃতীয় দিক বলা যেতে পারে!

ভাষাহীন কোন আন্দোলন সার্থক হয়না। বাক্যহীন হলে ভাব নিরব হয়, সুরহীন হলে গান পর্যবসতি হয় নিষ্প্রাণ কবিতায়। তাই, যে-কোন বলিষ্ঠ আন্দোলন, তো সে রাজনৈতিক আন্দোলনই হোক, অথবা শিল্প-আন্দোলনই হোক—শক্তিশালী সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা রাখে। আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা নিবেদিতার কাছে সে তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিলনা।

কাজেই, তদীয় কর্ম-জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে তিনি তাঁর সবল লেখনীকে নিরলস সাধনায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। এবং তারই ফলে, তেরোখানি ছোট-বড় গ্রন্থে ভারতের ইতিহাস, তার ধর্ম,

স্থাপত্য, শিক্ষা ও জাতীয়তার বিচিত্র মৌলিক ভাষ্য রচিত হয়েছিল। আর রচিত হয়েছিল বিবেকানন্দের অনন্য জীবনকথা।

তাছাড়া, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে অনুপ্রবেশ তার পশ্চাতে ছিল তাঁর স্বকীয় অনুরাগ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ। ফলে তদানীন্তন কালে এদেশের বহু সংবাদপত্র তাঁর রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং নিবেদিতাও সেই সূত্রে বহু বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

উদাহরণ স্বরূপ, 'ডন্'-সোসাইটি এবং 'ডন্'-ম্যাগাজিনের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ডন্-সোসাইটির উদ্যোগেই তৎকালে 'জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ' স্থাপিত হয়েছিল, আর সে পরিষদের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেই শ্রীঅরবিন্দ বরোদার কর্ম ত্যাগ করে বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করেছিলেন। সে যুগে 'ডন্'-ম্যাগাজিনও একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল এবং সে পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন নিবেদিতা। জাতীয়-শিক্ষা পরিষদের সাহায্য-কল্পে শিক্ষা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই সময়ই তিনি রচনা করেছিলেন।...

বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া', নটেসনের 'হিন্দু', মতিলালের 'অমৃতবাজার' এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'—নিবেদিতার বহুমূল্য রচনা সম্ভারে নিয়মিতভাবে সমৃদ্ধ হত।...

তাছাড়াও ছিল, পৃথ্বীশ রায়ের 'নিউ ওয়ার্ল্ড', শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগিন্, বন্দেমাতরম, আর্য ; র‍্যাট্‌ক্লিফের স্টেট্‌স্‌ম্যান। আবার ইংলিশম্যান, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট, বিহার হেরাল্ড, প্রবুদ্ধ-ভারত প্রভৃতি পত্রিকারও চাহিদা ছিল, নিবেদিতার রচনার জন্য।...

'প্রবাসী' পত্রিকার আদিযুগে, ঠিক ঐ শ্রেণীর একটি সর্বভারতীয় ইংরাজী মাসিক-পত্রিকার জন্য একসময় আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। প্রতিভাশালী সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাতে সে কাজে হাত দেন—নিবেদিতার তাই ছিল আকাঙ্ক্ষা। পরে,

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকাটি যখন প্রকাশিত হল তখন নিবেদিতা স্বভাবতঃই বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য, তখনও নিবেদিতার সঙ্গে রামানন্দবাবুর পরিচয় হয়নি। কিন্তু 'মডার্ণ রিভিউ' যাতে উৎকৃষ্ট রচনায় পূর্ণ থাকে, সে দিকে কোন অভাব তাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সেজন্য নিবেদিতার উদ্বেগ এবং সক্রিয় সহায়তা কোনটারই অভাব ছিল না।…

'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই দীর্ঘকাল ধরে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলা.া এবং অসিতকুমারের বহু চিত্রের বিশ্লেষণ এবং ভাষ্য তিনি রচনা করেছিলেন। অজন্তার গুহা-শিল্প সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার জন্ম-বৎসর থেকেই পর্যায়ে পর্যায়ে রচিত হয়েছিল।

নিবেদিতার কথা প্রসঙ্গে রামানন্দবাবুর উক্তি এইরূপ ছিল :

'তাঁর রচনা-নৈপুণ্য এমনই উচ্চস্তরের ছিল যে অতি সাধারণ বিষয়বস্তুও তাঁর রচনাগুণে এক অনুপম সৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিত। তবে তিনি নিজের ইচ্ছামত লিখিতেন এবং যখন প্রেরণা বোধ করিতেন—কেবলমাত্র তখনই কলম ধরিতেন, তাহা না হইলে আদৌ লিখিতেন না। একবার বিদেশী একটি পত্রিকা তাহাদের নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতে নিবেদিতাকে অনুরোধ করে এবং তাহার জন্য প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু নিবেদিতা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।…

নিবেদিতা সাধারণ কথাবার্তার সময় সম্পাদকের কাজের দোষ-ত্রুটি যাহা দেখিতেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সে সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না।'…

মানুষ-নিবেদিতা সম্পর্কে রামানন্দবাবু বলেছিলেন,—'নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমার ধারণা করতে পারবনা। দেশ উন্নত হলে একদিন তাঁর কদর বুঝবে।'

কিন্তু তিনি নিজে সে কদর উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে,

রামানন্দবাবু এবং নিবেদিতার পারস্পরিক পরিচয় কালক্রমে একটি নিবিড় সৌহার্দ্যে রূপায়িত হয়েছিল। তখন প্রায়ই দেখা যেত 'প্রবাসী' আফিস থেকে ছবি কিংবা লেখার প্রুফ নিয়ে লোক ছুটেছে—নিবেদিতার কাছে, তাঁর সেই বোস-পাড়ার ছোট বাড়ীতে, আর নিবেদিতা হাতের সব কাজ সরিয়ে রেখে যথাসত্বর 'প্রবাসী'র কাজ শেষ করে দিচ্ছেন।

একবার রামানন্দবাবু রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে দেখবার জন্য তাঁর গৃহে গমন করেছিলেন। পায়ে জুতা ছিল, অঙ্গে ছিল দীর্ঘ, শুভ্র আভরণ। কিন্তু রোগীর ঘরের দরজায় এসেই তিনি জুতা খুলে রাখলেন। সকলে ব্যস্ত হয়ে নিষেধ করতেই, নিবেদিতা বলেছিলেন,—'না, আমি জানি, রোগীর ঘরে জুতো নিয়ে আসতে নেই।'

ঘটনাটি অবশ্যই ছোট। কিন্তু ছোট ঘটনার মধ্যদিয়েও যে নিরভিমান অন্তরের সহজ ঔদার্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে পারে—এ যেন তারই একটি নিদর্শন।…

* * *

বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজের সঙ্গে লেখিকা হিসাবে যুক্ত হবার বহুপূর্বেই অবশ্য তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল। আর সে পরিচয় হয়েছিল আমেরিকায়—এক বিচিত্র পরিবেশে এবং অপ্রীতিকর এক সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে। ঘটনাটি বলছি,…

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ একাধিক কারণে নিবেদিতার মনে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে পারে নি। বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাই, প্রথম দিনই সংঘর্ষ বেঁধেছিল।

নিবেদিতাই আক্রমণ করেছিলেন। বলেছিলেন,—'ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা, অত্যন্ত বিকৃত রুচির হয়ে পড়েছেন ভারতবর্ষে। মনে হয় তাঁরা যেন ভারতবর্ষের লোকই নন।'

স্বভাবতঃই, বিপিনচন্দ্রও প্রতি আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। তারপর, দ্বিতীয়বারের সংঘর্ষটি হয়েছিল আরও তীব্র। সেদিন মিসের বুলের গৃহে চা-পান উপলক্ষ্যে প্রায় দু'তিন শত শিক্ষয়িত্রী সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদেরই কয়েকজনের সঙ্গে একটি পার্শ্ব-কক্ষে নিবেদিতা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছিলেন। ঘটনাক্রমে বিপিনচন্দ্রও সে সময় সে কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এর পরের অংশটুকু বিপিনচন্দ্রের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি :

'ক্রমে জাতিভেদের কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার উপর তাঁহার চোখ পড়িল। আমাকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐ মিঃ পাল বসে আছেন। ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানেন না এবং বিবেকানন্দের প্রতি তাঁদের ভক্তিও অপরিমিত নয়।···

আমি কহিলাম···'জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা ভুল ধারণা আছে।···সেটা এই যে, এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না।···এই কথাটি নিতান্ত ভুল। জাতিভেদ থাকা বা না-থাকার উপর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিছুতেই নির্ভর করে না।···

কিন্তু অন্যদিকে একথা মানিতেই হইবে যে হিন্দু-ভারতের জাতিভেদ মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা অবাধে আমাদের মানুষ বলিয়া যে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না।'···

নিবেদিতা অমনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—একথা ঠিক নহে। আপনি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করিতেছেন।···

আমি কহিলাম—হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।

ইংরাজীশিক্ষা এই প্রাচীন শাস্ত্রের-বন্ধন হইতে আমাদিগকে

মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ পড়িতে পারিতেছি,…ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেছি। প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম-প্রচার করিবার অপরাধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমার কণ্ঠে চারি আঙ্গুল পরিমাণ গরম গলান সীসা ঢালিয়া দিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চার প্রায়শ্চিত্ত করাইত।…

নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, মিথ্যা কথা। স্বামীজীকে হিন্দুরা ধর্মগুরুর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে।

আমি কহিলাম—'মিস নোবল, আপনি স্ত্রীলোক না হইলে এই অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদিগের ধর্মগুরু নহেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই।…

নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আমার কথায় তাঁর গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।'…

এই ঘটনা দু'টির মধ্য থেকে নিবেদিতা-চরিত্রের যে-দিকটি পরিস্ফুট হয় সেটি শুধু তাঁর সুগভীর ভারত-প্রেম বা গুরুভক্তি নয়, পরন্তু তাঁর দূর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচায়ক হিসাবেও তারা মূল্যবান। বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতার এবং বিপিনচন্দ্রের সে দিনের উক্তির মধ্যে নিবেদিতার উক্তিই যে অভ্রান্ত ছিল আজ কালের নিকষে শুধু হিন্দু-সমাজে নয়, মানব-সমাজের এক বৃহৎ অংশেও সেটি পরীক্ষিত হয়েছে।…

সে যাই হোক, বিপিনচন্দ্রের স্মৃতিকথা থেকে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেই এ-প্রসঙ্গ আমরা শেষ করব।

এটি বোস্টন নগরীর একটি ঘটনা। সেদিন বোস্টনে এক ধর্ম-

সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র। নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। বিপিনচন্দ্রের উদাত্তকণ্ঠে আর্য-সভ্যতার গৌরব-কথা বিশেষভাবে সেদিন বিঘোষিত হয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে সে বিঘোষণা শ্রবণ করেছিলেন নিবেদিতা আর মুহূর্তে সমস্ত অতীত তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন,—'এই কংগ্রেসে আমি যখন বক্তৃতা করিয়াছিলাম তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরবকাহিনী শুনিয়া নিবেদিতার সকল দেহ-মন-প্রাণ গরবে ভারী হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে ব্রাহ্মসমাজের লোক, নিবেদিতা তখন সেকথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার গুরুর নিন্দা করিয়াছি বলিয়া আমাব উপর যে বাগ হইয়াছিল তাহার স্মৃতি পর্যন্ত রহিল না। ভারতের কীর্তিগাথা বিদেশীদের কাছে আমি গাহিতেছি দেখিয়া নিবেদিতার চোখে আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন,— ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। মিসেস বুলের বাড়ীতে আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে মিলিয়াছিলাম। এই 'কংগ্রেস অব রিলিজিয়ানের' অধিবেশনে ভারতের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আমরা এমন এক সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত মতভেদ সত্ত্বেও চিরদিন অটুট ছিল।'

বস্তুতঃ, 'কুমারী মার্গারেট নোবল—ভগিনী নিবেদিতা নামে সমগ্র ভারতে পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। নিবেদিতা নাম-গ্রহণ তাঁহার সার্থক। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধারণ ধারাতে তিনি নিঃশেষে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন।' ইত্যাদি

এছাড়া—বিপিনচন্দ্র তাঁর 'সোল অব ইণ্ডিয়া'—গ্রন্থেও নিবেদিতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।··

স্টেট্‌স্‌ম্যান,—সেদিনও যেমন একটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রিকা ছিল, আজও তেমনি। তৎকালে র‍্যাট্‌ক্লিফ স্টেটস্‌ম্যানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং সাংবাদিকতার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে সে পরিচয় নিবিড়-বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করে এবং উভয়েই উভয়ের গুণমুগ্ধ সহকর্মীরূপে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাজ করেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে র‍্যাট্‌ক্লিফের ব্যক্তিগত বিবরণ পাওয়া যায়। যথাস্থানে তার উল্লেখও আমরা করব। কারণ, নিবেদিতার চরিতানুধ্যানে সে বিবরণটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।...

*　　　*　　　*

র‍্যাট্‌ক্লিফ ভিন্ন—'অমৃতবাজার' পত্রিকার দুই খ্যাতনামা পরিচালক মতিলাল ঘোষ এবং শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গেও নিবেদিতার অতি হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। যে সূত্রে সে সম্পর্ক প্রথম গ্রথিত হয়—সেটি এইরূপ ঃ

তখন অমিত-প্রতাপ লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট, বঙ্গ-ভঙ্গ যাঁর স্বকীয় কূটনীতির বিচিত্র রচনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কন্‌ভোকেসন্‌ সভায় চ্যান্সেলার হিসাবে ভাষণ দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। ভাষণে বক্রোক্তি করেছিলেন ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের শিথিলতার কথা উল্লেখ করে। বলেছিলেন, 'এরা অত্যুক্তি প্রিয় ও অতিরঞ্জন-স্বভাব।'

সে সভায় নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন এবং কার্জনের সমালোচনায় আহত নাগিনীর মত ফণা উদ্যত করেছিলেন। পার্শ্বোপবিষ্ট স্যার গুরুদাসকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন, —'এ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা কথা।'

সভার পর সারা দেশ যেন অপমানে ও রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে রোষ প্রকাশের ভাষা কৈ ? মুখপত্র কোথায় ? নিবেদিতা

স্যার গুরুদাসকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে। সেখানে, কার্জনেরই রচিত একটি গ্রন্থ—'দি প্রবলেমস্ অব দি ইষ্ট' —বের করে নিবেদিতা দেখিয়েছিলেন—রাজনৈতিক প্রয়োজনে কার্জন নিজে কীভাবে মিথ্যা আচরণ করেছিলেন কোরিয়ায় এবং বাহাদুরি দেখিয়ে নিজেই বিবৃত করেছিলেন সে-কাহিনী।...

স্যার গুরুদাস কার্জনের মন্তব্যের প্রতিবাদ রচনা করলেন আর নিবেদিতা স্বয়ং সে-রচনাটি অমৃতবাজারের ঘোষ-ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে সেটিকে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও যেন তাঁর বিক্ষুব্ধ অন্তর শান্ত হল না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি স্বতন্ত্র রচনা নিজ নামেও তিনি প্রকাশ করলেন এবং তারপরে মনটা যেন কতটা শান্ত হল।

এ প্রসঙ্গে, উত্তর কালে ৺মতিলাল অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছিলেন :

এই একটিমাত্র ব্যাপারের জন্যই নিবেদিতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধণীয়। লণ্ডনের একাধিক পত্রিকার সম্পাদক পর্যন্ত সেদিন অমৃতবাজারকে এজন্য প্রশংসা করেন—কিন্তু তাদের কেউই জানতেন না যে এই শব্দভেদী বাণ-নিক্ষেপের কৌশল একমাত্র নিবেদিতারই জানা ছিল।...

* * *

র‍্যাট্‌ক্লিফের কথা উল্লেখ করেছি।

নিবেদিতার রচনা মধ্যে মধ্যেই স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 'সত্যের উচ্চতম আদর্শ' আখ্যা দিয়ে ঐ কার্জনী-মন্তব্যের প্রতিবাদে একটি লেখাও স্টেটস্‌ম্যানেই প্রকাশ করেছিলেন নিবেদিতা।

র‍্যাট্‌ক্লিফ শুধু নিবেদিতার লেখার নয়, বক্তৃতারও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং সমগ্র মানুষটিকেই তিনি অশেষ প্রীতি ও

সৌহার্দ্যের চোখে দেখতেন। একটি বক্তৃতার অভিজ্ঞতা র‍্যাট্‌ক্লিফ এইভাবে লিখেছিলেন :

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালের একটি রবিবারের কথা বলছি। সোদন সন্ধ্যায় তাঁর বাগবাজারের স্কুলে গিয়েছিলাম। সে স্কুলেই তিান বাস করতেন। সন্ধ্যায় আসর বসত এবং সে আসরেই তিনি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হতেন, আলোচনা করতেন।

সেদিন আমি যাওয়া মাত্রই বললেন,—আজ আর গল্প করা হবে না। বক্তৃতা দিতে যেতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ? বললেন,—কর্নওয়ালিস ষ্ট্রিটের একটি স্কুলে।···

নিবেদিতার সঙ্গে আমিও গেলাম সে সভায়। স্কুলের প্রাঙ্গণটি পরিপূর্ণ। বক্তৃতামঞ্চের উপর একজন কথক বসেছিলেন, তাঁর পার্শ্বে মাটির টবে একটি তুলসী গাছ। উপরে চন্দ্রাতপ। আমরা প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কথক-ঠাকুর রামায়ণ থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। সকলে মুগ্ধ হয়ে সে আবৃত্তি শুনতে লাগল। প্রায় এক ঘণ্টা পর কথক ঠাকুর নিবৃত্ত হলেন। তারপর উঠলেন নিবেদিতা।

কোনরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি তিনি ভারতীয় ছাত্রদের আদর্শ সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন,—তোমরা মনে কর কেবল রামায়ণ আবৃত্তি করলে কিংবা রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করলেই রামায়ণ-পাঠ সার্থক হবে ? যে আদর্শে একদিন প্রাচীন ভারতবর্ষ উদ্বুদ্ধ হত, তার জন্য গৌরব বোধই কি যথেষ্ট ? না, সেটা যথেষ্ট নয়। যে সমাজ থেকে একদিন রামায়ণ উদ্ভূত হয়েছিল, যে-কাহিনী রামায়ণের মর্মকথা—সে কি চিরদিনের মত নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ?

আমি বলি,—রামায়ণের ভাব ও রামায়ণের অক্ষয়-কাহিনী আজও ভারতের চিত্তভূমি থেকে উৎসারিত হচ্ছে। তোমরা ভারতের তরুণ সন্তান, তোমাদের জীবন-রামায়ণ রচনা কর। গল্প দিয়ে নয়, কাহিনী দিয়ে নয়—পরন্ত জন্মভূমির অকপট সেবার মধ্যদিয়ে সে

রামায়ণের বুনিয়াদ গ্রথিত কর। জীবনের প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় বিকশিত কর রামায়ণ, রূপায়িত কর রামচরিত-মানস। তবেই রামায়ণ পাঠ সার্থক হবে।'

বলাবাহুল্য নিবেদিতার সে তীক্ষ্ণ আবেদন যেন তরুণ-সম্প্রদায়কে বিদ্যুৎস্পর্শের মত আঘাত করেছিল। তারা বিস্মিত হয়েছিল, উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

* * *

নিবেদিতার অধিকাংশ গ্রন্থ-রচনার কালও এই। Civic & National Ideals, Aggressive Hinduism প্রভৃতি গ্রন্থ একালেই তিনি রচনা করেছিলেন।

Hints on National Education—গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধের রচনাকালও এই।...

এ-কালেরই শেষ অংশে অর্থাৎ, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে নিবেদিতারই কোলের কাছে 'গোপালের মা' সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছিলেন। গোপালের মা-র কথাও প্রসঙ্গতঃ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।...

এ-কালেই আবার পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ্য দেখা দিয়েছিল, এবং সে দুর্ভিক্ষ্যে সেবাকার্য শুরু করে কর্মী প্রেরণ করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন।...সে সেবাকার্যে নিবেদিতাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং অংশ গ্রহণ করেই পূর্ববঙ্গের গণ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

নিবেদিতার জীবনে সেও একটি অমূল্য অভিজ্ঞতা ছিল। পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ্য-পীড়িত অঞ্চলে পল্লীতে পল্লীতে, কুটীরে কুটীরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন—কখনো পদব্রজে, কখনো নৌকায়। পল্লী-বাসীরা অবাক হয়ে দেখত, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হতবাক হয়ে যেত। আর নিবেদিতা দেখতেন তাদের দারিদ্র্য ও দৈন্যের পুঞ্জীভূত বেদনা। কতকাল ধরে সে বেদনা তারা সহ্য করে আসছে।

অথচ, তার মধ্যেও পল্লীবাসীরা কত সরল, কত কৃতজ্ঞ। নিবেদিতা যখন কোন গ্রাম ছেড়ে আসতেন, তাঁর নৌকা ঘাট থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসত— তখন নদীতীরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকত, বুকের কাছে হাত দুটি নিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে যেতেন সেই দৃশ্য দেখে, তাঁর চোখে অশ্রু নির্গত হত।…

কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসেই নিবেদিতা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাঁকে আক্রমণ করেছিল।

রোগমুক্তির পর বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েকমাস তিনি দমদমে বাস করেছিলেন—আনন্দমোহন বসুর 'ফেয়ারী হল' নামক একটি উদ্যান-বাটীতে।

সেখানে শরীর কতকটা সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তাঁর লেখার কাজও আবার শুরু হয়েছিল। এই দমদমেই Cradle Tales of Hinduism—গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। আর শুরু হয়েছিল নিবেদিতার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি—The Master as I saw Him—গ্রন্থ,…সন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। এর অনেক পরে—Foot-falls of Indian History-গ্রন্থটি রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন।

Foot-falls-এর কথা ইতিপূর্বে বলেছি। সে-গ্রন্থের পনরটি অধ্যায়ে ভারতের ইতিহাসের একটি মৌলিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর চরিতানুধ্যানে সেটি একটি অতি মূল্যবান দলিল।

ভারতবর্ষের চরণাম্বুজে নিজ জীবন-পদ্মটি উৎসর্গ করেছিলেন এই নারী আর তাঁর ধ্যান-মানসেও ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড, অনবদ্য রূপ মূর্ত হয়েছিল। আর ঐ দু'য়ে মিলে রচিত হয়েছিল এক অতল গভীর মানস-সরোবর, এক বিস্ময়কর প্রয়াগ-সঙ্গম।

'India is at once the occasion and the explanation of the Web of Indian life.'—

ভারতেতিহাসের পদচিহ্নের মধ্যে এই তত্ত্বটি নিহিত। এটিকে বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তবেই অতীতের গর্ভগৃহ থেকে নূতন ভারতবর্ষের উপকরণ-সম্ভার বেরিয়ে আসবে।

এদেশের ইতিবৃত্তে একটি সমন্বয়-সাধনার মধুর সুর জাগ্রত আছে। অন্য বহুক্ষেত্রে ভারতের নরনারী অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, নিপুণতার অভাবে পেছিয়ে গেছে—একথা সত্য। কিন্তু এই সমন্বয় ?

এই সমন্বয়-ক্ষেত্রেই ভারতীয় প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ হয়েছে !

'One of the master-facts of Indian history, a fact borne in upon us more deeply with every hour of study, is that India is and always has been a synthesis···

The Indian people may be defective in the methods of mechanical organisation, but they have been lacking, as a people, in none of the essentials of organic synthesis'—এই নিবেদিতার আবিষ্কার।···

পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুবিস্তৃত বিপণি থেকে ভারতবর্ষ কালে কালে সম্পদ আহরণ করেছে, ঋণ গ্রহণ করেছে। তারপর সে সবেরই অনুকরণে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে—এ অভিমত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক অনেকেই প্রকাশ করে থাকেন। ভারতবাসীরা সে অভিমতে ক্ষুব্ধ হয়, লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু নিবেদিতা বলেছিলেন,—এতে ক্ষোভ বা লজ্জার কোন হেতু নেই। কারণ সমস্ত অভিযোগটিই ভিত্তিহীন। ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক অবস্থান, একটি উপ-মহাদেশের মত যার বিস্তৃতি, তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিরবে আশ্রয় গ্রহণ কর। তারপর চিন্তা কর নিজ দেশের কথা, তার ইতিহাসের কথা তবেই প্রকৃত তত্ত্বটি প্রকাশিত হবে।

'Is it claimed that some other people made Buddhism ? Or that Shiva with his infinite renunciation was a dream of Europe ?'—

না, কোনকালেই সেটা সত্য নয়, সেটা বাস্তব ঘটনা নয় ?

যেটি সত্য ঘটনা, যেটি যথার্থ ইতিহাস সেটি হচ্ছে একটি সার্থক সাঙ্গীকরণ-প্রক্রিয়া, অপরাপর দেশের মহৎ ভাব-সম্পদ থেকে উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া, মিলিয়ে নেওয়া ।· সেটাই করেছে ভারতবর্ষ এবং বেশ নিপুণতার সঙ্গেই করেছে। তাতে ভুলও কিছু হয়নি, লজ্জিত হবারও হেতু কিছু নেই।

ইট, কাঠ, মাটি, পাথর নিয়ে কোন শাশ্বত সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায় না। যদি যায়ও তবু কালজয় করে সে সংস্কৃতি বাঁচে না। সেজন্য ভারতবর্ষ তার জীবন-স্বপ্নকে প্রকাশ করতে চেয়েছে দর্শনে, উপনিষদে। আর তারই ফলে ভারতবর্ষ আজও নবীন, আজও অব্যাহত-গতি। ভাবীকালের জন্য স্বপ্ন-রচনার আজও তার বিরাম নেই।—

'India, alone of all nations of antiquity, is still young, still growing, still keeping a firm hold upon her past, still reverently striving to weave her future out of the past'···

এমনিভাবে ভারতেতিহাসের এক একটি সূত্র নূতন অর্থে, নূতন মর্যাদায় অলঙ্কৃত করে চিত্রিত করেছেন নিবেদিতা—Foot-falls of Indian History-র ছত্রে ছত্রে, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

*　　　*　　　*

প্রাচীন রাজগীর, প্রাচীন অজন্তা, চীন পর্যটক ফা-হিয়েন্, হিউয়েন্‌ৎ-সাঙ্, ইৎ-সিং,—আর্যাবর্তের জীবন-স্পন্দনের কত নিগূঢ় পরিচয়ই না এদের কাছ থেকে তিনি আহরণ করেছিলেন।

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—পরস্পরের সঙ্গে এরাই বা কোন্ সূত্রে আবদ্ধ?

হিন্দুধর্মের নানাদিক—শৈব মতবাদ, বৈষ্ণব মতবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের অফুরন্ত রস-ভাণ্ডার, নালান্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ;—হৃষিকেশ, নাসিক, উজ্জয়িনী—ইতিহাসের পদপাতে যাদের নাম ও কীর্তি মহাকালের বুকে অক্ষয় অমরত্ব লাভ করেছে।

সর্বশেষ বারাণসী, শিবপুরী স্বর্ণময় বারাণসী। সর্বতীর্থ সার, আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি,—তারই পাদমূলে আত্মনিবেদন করে, নিবেদিতার মতে, ইতিহাসের পদধ্বনি নিরব হয়ে গেছে।

বারাণসিতেই জাতীয়-সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রকাশ!…'the epitome of whole of Indian synthesis of nationality.'

কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে কোন্ চরম পরিণতির লক্ষ্যে ছুটে চলেছে আজকের বারাণসি? কে জানে?

চারহাজার, ছ'হাজার বৎসর পরে—ঐ দশাশ্বমেধ ঘাট, ঐ মহাশ্মশান মণি-কর্ণিকা, ঐ বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির—এরা কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে?

অথবা, কোন যাদুমন্ত্রের অদৃশ্য প্রভাবে তারা পুনঃ জাগ্রত হবে, পুনঃ সঞ্জীবীত হবে?

'Is she to become a memory to her children after four thousands or more years of a constant growth?

Or will there prove to be some magic in the new forces of enthusiasm that are running through the veins of the nation, that shall yet make itself potent to renew her ancient life-streams also?'

এই মহা-জিজ্ঞাসার সম্মুখেই ইতিহাসের পদধ্বনি স্তব্ধ হয়েছে, Foot-falls of Indian History—সমাপ্ত হয়েছে।…

আর নিবেদিতার সর্বোত্তম গ্রন্থ—'মদীয় আচার্যদেব, যেমনটি দেখিয়াছি'—My Master as I saw Him,—যে গ্রন্থটিকে অবলম্বন করেই আমাদের নিবেদিতা-অনুধ্যানের দুঃসাধ্য প্রয়াস—সেটিরও রচনা এ-কালেই শুরু হয়েছিল—এবং শেষ হয়েছিল দীর্ঘ চারবৎসর পরে, নিবেদিতার মর্ত-জীবনের একেবারে সমাপ্তি-মুখে।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি চরিতকথা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রথিত করে—মানব-সমাজকে উপহার দেবেন, নিবেদিতার মনে এ আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল গ্রন্থ-রচনায় হাত দেবার বহু পূর্বে। হয়ত, স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে, বেদনা-রুক্ষ যে-দিনগুলি তাঁকে ঘিরে ধরেছিল—সে সব দিনেই তাঁর মনে সে আকাঙ্ক্ষা প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরই এল কর্মের প্রচণ্ড আলোড়ন,—বন্যার জলের মত, বৈশাখের বেলা-শেষেব ঝড়ের মত। তরঙ্গে তরঙ্গে তারা যেন নানাদিক থেকে নিবেদিতাকে আচ্ছন্ন করে দিল, প্লাবিত করে দিল। সে কর্ম-আবর্তে গুরুর জীবনী রচনায় হাত দেবার আর তাঁর অবসর রইল না, মানসিক অবস্থাও রইল না। তারপর কালক্রমে কর্মোন্মাদনা যখন স্তিমিত হয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগশীর্ণ দেহ-মনকে স্বতঃই অন্তর্মুখী করে তুলল তখন সেই পুরাতন আকাঙ্ক্ষা আবার নূতন করে জাগ্রত হল অন্তরে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মনের অবচেতন প্রদেশে অন্তিম দিনের অবিলম্বতার কোন অস্পষ্ট আভাসও তিনি প্রাপ্ত হলেন।

কাজেই, একালেই সে অমর-গ্রন্থ রচনার শুভ সূত্রপাত হয়েছিল—'Being the pages from the life of Swami Vivekananda'…এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় বহন করে। তারপর দীর্ঘ চার বৎসরের কত বিনিদ্র রজনীর ধ্যান চিন্তায়, কত দিবসের স্মৃতি-সঞ্চয়নে তার পূর্ণ রূপায়ন। প্রতি পদবিক্ষেপে কত আশা, কত

আকাঙ্ক্ষা! কত উৎসাহ-নিরুৎসাহের দোলা-চাঞ্চল্য।···আমার চিন্তা এবং লেখনীর মধ্য দিয়ে হে মহাজীবন, তুমি মূর্ত হও, প্রকাশিত হও। আমি অক্ষম তা জানি, তবু হে পরমানন্দ মাধব, তোমার কৃপাকণায় তো সবই সম্ভব হতে পারে!

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব।

আমাকে সক্ষম কর।···

এমনি কত প্রার্থনা, কত ঐকান্তিক আকুতি নিয়েই না তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। যে জীবনটির মধ্য দিয়ে একটি অখণ্ড উপমহাদেশ প্রতিফলিত, অসংখ্য বিপরীত ভাব-ধারার বিচিত্র সামঞ্জস্যে যাঁর জীবনবেদের সঙ্কলন, তাঁর চিন্তা ও কর্মের নিখুঁত আলেখ্য রচনা অতি দুরূহ সাধনা, অতি দুষ্কর মহাযজ্ঞ।···

আধ্যাত্মিক জীবনমাত্রেই বস্তু-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। তারা বাহ্য ঘটনা-নিচয়ের উপর নির্ভরশীল হয় না। বাহ্য ঘটনা-নিচয়ের প্রত্যক্ষতাকে অতিক্রম করে অনুভূতির সূক্ষ্ম সমরস ভূমিতেই সে-সকল জীবন-মহিমার গৌরব স্ফূর্ত হয়। স্বভাবতঃই সাধক ভিন্ন অন্যের পক্ষে সে মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এবং সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে দু'টি চরিত্রই যুগপৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। লেখক এবং লেখ্যজীবন দুইই পরিস্ফুট হয়। তাই, 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রেও শুধু যে স্বামীজীর জীবন-প্রতিকৃতির এক বৃহদাংশই আমাদের চোখে ধরা পড়ে তাই নয়, পরন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দু'টি উৎসুক, জিজ্ঞাসু চক্ষু সে প্রতিকৃতিটি দেখেছিল তাদেরও যেন আমরা দেখতে পাই। ধ্যায় জীবনটিও যেমন দেখি, ধ্যানকর্ত্রীর মূর্তিটিও যেন তেমনি চকিতে সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। আত্ম-সমাহিত গুরুর পদপ্রান্তে আভূমি-প্রণতা কন্যা একই পটভূমিতে যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয়। সে যুগ্ম-চিত্রেরই বাণীরূপ-প্রকাশ—'The Master as I saw Him'—গ্রন্থ।

শক্তি-মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধক স্বামী সারদানন্দের আশীর্বাদ ও শুভ-কামনা নিয়ে গ্রন্থখানি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এই পৃথিবীর বুকে, দর্শন করেছিল উষার প্রসন্ন আলোক-সম্পাত।

'In sending out into the world this book—the tribute of her love and gratitude to her Guru—Nivedita has the blessings and good wishes of all his brothers.'…এই ছিল তাঁর আশীর্বাদ।

সেদিন ১লা ফেব্রুয়ারী, স্বামীজীর পুণ্য-জন্মতিথি ছিল। বহু চেষ্টায় একখানি মাত্র বাঁধান পুস্তক দপ্তরীর কাছ থেকে পূর্বদিন সন্ধ্যায় পাওয়া গেল। নিবেদিতা অর্ঘস্বরূপ পুস্তকখানি স্বয়ং নিয়ে গেলেন বেলুড়মঠে। দ্বিতলে স্বামীজীর শয়ন-কক্ষটিতে উপস্থিত হয়ে জীবিতাবস্থায় যে চৌকিটিতে তিনি উপবেশন করতেন, যার সঙ্গে তাঁর পুণ্য-জীবনের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত—সেই চৌকিটির উপর স্থাপন করলেন নিজের জীবন-স্বপ্ন গ্রন্থখানি। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দীর্ঘ চারবৎসরের অতন্দ্র তপস্যার ফলশ্রুতি, নিবেদন করলেন গুরুর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

অস্ফুট উচ্চারণ করলেন এই ঐকান্তিক নিবেদন—

'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন',

আমি গঙ্গাজলে এই গঙ্গাপূজা আজ সমাপ্ত করলাম। এর ভালো-মন্দ, দোষ-ত্রুটি যা কিছু সবই তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে আমি মুক্ত হচ্ছি, ধন্য হচ্ছি।

শুধু এই আশা, ভাবীকাল যেন এর পৃষ্ঠা থেকে তোমার দিব্য-জীবনটিকে অনুধাবন করতে পারে। উত্তর-যুগের সাধকগণ যেন তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষের অখণ্ডরূপ ও মহিমময় পুণ্য-প্রকাশ সম্যক উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

হে দেব,

'তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।'

—()::()—*

॥ তেরো ॥

নিবেদিতার কর্মজীবনের কয়েকটি বিশেষ দিকের আলোচনা আমরা সমাপ্ত করেছি। এ-দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে, তাঁর যে অবদান, সে বিষয়েও 'নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা'-প্রসঙ্গে কতকটা আমরা উল্লেখ করেছি। অবশ্য সে উল্লেখ স্বভাবতঃই পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কারণ সে কালটিই ছিল অপূর্ণ এবং অপরিণত। বিদ্যালয়টিও ছিল তখন একেবারে নূতন এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাভূমিতে নিবেদিতার যে আবির্ভাব সেটিও ছিল তখন নূতন। কাজেই, আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভবই হয় নি।...

অথচ, সেকালের পর দিনে দিনে সে বিদ্যায়তন, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, ব্যাপক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষা-চিন্তাও বহুদিকে বিস্তৃত হয়েছে, বহু অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য লাভ করেছে। তদীয় উত্তর-জীবনের শিক্ষা-বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ এবং পুস্তক-পুস্তিকাই নিঃসংশয়ে তার সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর উত্তর-কালীন্ শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের একটু বিশদ পরিচয় দিতেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

* * *

নিবেদিতা বলতেন,—'আমি শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাব্রতই আমার জীবনব্রত।'...কথাটি সত্য।

সেজন্য তাঁর কর্ম-জীবন নানা সময়ে, নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত

হলেও নিজ বিদ্যালয়ের জীবন-প্রবাহ থেকে সে কখনো বিচ্যুত হয়নি। নানা দিকের সহস্র দায়িত্ব স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে গ্রহণ করলেও বাগবাজারের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির দায়িত্বই ছিল তাঁর মুখ্য দায়িত্ব এবং শিক্ষায় অনগ্রসর এদেশে শিক্ষার-ব্যাপক প্রসারই ছিল তাঁর সর্বোত্তম কামনা।

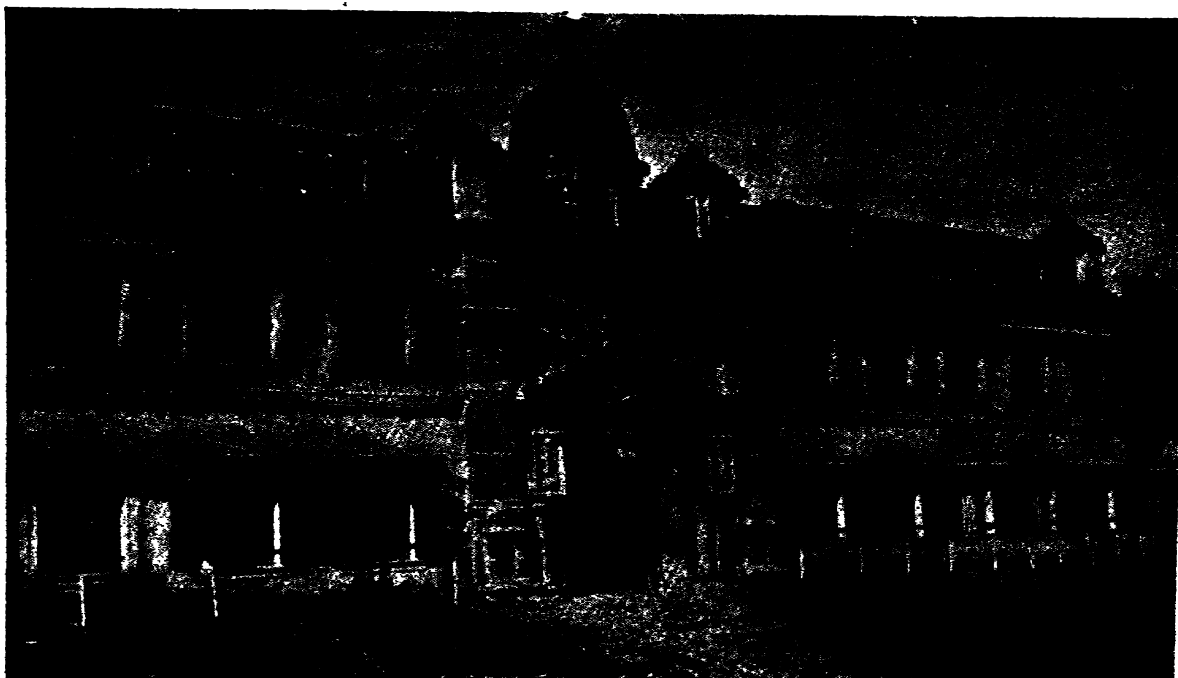
'Education is the first line of defence'—এ ঐতিহাসিক সত্য নিবেদিতার অবিদিত ছিল না। তাই, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার মুখবন্ধে সর্ব প্রথমেই তিনি এক মহা-আহ্বান উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন:

পাশ্চাত্যদেশে, শিক্ষা সমাপ্তির পর, প্রত্যেক যুবককে অন্ততঃ চার পাঁচ বৎসর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপর সে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হলেই, মুহূর্তের বিজ্ঞপ্তিতে, তাকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়, অস্ত্র গ্রহণ করতে হয়। ঠিক সেইভাবে, বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষেও শিক্ষা-সৈনিকদল প্রয়োজন।—

কারণ, শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা মিটাতে হলে এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই, নিবেদিতা বলেছিলেন:

'Why should it be thought impossible that every student, when his own education is over, should be called upon to give three years to the people.'…

অবশ্য, দেশের যুব-শক্তির দেশপ্রেমের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অনুপ্রেরণা থেকেই এ পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে। কখনো আইনের সহায়তায় নয়, রাজশক্তির ঔদ্ধত্য দিয়ে নয়। স্থূল কথাটি এই যে—মানুষই মানুষকে জাগ্রত করবে, এক জনের জীবন-মূল্যেই শত-জীবন সমৃদ্ধ হবে। শিক্ষার এইই শাশ্বত নীতি।



নিবেদিতা স্কুল

'Without men's lives no seed of the mind germinates.'

অথবা,

'All must always, in the last resort, depend upon this, the quantity and quality of human life that can be sacrificed to it.'···

কিন্তু কয়জন, শিক্ষার জন্য নিজ সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেবে, বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ উপেক্ষা করবে ?···

'How many will give up comfort, place, opportunity, ease, even perhaps their whole life, for this,—the elementary education of Indian people ?'—

খুব বেশী নিশ্চয়ই নয়। অথচ, এটিই আশু প্রয়োজন এবং প্রথম প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, নিবেদিতার মতে, শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা। এটি অতি পরিষ্কারভাবে স্থির করা দরকার যে এই বিরাট উপ-মহাদেশের পক্ষে কি জাতীয় শিক্ষা উপযোগী হবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও নির্ধারিত হওয়া চাই যে সে-শিক্ষার সার্থক বিকিরণ হবে কোন্ পথে এবং মনস্তাত্ত্বিক্ কোন্ প্রণালীতে।

নিবেদিতার নানা গ্রন্থে ও রচনায় এসব সমস্যারই আলোচনা আছে। তাদের সমাধানের ইঙ্গিত আছে। আর আছে এক করুণ বাস্তব অবস্থার ছবি। এক অস্ফুট ক্রন্দনের বিশ্রামহীন আর্ত-ঝঙ্কার।

'Here in India, the woman of the future haunts us. Her beauty rises in our vision perpetually. Her voice cries out on us.'

ভারতের নারী-সমাজ যেন এক উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষারত। সে শিক্ষা চায়, আলো চায়। 'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ ?'—

—তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি চায়।···

'না জাগিলে সব ভারত ললনা,

এ ভারত বুঝি জাগেনা, জাগেনা।'···একথা যেন প্রাণে প্রাণে সে উপলব্ধি করে থাকে।···

যেন বুঝতে পারে যে আজ ভারতীয় নারীর চতুর্দিকে শুধু তমসা, শুধু অজ্ঞতার দুর্নিরীক্ষ্য কুজ্ঝটিকা। তার দেব-মন্দির আলোহীন, উৎসবহীন। জ্ঞানের দীপশিখায় সে অন্ধকার বিদূরিত করতে হবে। তাই সে আকাঙ্ক্ষা করে।···

এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা অবশ্য স্মরণাতীতকাল ধরেই হিন্দু-নারীর অধিগত ছিল। সে শিক্ষা—'in its own way was highly specialsed,' হয়ত আধুনিক যুগের মূল্যায়নে তার দাম খুব বেশী নয়। সুতরাং, তাকে আধুনিক কালের চাহিদার অনুরূপ করে নিতে হবে। সেজন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে চরিত্রের উপর।···

'All education worth having must first devote itself to the devéloping and consolidating of character and secondarily concern itself with intellectual accomplishment.'

অর্থাৎ, আজকের ভারতবর্ষে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শুধু জাতীয়তা নয়, জাতি-সংগঠন; শুধু ন্যাশনাল নয়, নেশন-মেকিং।···

জাতীয়-শিক্ষা বস্তুটির অসংখ্য অর্থ এবং সংজ্ঞা উত্তরকালে প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু সে-কালে, নিবেদিতা যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ এই ছিল যে যথার্থ জাতীয়-শিক্ষার আরম্ভটি হবে শিশুর গৃহে, একান্ত পরিচিত পরিবেশে। আর তার পরিসমাপ্তি হবে বিশ্বের উদার বিস্তৃতির মধ্যে।

এই জাতীয়তা আর নিঃশেষ পরার্থপরতা একই বস্তু হবে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এমন একটি পরিবেশ

আমরা সৃষ্টি করব যেখানে উন্নত দেশপ্রেমের বায়ু শ্বাসে শ্বাসে শিশু গ্রহণ করবে।

ভারতবর্ষের জন্যই ভারতবর্ষ, 'India for the sake of India'—এই হবে জপ-মন্ত্র। সে-মন্ত্র সে গৃহে শিখবে, বিদ্যালয়ে শিখবে ; নিদ্রায় শিখবে, জাগরণে শিখবে।

যাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁরা একদিকে উপযোগী উপকরণাদি দিয়ে একটি সুস্থ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবেন শিক্ষার্থীর অন্তরে, আর অন্যদিকে,—'by contrast' তার সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করে দেবেন। জ্বলন্ত, জীবন্ত প্রেমে সে উদ্বুদ্ধ হবে, শক্তিশালী হবে। ক্রমে তার মনে এই ভাবটি মুদ্রিত হবে যে—'the family weighs nothing in comparison with the people.'

নিবেদিতার মতে—বীর হয়েই সবাই কিছু জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু বীরের উদ্ভব হয় পরিবেশে, শিক্ষায় আর উন্নত আদর্শের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়,···'by the pressure of heroic thought.'

সে পথে সহায় হয় তার আত্মত্যাগের স্বভাবজ সংস্কার। সুতরাং, সেই স্বাভাবিক আত্মত্যাগ-প্রেরণাটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে একই উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে পরিচালিত করাই আজকের ভারতের জাতীয়-শিক্ষার মূলকথা হবে।

'Let love for country and contrymen, for people and soul, be the mould into which our lives flow hot.'

এ যদি করা সম্ভব হয়, যদি আমাদের প্রয়াসে কোন কপটতা না থাকে, বিকৃত পরানুকরণ-মোহে পথভ্রষ্ট আমরা না হই তবে জ্ঞানের ঋজুপথ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। সকল খণ্ডতাকে অতিক্রম করে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ আমাদের ধ্যানে মূর্ত হবে, কর্মে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

জাতি-সংগঠনের সার্থকতা আসবে এই পথে।

এরও আগে, কিণ্ডারগার্টেন স্তরের শিক্ষা-সম্বন্ধে নিবেদিতার অভিমত এইভাবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন :

কিণ্ডারগার্টেনের বাংলা প্রতিশব্দ শিশু-উদ্যান। আধুনিক যুগে শিক্ষাজগতে জার্মান-শিক্ষাবিৎ ফ্রোবেলের এক অভিনব অবদান এই কিণ্ডারগার্টেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে সে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ হবে একটু স্বতন্ত্রভাবে। এখানে জননী ও শিক্ষয়িত্রীর সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষা-সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হবে। মা গ্রহণ করবেন শিক্ষয়িত্রীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়তা আর শিক্ষয়িত্রী নেবেন মায়ের স্নেহ-কোমলতার অমৃত-রসায়ন।···

হিন্দু-সমাজে নানা ব্রতানুষ্ঠান প্রচিলত আছে। বারোমাসে তেরপার্বন—এদেশের একটি প্রবাদ বাক্যের মত। সে সব ব্রত বহুলাংশে ইউরোপের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির অনুরূপ। কিণ্ডার-গার্টেনে যে সকল উপকরণ বা গিফ্‌ট ব্যবহৃত হয়—ব্রতানুষ্ঠানেও অনুরূপ ধরণের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষাদান কালে সেই উপকরণগুলি ছোট ছোট সরস গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে। সেটি হবে প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে আসবে খেলা অথবা ব্রত। আর সর্বশেষ অভিনয়, —নৃত্য, গীত ও ক্রিয়ার এক সুন্দর সমন্বিত প্রকাশ।

এইভাবে উপকরণ, আখ্যায়িকা, ব্রত এবং অভিনয় এই চতুষ্কোণের সহায়তাই 'শিশু-উদ্যান' সার্থক হবে।

প্রাচ্য ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্যই এই যে সে অন্তরের দিক থেকে শিশুকে গড়ে তুলতে চায়। বহিঃবিশ্ব তাকে নিরন্তর সহায়তা দান করে। প্রকৃতির মুক্ত-অঙ্গনতলই হয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষিত ভূমি। তার অবদানই শিক্ষার প্রকৃত উপকরণ। তবে, তাদের যথাযথ ব্যবহার চাই, প্রয়োগ চাই।···

আরও একটি কথা বলতেন নিবেদিতা।

মানুষের প্রগতিপথে প্রত্যেক দেশে ধর্মের কতগুলি বিধান

আছে, রীতি আছে। আজকের ধর্ম-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক যুগে—সে সব রীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে নানাদিক থেকে। কাজেই,—

'It behoves us to formulate, to the best of our ability, that theory of education, by which the human unit is to be virilised or initiated into the full powers of Humanity.'

আর—

'Always learning by experience. Always joy, the hunger for more.'…

এই-ই হবে ভারতীয়-কিণ্ডারগার্টেনের মূল পদ্ধতি। মাধ্যমিক-শিক্ষা, কলেজী-শিক্ষা, কারিগরি-শিক্ষা, ভাষা-শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কেও নিবেদিতার সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ আছে।…তাদের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা অবশ্য এখানে প্রবেশ করব না। প্রসঙ্গতঃ শুধু একথাটিই বলব যে শিক্ষাক্ষেত্রের অতি-ব্যস্ততা, যা আধুনিক-কালে এদেশে অত্যন্ত পরিস্ফুট, তার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন নিবেদিতা। বলতেন—

'It is a mistake to imagine that an education finished at twenty represents the enjoyment of an advantage over that which is finished at twenty-two'

শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে, তপস্যা নিয়োগ করতে হবে। সর্ট-কাট ব্যাপারটি শিক্ষাক্ষেত্রে মোটেই শুভ ফলপ্রসূ নয়।…

ভাষা-সমস্যা আজ আমাদের দেশের বহু সমস্যার অন্যতম। জটিলতার দিক দিয়ে তার স্থান সমস্যা-তালিকার বেশ উপরের দিকেই বলা যায়। কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকেই এ বিষয়ে নিঃসংশয়-অভিমত প্রকাশ করেছিলেন নিবেদিতা।

প্রাথমিক স্তরে, শিশুর দশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত, মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা তার কাছে উপস্থিত করা হবে না। একালে মাতৃভাষায়ই সে সব করবে। কথা কইবে, বই পড়বে, লিখবে, চিন্তা করবে, স্বপ্ন দেখবে। পরবর্তী স্তরে, বুনিয়াদ দৃঢ় হলে, মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও শেখান হবে। এটা সর্বথা বাঞ্ছনীয় না হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিহার্য। কারণ, নিবেদিতার মতে,—

'No Indian vernacular can give any one freedom of communication throughout the whole country, and while Hindusthani or Urdu goes near to satisfying this test, English is still the more lingual franchise, not of India alone, but of the world as a whole, and is further, a modern language, by whose means can be obtained an exactness of thought which is the key to many languages and to almost all the culture of the present age.'

আজকের ভাষা-গোঁড়ামির চরম নির্বুদ্ধিতার দিনে নিবেদিতার এ অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলেই আমাদের মনে হয়।

এরপর তাঁর নিজের শিক্ষয়িত্রী-জীবনের কথা। তিনি নিজকে 'শিক্ষয়িত্রী' বলে উল্লেখ করতেন—একথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তাঁর জীবিতকালের যে 'নিবেদিতা-বিদ্যালয়' সেটি ছিল একান্তই একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার। নিবেদিতার মত মনস্বিনী নারীর উপযোগী কর্মক্ষেত্র কোনদিক দিয়েই নয়। কিন্তু সে জন্য নিবেদিতার কোন অসুবিধাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। যাঁরা প্রচুর শক্তির অধিকারী, নাম, যশ ও ক্ষমতা-লোলুপতা যাঁদের কর্মের পশ্চাৎ থেকে উঁকি-ঝুঁকি দেয় না, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা বহুলাংশে অনুরূপ হয়ে থাকে। তাঁদের স্বপ্ন ও কল্পনা দূর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত থাকে। আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে উত্তর-পরিণতির সম্ভাবনাই

তাঁদের পরিতৃপ্ত রাখে। বর্তমানের অপরিণত অবস্থা ক্ষুব্ধ করে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন :

'তাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ।'...

ফলে, 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ের' সে-দিনের অপরিণত, অসহায় অবস্থাকে অতিক্রম করে এক মহান ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন নিয়েই বিভোর-মগ্নতায় তিনি কাজ করতেন। স্নেহময়ী জননী যেমন সংসারের সহস্র কাজের মধ্যেও সর্বক্ষণ একটি সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নিজ সন্তানের প্রতি, যেমন পরিচর্যার একটি নিরলস হস্ত সর্বদা প্রসারিত রাখেন তার দিকে,—নিবেদিতাও তেমনি নিজ বিদ্যালয়টির দিকে সর্বদা একটি অতন্দ্র মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতেন। যখনই সময় করতে পারতেন তখনই ইংরাজী, ইতিহাস, অঙ্কন প্রভৃতি শেখাবার ভার নিজে গ্রহণ করতেন। নূতন নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতেন নানাভাবে। নানা হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার সুন্দর ব্যবস্থাও ছিল সে বিদ্যালয়ে।...

হাতের কাজ ও পুঁথির পড়া—দু'দিকের দু'টি শিক্ষা এক সমন্বয়-সূত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে এবং সম্মুখে থাকবে উচ্চ জীবনাদর্শ, বিচিত্র জীবন-স্বপ্ন। তার ফলে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ—ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, পুরাতন এ-পূর্বদেশে এক নূতন নারী-সমাজ গঠন করবার পথে হবে পথিকৃৎ—এই নিবেদিতার আশা ছিল, কল্পনা ছিল।...

মধ্যে মধ্যেই মেয়েদের নিয়ে তিনি নিজে নানাদিকে বেরিয়ে পড়তেন। কখনো যেতেন পশুশালায়, কখনো যেতেন সংগ্রহশালায়, আবার কখনো নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে উপস্থিত হতেন।

দর্শনীয় যা কিছু সব নিজে দেখাতেন, নিজে ব্যাখ্যা করতেন, বিশ্লেষণ করতেন। কখনো কখনো উদ্দীপ্ত দেশ-প্রেমের মহামন্ত্র উচ্চারণ করতেন, কখনো গাইতেন অভীর গান, বেদান্ত-সংগীত। কখনো অতি সামান্য উপকরণ থেকে, অথবা অতি তুচ্ছ উদাহরণ থেকে অসামান্য জীবন-তত্ত্বে নিয়ে যেতেন শিক্ষার্থীদের। তাঁর ছাত্রীদের প্রত্যেকের কাছে সে-সব ছিল অমূল্য অভিজ্ঞতা, অবিস্মরণীয় স্মৃতি-সম্পদ।

কখনো পশুশালায় গিয়ে মেয়েরা দেখতে পেত বিচিত্র দেহের ক্যাঙ্গারু, পেটের নীচে একটি করে থলি। কোন কারণে ভয় পেলেই বাচ্চাগুলি মুহূর্তে মায়ের পেটের-থলিতে গিয়ে প্রবেশ করছে।···

সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট হত। মেয়েদের বলতেন,—'ঐ দেখ, ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাগুলিকে দেখ। মায়ের আশ্রয়ে কেমন নির্ভয়ে তারা বাস করে। সত্যি, যাদের মা আছে তাদের আর ভয় কি?

তা, আমাদেরও তো মা আছেন, তবে আমরাই বা ভয় পাব কেন?···আমরা চলব বীরের মত, 'Like a Hero.' বস্তুত এই, 'Like a Hero' কথাটি ছিল তাঁর জীবনেরও মটো, বিদ্যালয়েরও মটো।

দক্ষিণেশ্বর যখন যেতেন, নিজে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতেন না। কারণ, গোঁড়া হিন্দু-সমাজ তাঁকে সে অধিকার দিত না। কিন্তু মেয়েদের পাঠাতেন দেবী-প্রতিমাকে প্রণাম করতে। আর নিজে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বিগ্রহ দর্শন করতেন। গৌর-বর্ণ মুখখানি ভাবে-ভক্তিতে অপূর্ব শ্রী ধারণ করত। মেয়েদের বলতেন:

'তোমরা প্রার্থনা কর মায়ের কাছে, প্রার্থনা কর ঠাকুরের কাছে—যেন তোমরা ভারতবর্ষের যোগ্য সন্তান হতে পার। মানুষ হতে পার।'···

এমনি ভাবে, একদিকে মায়ের স্নেহ ও ভগ্নীর সমাদর, আর অপর দিকে পরিচালিকার নিরলস তপস্যা ও শৃঙ্খলাবোধ যুগপৎ প্রয়োগ করে—'নিবেদিতা-বিদ্যালয়ে'র শৈশব-যুগে তাকে তিনি রক্ষা করেছিলেন, বর্ধিত করেছিলেন।···

আবার, বিদ্যালয়ের কার্য-ব্যপদেশে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অতি নিকট সংস্পর্শে তাঁকে যেতে হয়েছিল, অতি নিবিড় পরিচয়ে তাঁকে আবদ্ধ হতে হয়েছিল, যেমন হয়েছিল রাজনীতি ক্ষেত্রে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কিংবা শিল্পান্দোলনের ক্ষেত্রে।···

সে-সব পরিচয়ের বিশেষ ছাপ পড়েছিল নিবেদিতার জীবনে, দানে-গ্রহণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর চরিত্রে। সেজন্য, এ-প্রসঙ্গে অন্ততঃ তাঁদের কয়েকজনের, যথা, আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু, সু-সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের নামোল্লেখ অপরিহায।

প্রথমেই আচার্য জগদীশ ও তৎপত্নী অবলা বসুর কথা বলি। বসু-দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইংলণ্ডে, সন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। কালক্রমে সে পরিচয় প্রগাঢ় প্রীতি ও বন্ধুত্বে মধুময় হয়েছিল।

উত্তর-জীবনে বসু-পরিবারের সঙ্গে নানা তীর্থে ও নানা পার্বত্য-নিবাসে অনেক আনন্দময় দিন তিনি যাপন করেছিলেন। এমন কি দার্জিলিং-এ জীবনের শেষকয়টি দিনও তিনি যাপন করেছিলেন ঐ বসু-পরিবারেরই গৃহে এবং শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করেছিলেন তাদেরই কোলের কাছটিতে।···

বসু-পত্নীকে নিবেদিতা 'বৌ' সম্বোধনে অভিহিত করতেন। আপদে সম্পদে, দুঃখে-সুখে উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভর করতেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনা ও প্রতিভা নিবেদিতার মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছিল। ভবিষ্যতের-ভারতবর্ষ এই ঋষিকল্প মনীষীর মৌলিক আবিষ্কারের অবদানে জগৎ-সভায়

মর্যাদার আসন লাভ করবে—কায়মনোবাক্যে একথা বিশ্বাস করতেন নিবেদিতা। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ঠিক সাধারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাদের পশ্চাতে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জীবন-দর্শনের স্পর্শ আছে, ব্রহ্মবাদের প্রভাব আছে। এর ফলে, এদেশের অদ্বৈততত্ত্ব হয়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সুতরাং, জগদীশচন্দ্রের একটি নিজস্ব বীক্ষণাগার গড়ে উঠুক, স্বাধীনভাবে নব নব আবিষ্কারে হাত দেবার সুযোগ তিনি লাভ করুন—সেজন্য নিবেদিতার অপরিসীম আগ্রহ ছিল, প্রয়াসও ছিল। সেদিন দেশ স্বাধীন ছিল না। বিদেশী শাসকের কাছ থেকে উৎসাহ বা সহায়তা—কোনটিরই প্রত্যাশা ছিল না। কাজেই, অনেকটা আত্মসমর্পণের ভাব নিয়েই তিনি বলেছিলেন জগদীশচন্দ্রকে—এ কাজতো ভগবানের কাজ। তাঁর ইচ্ছা হলে সবই একদিন ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য হতাশ হলে চলবে না।

জগদীশচন্দ্রের যে কয়খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—

Plant Response, Living and Non-living, Comparative Electro-Physiology এবং Irritability of Plants—এদের প্রত্যেকটির সম্পাদনায়ই নিবেদিতার প্রভূত অবদান ছিল। আজকের বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গাত্র-ভাস্কর্যও নিবেদিতার শিল্পী-মনের সাক্ষ্য বহন করে। যে বজ্র-প্রতীক ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্নরূপে মন্দির-শীর্ষে দেখা যায় সেটিও নিবেদিতারই কল্পনার দান।

ঐ বজ্র-প্রতীক অবলম্বনে একদিন ভারতের জাতীয়-পতাকা প্রস্তুত হবে—নিবেদিতার এই পরিকল্পনা ছিল। মহা-ঋষি পুণ্যশ্লোক দধিচী, কোন এক পৌরাণিক যুগে দেবরাজের ব্যগ্র-প্রার্থনায় আপন দেহাস্থি দান করেছিলেন। সুরশক্তি সেই অস্থি দিয়ে প্রস্তুত করেছিল বজ্র, প্রস্তুত করেছিল অব্যর্থ আয়ুধ,—যাতে অসুর-শক্তি বিনষ্ট হয়েছিল। অতএব, অনাগত ভবিষ্যতে যেদিন ভারতবর্ষ

স্বাধীনতা অর্জন করবে, সেদিন ঐ বজ্র-প্রতীককেই যেন জাতীয়-পতাকায় সে গ্রহণ করে।—এই ছিল নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা।

তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা অবশ্য পূর্ণ হয়নি। তবে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের আন্তর্জাতিক তপস্যাক্ষেত্রে সে বজ্র, ত্যাগের প্রতীকরূপে আজও চিহ্নিত আছে।···

জগদীশচন্দ্রের প্রতি নিবেদিতার প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব এত গভীর ছিল যে তাঁর একখানি পূর্ণ জীবন-চরিত লিখবার বাসনাও এক সময় নিবেদিতার মনে উঠেছিল। নানা কারণে সে বাসনা পূর্ণ হয়নি। জীবনের শেষ দিনগুলিতে, যখন মধ্যে মধ্যে মৃত্যুর কথা তাঁর মনে উঠত, তখন মনে হত—এ-জীবনের পরমায়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জগদীশচন্দ্রের জীবনী-রচনা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। অথচ, সে জ্ঞান-তপস্বীর একখানি জীবনী অবশ্য রচিত হওয়া চাই। তাই দেখা যায়,—১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস ওলিবুলকে এ-সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে তিনি চিঠি লিখছেন—যেন অন্ততঃ একশত পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ—এ উদ্দেশ্যে তিনি রেখে দেন। তাহলে, পরে কেউ গ্রন্থরচনা করলে—গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।···

এ যেমন জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে নিবেদিতার অভিমতের কথা—ঠিক তেমনি নিবেদিতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অভিমতও কতক কতক জানা যায়। নিবেদিতার ত্যাগ ও মনীষা, সর্বোপরি তাঁর অসামান্য ভারত-প্রেম জগদীশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর অকপট, শুদ্ধ জীবন জগদীশচন্দ্রকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সেই হেতু নিবেদিতাকে একান্তভাবে নিজ পরিবারভুক্ত মনে করতেন।

বলতেন,—'দেশ উপযুক্ত হলে একদিন নিবেদিতার জীবনের মূল্য বুঝবে। কিন্তু আজ তাঁর মহাপ্রাণতা বা ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করতে পারব না। কতদিন নিবেদিতার সঙ্গে গঙ্গার ধারে

বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি একটি পুতুল বা এক টুক্‌রা পাথর দেখে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়তেন। প্রাচীন ভারতের কি গৌরব, স্থাপত্যের কি উৎকর্ষ সেই পুতুলের মধ্যে, সেই প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন—এই পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না।

সর্ব বিষয়েই তাঁর অসামান্য প্রতিভা ছিল, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল।

যদি তিনি নিজের দেশে, ইউরোপে কাজ করতেন—তবে নাম, যশ, অর্থ—তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু সে সব চিরদিনের মত বর্জন করে তিনি, আজীবন প্রায় অর্ধাহারে, আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে, আত্ম-বিসর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য সে এক অসামান্য আত্মনিবেদন।'…

আরও বলতেন,—'আমি নিজে হতাশ হলে বা অবসন্ন বোধ করলে তাঁরই কাছে আশ্রয় নিতাম।'…

কতদিন, বসু-পরিবারের গৃহে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুবর্গের সম্মেলনে—নিবেদিতা বক্তৃতা করতেন। ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করতেন। কত দীর্ঘ প্রহর মহা-আনন্দে যাপন করতেন। আবার, আচার্য বসুও বহুদিন নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে দীর্ঘ সময় যাপন করতেন। বিজ্ঞান-সাধনার নানা পরিকল্পনা তখন রচিত হত। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হত, নানাগ্রন্থের ভাষা এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। —রবীন্দ্রনাথের মতে—'জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে মহনীয়া নারী নিবেদিতার নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'…

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন। অথচ দেহত্যাগ করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বহু পূর্বে।…কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতি জগদীশচন্দ্র অন্তরে বহন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গিয়েছিল যে নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষা কল্পে এক

লক্ষ টাকা তিনি তাঁর উইলে রেখে গেছেন, আর যথাকালে সেই টাকায় 'নিবেদিতা হল' প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর যোগ্যা সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু।...

আর একটি কথার উল্লেখ করেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করব। সেটিও সন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেরই কথা। নিবেদিতা যখন জেনোয়াতে। সেখান থেকেই জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনে একটি বিচিত্র অভিনন্দন-পত্র তিনি প্রেরণ করেছিলেন। অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন সে পত্রটি এইরূপ ছিল :

'আমার এই চিঠি যখন আপনার হাতে পেঁছিবে তখন আপনার শুভ-জন্মদিন, ৩০শে তারিখ, সমাগত হয়েছে। এই দিন সর্বথা সার্থক হোক। বর্ষে বর্ষে, ক্রম-বর্ধিত মাধুর্য ও কল্যাণ বহন করে ফিরে আসুক এই দিনটি।...

এখান থেকে, ঐ অদূরে ক্রীষ্টফার কলম্বসের বিরাট প্রস্তর মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছি। ঐ মূর্তির পায়ের কাছে শুধু এই কথাটি খোদিত—

'লা প্যাট্রি,—La Patrie...'

ঐ লেখাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছে —একদিন আসবে যেদিন আপনার নামের নীচে ঐ নিঃশব্দ বাণীটিই মুদ্রিত হবে। মনে হচ্ছে, অদৃশ্য চিন্তার পথে কলম্বসের সঙ্গে কিংবা তাঁরই মত যাঁরা দুর্জয় অভিযাত্রী, অপরের কল্যাণ-কামনায় অথৈ মহাসমুদ্রের অন্তহীন পথে যাঁরা পাড়ি জমায়, তাঁদের সঙ্গে আপনার জীবনের একটি নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েই গেছে।

জয় হোক, আপনার জয় হোক।

Be a light unto the people and a lamp unto their feet! And be filled with peace!...

আধ্যাত্মিক হে মহা-নাবিক, জ্ঞানের নূতন দেশ আপনি আবিষ্কার করেছেন—

আপনাকে অভিনন্দিত করি।'

* * *

বিখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশ সেন মহাশয়ের সঙ্গেও নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এবং সে পরিচয়ও কালক্রমে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

দীনেশচন্দ্রের অনেক গ্রন্থেই নিবেদিতার নিপুণ হস্তের স্পর্শ ছিল, বিশেষ করে তাঁর ইংরাজী ভাষায় লেখা গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে'। শোনাযায়, দীর্ঘ একবৎসর কাল ধরে ঐ গ্রন্থখানি আগাগোড়া তিনি দেখে দিয়েছিলেন। সেজন্য নিবেদিতার মনে কোন বিরক্তি ছিলনা। দীনেশবাবু বলতেন:

'কোন কাজ একবার হাতে নিলে—তা সে নিজেরই হোক আর অপরেরই হোক—নিবেদিতা সমস্ত অন্তর দিয়ে তার উদ্‌যাপনে ব্রতী হতেন। এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মপর-ভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানিনা। তিনি আমাকে নিঃস্বার্থ কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম।'

দীনেশবাবু তখন বোসপাড়া লেনেই বাস করতেন। কাজেই যখন তখন উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন অসুবিধা ছিল না।

দীনেশবাবুর রচনা-মাধুর্য নিবেদিতা বিশেষভাবে উপভোগ করতেন। বলতেন,—'দীনেশবাবু, আপনি সত্যই একজন দরদী কবি, আপনার লেখা গদ্য হলে কি হবে, আপনার ভাষা প্রকৃত কবির ভাষা। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব।'

কিন্তু দীনেশবাবুর রাজনৈতিক মত এবং অতি-মৃদু স্বভাব

নিবেদিতা সমর্থন করতেন না। সেজন্য কখনো কখনো অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই বলতেন—

'দেখুন দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের মিল নেই, সেদিক থেকে আপনার কথা যখন চিন্তা করি তখন আপনার ভীরুতা আমাকে নিদারুণ লজ্জা ও মর্মপীড়া দিয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি, আপনাকে আমার ভাল লাগে। তার কারণ, আপনি কোন আত্ম-প্রচারের চেষ্টা না করে একান্ত নিরবে দেশের জন্য পরিশ্রম করেছেন, দেশের প্রতি অকপট ভালবাসার একটি নিবিড় পরিচয় আপনার রচনার ছত্রে ছত্রে উদ্ঘাটিত করেছেন। সেজন্য, প্রকৃত দেশ-প্রমিকের যে গৌরব ও সম্মান, নিঃসংশয়ে সে সম্মান ও গৌরবের আপনি অধিকারী। আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ সেইজন্যে।'…

এ প্রসঙ্গে দীনেশবাবুর উক্তি এইরূপ ছিল ঃ

'নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করতে চাইতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক থেকেও হীনবল ইত্যাদি বলে গালাগালি দিতেন। রাজনৈতিক কোন কথা বললে ক্রোধের সঙ্গে বলতেন,—দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নয়, আমি আপনার সঙ্গে ও-বিষয়ে কথা বলব না।'

তথাপি, উভয়ের মধ্যে একটি সহোদর-সহোদরা-সুলভ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল—যা কোনদিন মলিন হয় নি।

একবার কোন এক সময় খড়দহের বিখ্যাত শ্যামসুন্দর মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। বৈষ্ণব আচার্যদের শত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত সুপ্রাচীন এ-মন্দির। গঙ্গার পূর্বকূলে এর অবস্থান।

মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। নিবেদিতা সে নাটমন্দিরে নিজের টুপিটি খুলে রেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম

করেছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্বহস্ত-লিখিত একখানি ভাগবৎ-গ্রন্থ, তাঁর ব্যবহৃত একখানা লাঠি তাঁকে দেখিয়েছিলেন। পাঁচটি টাকা দক্ষিণারূপে দিয়ে এবং আরও একবার দেবোদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে ফিরে এসেছিলেন নিবেদিতা।

দীনেশবাবুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—পদাবলী কীর্তন শোনবার জন্য।

কথিত আছে, দীনেশবাবু সেজন্য একদিন একটি বৈষ্ণব ভিখারীকে পথ থেকে ধরে এনেছিলেন নিবেদিতাকে গান শোনাবার জন্য।···

ভিখারী গায়ক গান করেছিল—

'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।'

সে গানের করুণ আবেদন আর মর্মস্পর্শী বিরহ-কাতরতা নিবেদিতার অন্তর স্পর্শ করেছিল। তিনি অশ্রুজল সম্বরণ করতে পারেন নি।

এমনিভাবে নানাসূত্রে, নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে দীনেশবাবু ও নিবেদিতা একান্ত নিকট সম্পর্কে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন। নিবেদিতার অকালমৃত্যুর পর দীনেশবাবু গভীর মর্মবেদনায় মন্তব্য করেছিলেন:

'তাঁহার ভগিনী-জনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল তাহা আর কি লিখিব। যেদিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।'

* * *

সর্বশেষ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও নিবেদিতার পরিচয়ের কথাটি বলছি।

আচার্য যদুনাথ এবং ভগিনী নিবেদিতা—উভয়েরই ঐতিহাসিক জ্ঞান-পিপাসা ছিল অতি গভীর, সত্যানুরাগ ছিল অকপট। কাজেই স্বল্প পরিচয়েই পরস্পরের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বহু তীর্থ, বহু ঐতিহাসিক পীঠস্থান এক সঙ্গে তাঁরা ভ্রমণ করেছিলেন। একই শিলাতলে বসে ধ্যান করেছিলেন বিগত অতীতের ইতিহাস নিয়ে, জন-জীবনের অস্পষ্ট পদধ্বনি শ্রবণ করবার আশা নিয়ে, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।···

উদাহরণ স্বরূপ, দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করব।···

একবার বুদ্ধগয়া তীর্থটি দর্শন করতে গমন করেছিলেন নিবেদিতা ও আচার্য যদুনাথ। তার সুন্দর বিবরণ যদুনাথেরই রচনায় লিপিবদ্ধ আছে।···

স্বামী বিবেকানন্দের সাধন-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত ছিল প্রাচীন-তীর্থ এই বুদ্ধগয়া। সেজন্য এ-স্থানটির প্রতি নিবেদিতার বিশেষ একটি আকর্ষণ ছিল এবং একাধিকবার তিনি গমন করেছিলেন সে তীর্থভূমিতে।

আচার্য যদুনাথ যে বার তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেটি নিবেদিতার দ্বিতীয়বারের বুদ্ধগয়া-দর্শন। এবার ডাকবাংলার মোহান্তের অতিথি-রূপে তাঁরা বাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, লেডি অবলা বসু, ভগ্নী ক্রিশ্চিন, মিঃ র‍্যাটক্লিফ প্রমুখ অনেকে এবার সহযাত্রী ছিলেন। যদুনাথ গিয়েছিলেন পরে।···

বুদ্ধগয়ার সে বারের দিনগুলি বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল।

দিনের অনেকটা সময় মন্দিরের চারদিকে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন, ঘুরে বেড়াতেন আশে-পাশের গ্রামগুলিতে। একদিন নিবেদিতারই প্রস্তাবানুসারে, সকলে মিলে সুজাতার জন্মস্থানটি দেখতে গিয়েছিলেন। উরুবিল্ব নামে সে গ্রামটি ইতিহাসে বিখ্যাত। একদিন, সুপ্রাচীনযুগে, পরিনির্বাণ লাভের পর বুদ্ধদেব তাঁর দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করেছিলেন

—সুজাতার শ্রদ্ধার-নিবেদন পরমান্ন গ্রহণ করে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে সে কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

তারপর কতযুগ, মন্বন্তর অতিক্রান্ত হয়েছে, কত সভ্যতার উত্থান পতন দেখেছে ভারতবর্ষ। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে সর্ব-বিধ্বংসি কাল সুজাতার গৃহটিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেছে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আজ সেখানে গেলে দেখা যাবে তৃণাচ্ছাদিত একখণ্ড ভূমি, অতীতের সাক্ষ্য বহন করে নিথর হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু একটি অনাবিল শুচিতায় সে স্থানটি যেন অসামান্য। আকাশ মনে হয় মধুময়, বায়ু মনে হয় মধুময়,…মৌনী মাটির বুকটি যেন মনে হয় এক অকথিত ভাষার স্পন্দনে স্পন্দমান।

নিবেদিতা সেই ক্ষেত্রের খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে বক্ষে ধারণ করেছিলেন। বলেছিলেন,—

'এ স্থান বড় পবিত্র, এখানকার মাটি বড় পবিত্র।'

আবার, দিবাশেষে, যখন—

> 'সন্ধ্যা নামিত মন্দ মন্থরে,
> দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকি'—

তখন, বোধিদ্রুমতলে তাঁরা সকলে ধ্যানে বসতেন। আর,

> 'ঊর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি,
> নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'—

তাঁদের ধ্যানে যেন অপ্রত্যাশিত গভীরতা ও তন্ময়তা এনে দিত। স্তব্ধ-অতীত যেন মুহূর্তে বাঙ্ময় হয়ে উঠত, মুখর হয়ে উঠত।

নিবেদিতা অনুভব করতেন,…তাঁর গুরুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্যের তাৎপর্য ও সত্যতা।

বৌদ্ধধর্ম কোনদিনই হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ছিল না। শুধু, একদা বুদ্ধের প্রভাব বহু-বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং তারই ফলে, সাময়িক-ভাবে—'The country became monastic.'

কোন কোনদিন একজন জাপানী-বৌদ্ধ, নাম ফুজি, তাঁদের কাছে এসে বসত, মৃদু কণ্ঠে গান করত বুদ্ধ-প্রণাম।...

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম চন্দ্রিমায়।
নমো নমো নন্ত গুণন্নবায়,
নমো নমো সাকিয় নন্দনায়।

'নটির পূজা'—গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এর সুরটিকে অমরত্ব দান করেছেন।

সুদূর জাপান থেকে ভগবান তথাগতের সাধন-স্থান দেখবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একদিন সে এসেছিল ভারতবর্ষে। তারপর বুদ্ধগয়ার পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করে সে কৃতার্থ হয়েছে, ধন্য হয়েছে।

এই বুদ্ধগয়ার তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী আচার্য যদুনাথের লেখনীতে এইরূপে রক্ষিত :

'সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। অল্প কিছুদূরে একখানি গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহার উপর বজ্রচিহ্ন খোদিত ছিল। কথিত আছে, এই বজ্রটি স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে দিয়েছিলেন। এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয়-চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা সকলে ইহার অর্থ জানিতে চাহিলে নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, যখন কেহ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন, তখন তিনি বজ্রের মতই শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য করেন।...নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং এই তীর্থগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন।'

বুদ্ধগয়ার তীর্থদর্শন সমাপ্ত করে যাত্রীদল গমন করেছিলেন রাজগৃহে।—বুদ্ধগয়া থেকে খুব বেশীদূরের পথ নয় রাজগৃহ।

সে প্রাচীন স্থানটি নিবেদিতাকে বিস্মিত করেছিল, মুগ্ধ করেছিল। নিজের সে মনোভাব—'রাজগীর এক প্রাচীন ব্যাবিলন'—প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

Foot-falls of Indian History—গ্রন্থেই সে প্রবন্ধটি স্থান লাভ করেছে।···

সমগ্র পৃথিবীতে এই রাজগৃহের মত অপূর্ব স্থান খুব বেশী নেই। বুদ্ধদেবের অসামান্য জীবনের সঙ্গে এ স্থানটি জড়িয়ে আছে, বহু ঘটনায়, বহু আখ্যায়িকায়। সেইকাল থেকেই এর ইতিহাসের সূচনা।···

তখন জীবন্ত ছিল ব্যাবিলন, জীবন্ত ছিল মিশর ও ফিনিশিয়া। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক স্বর্ণময় কাল বলে সে-যুগটি চিহ্নিত।

এ দেশে তখন বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর শাসনকাল। পশুবলি-প্রথা এ-দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সেই পটভূমিতে—এক প্রসন্ন প্রত্যূষকালে একটি ছাগশিশু স্কন্ধে বহন করে মহাপ্রাণ বুদ্ধ প্রবেশ করেছিলেন রাজগৃহে। তাঁর পশ্চাতে অসহায় সহস্র ছাগশিশু বলির জন্য রাজপ্রাসাদে নীত হচ্ছে।

বুদ্ধদেবের অশ্রুসজল মুখমণ্ডল করুণার স্নিগ্ধ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ছাগশিশুর জন্য নিজ অমূল্য জীবন বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি চলেছেন।···

'A veritable storm of compassion had broken loose within him on behalf of these, the helpless little brothers of humanity.'···

তাঁর কণ্ঠে স্বতঃউচ্ছ্বসিত এই শাশ্বত আবেদন,···

হে রাজন,

'করি পুত্রের কামনা

কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী ?

... ...

হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম-উপার্জন ?

... ...

কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।'

নিবেদিতা দর্শন করেছিলেন সেই প্রবেশদ্বার, যে দ্বার দিয়ে বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন অম্বপালির আম্রকানন।...

বুদ্ধগয়া, সাঁচি, রাজগৃহ, নালন্দা—বৌদ্ধযুগের সাধন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এইসব, নিবেদিতার কাছে চিরস্মরণীয় ছিল, ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে প্রতিভাত ছিল।

রাজগৃহের কথায় নিবেদিতা একস্থানে এইরূপ উল্লেখ করেছিলেন :

'Such then was Rajgir, already ancient, through which Buddha himself had passed, time and again, and where He was held by all as an honourable guest.

Across these fields and up and down these streets, now ruined, or within the cathedral-cave of Sone Bhandar, there echo to this hour the immortal reverberations of Buddha's voice.'...

এই রাজগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন-পথে, বাঁকীপুরে আচার্য যদুনাথের সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারও পরিদর্শন করেছিলেন নিবেদিতা।

সে প্রসঙ্গেও যদুনাথের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য।...

'লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ভগিনী নিবেদিতাকে সম্রাট সাজাহানের স্বাক্ষরিত একখানি পারস্যদেশীয় পাণ্ডুলিপি দেখাইলেন। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা তিনি একটিবার স্পর্শ করিতে পারেন কিনা। অনুমতি মিলিল। তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত সাজাহানের স্বাক্ষরের উপর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তালু রাখিলেন এবং দুই চক্ষু বুঁজিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, তিনি যেন দূর-অতীতকে এই নিকট-বর্তমানের সহিত তাঁহার মনের দ্বারা সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। নিবেদিতার কাছে ভারতের অতীতকালের কোনো কিছু সামান্য বলিয়া মনে হইত না। নালন্দার একটি ইষ্টকখণ্ড কি সারনাথের একটি প্রস্তরখণ্ডও তাঁহার নিকট কখনো তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত না।'...ইত্যাদি।

যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণায় নিবেদিতার উৎসাহ এবং প্রেরণা বিশেষ মূল্যবান ছিল, সেখানে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকাও ছিল। একদা যদুনাথকে বলেছিলেন নিবেদিতা—

'আপনার ঐতিহাসিক গবেষণায় বিদেশীর কোন অত্যাচার বা হস্তক্ষেপ কখনো সহ্য করবেন না। স্বাধীনভাবে সত্যের অনুশীলন করবেন, বীরের মত, লাইক এ হীরো!'

এই 'লাইক এ হিরো' কথাটিই যে তাঁর নিজ জীবনের এবং শিক্ষায়তনের মূল মন্ত্র ছিল সে-কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অবশ্য 'হিরো' শব্দটির অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে নিবেদিতার নিজস্ব একটি ভাষ্যও ছিল। নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে সে ভাষ্য ক্ষণে ক্ষণেই, নানা প্রসঙ্গে, তিনি প্রকাশ করতেন। তাঁর স্বকীয় শিক্ষাপদ্ধতির সেটিও ছিল যেন একটি বিশেষ অঙ্গ।

নিজ ছাত্রীদের তিনি কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করতেন—স্বামীজীর পূর্ব নাম। উত্তরে, কেউ বলত—নরেন্দ্রনাথ, কেউ বলত বীরেশ্বর। কিন্তু উভয় নামেই নিবেদিতা মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। বলতেন,

'হ্যাঁ, নরেন্দ্রনাথ তাঁর এক নাম। আর তিনি নরের ইন্দ্রই ছিলেন বটে।

আর বীরেশ্বর? সেও ঠিক, কারণ তিনি বীর-শ্রেষ্ঠও বটেন! জগতের বীরগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আর তোমরাও ছোট-খাট বস্তু উপেক্ষা করে তাঁর আদর্শ নিয়ে বীর হবে।'

নিবেদিতার মতে বীরের আর এক দুর্জয় আদর্শ ছিলেন কলম্বাস। দিক্‌হীন, দিশাহীন মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে তাঁর জাহাজ—সাণ্টা-মারিয়া। আহার্য ফুরিয়ে এসেছে, পানীয় ফুরিয়ে এসেছে। কোথায় নূতন দেশের সীমারেখা, কোথায় অজানিত তটভূমি? কোন চিহ্ন নেই, লক্ষণ নেই। সহযাত্রী নাবিকগণ দেশে ফিরে যেতে চায়। একান্ত অনিশ্চয়তার সঙ্কটের মধ্যে আর তারা অগ্রসর হতে রাজী নয়। বিদ্রোহের আগুন ক্ষণে ক্ষণে তাদের চোখে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কলম্বাস? কলম্বাসের লক্ষ্য স্থির, সঙ্কল্প অটুট। 'Find a way or make it'—এই মন্ত্রের সাধনায় তিনি ব্রতী, তিনি চলেছেন।…

কাজেই, নিবেদিতার দৃষ্টিতে কলম্বাস এক দুর্ধর্ষ মহাবীর। তবে, পরবর্তীকালে অসভ্য জাতির নর-নারীর উপর তিনি যে নির্মম অত্যাচার করেছিলেন সেজন্য নিবেদিতা আর তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। বলতেন,—'মহাবীর কলম্বাস পরে এক মহা-দস্যুতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন!'…

ফলকথা, 'বীর' শব্দে তিনি তাঁকেই অভিহিত করতেন যিনি দুই সবল বাহু দিয়ে শুধু যে প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে সক্ষম তাই নয়, পরন্তু শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই ঐ দু'টি বাহু দিয়েই আবার অকপট হৃদ্যতায় বক্ষে ধারণ করবার শক্তিতেও শক্তিমান।

বীরের চিন্তা নিঃস্বার্থ, অপরের জন্যেই তাঁর জীবন-ধারণ।

ছাত্রীদের বলতেন,—'রাজপুত নারীদের কথা চিন্তা কর। জাতীয় দুর্দিনে, কঠিন সংগ্রামের মুখে—তাঁরা যখন দলবদ্ধ হয়ে

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতেন, যখন ধীরে ধীরে বহ্নিশিখা তাঁদের ঘিরে ফেলত—তখন কি দাহ-যন্ত্রণায় তাঁরা কখনো ক্রন্দন করেছেন? তাঁদের ক্রন্দনধ্বনি কেউ কি কোনদিন শুনতে পেয়েছে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কিংবা কিম্বদন্তীতে এমন কোন নজীর কি কোথাও দেখা যাবে? না, যাবে না।

বরং এটাই জানা যাবে যে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আহ্বান জানিয়ে হাসিমুখে অপূর্ব বীর-গাথা গাইতে গাইতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন অগ্নিতে, যাত্রা করেছেন মরণ-আহবের পথে।···সুতরাং নিবেদিতার আবেদন এই ছিল—

'হে ভারতের দুহিতাগণ, তোমরাও সবাই এইরূপ বীর হও। ক্ষত্রিয়-রমণীগণের মত দৃপ্ত আচরণে তৎপর হও, উদ্বুদ্ধ হও। হে কন্যাগণ, ক্ষত্রিয় বীর-ব্রত তোমরা গ্রহণ কর।'

* * *

রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন ভারতের দুই মহাকাব্য, নিবেদিতার জাতীয়-শিক্ষা-পরিকল্পনায় অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান ছিল। তাঁর বিদ্যায়তনে ঐ দুই গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল বাধ্যতামূলক। তিনি নিজে রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা নিয়ে মেয়েদের কাছে কত গল্পই না করতেন! ভীষ্মের কথা বলতেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতেন, সীতা-চরিত্র আলোচনা করতেন এবং করতে করতে এককালে তন্ময় হয়ে যেতেন, সে কথা পূর্বেও বলেছি। এক একটি চরিত্র এক এক ভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করত, আর বিচিত্র বাচন-দক্ষতায় সে সব চরিত্র-মহিমা তিনি বিবৃত করতেন।

মহাভারতের গান্ধারী, কচ ও দেবযানী-সংবাদের বৃহস্পতি-পুত্র কচ—নিবেদিতার চোখে বীরত্বের চরম আদর্শরূপে প্রতিভাত হতেন। আর সেই আদর্শেই যেন নিজ বিদ্যায়তনটিকে তিনি গড়ে তুলতে চাইতেন।—

'To will of the hero is ever an impulse to

self-sacrifice. It is for the good of the people and not for my own good that I should strive to become one with the highest, the noblest, and the most truth-loving that I can conceive.'

—নিবেদিতার শিক্ষা-চিন্তার এই ছিল ধারা। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির এবং শিক্ষায়তনেরও এই ছিল লক্ষ্য এবং সাধনা।

॥ চৌদ্দ ॥

অর্ধ-পৃথিবী পরিক্রমা, হাফ্‌ওয়ে এক্রস দি ওয়ার্ল্ড।

নিবেদিতার ঘটনাবহুল জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সে অধ্যায়ের বিশদ বর্ণনা ইতিপূর্বে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু, উত্তরকালে, স্বামীজীর দেহত্যাগের পর, আরও দু'বার বিবিধ কার্যোপলক্ষ্যে নিবেদিতাকে ইউরোপে যেতে হয়েছিল, আমেরিকা যেতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে অবশ্য সময়ের বেশ কিছুটা ব্যবধানও ছিল। কিন্তু তথাপি, একই অধ্যায়ে, একই সঙ্গে পাশাপাশি রেখে, তাদের আলোচনা আমরা করছি। কারণ, অনুধ্যানের লিপি-অঙ্কনে সময়ের পারম্পর্য বিশেষ বিচার্য নয়, একমাত্র বিচার্য তো নয়ই। পরন্তু, চিন্তার যে ধারাবাহিকতা জীবন-পুষ্পটিকে স্তরে স্তরে বিকশিত করে তোলে—সেটির অনুসরণই যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। সেজন্য, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারের যাত্রার মধ্যে প্রায় চারবৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও একই সঙ্গে তাদের উল্লেখ আমরা করে নিচ্ছি।

নিবেদিতার দ্বিতীয়বারের ইউরোপ-যাত্রাকাল ছিল সন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস, আর প্রত্যাবর্তনকাল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই। আর তৃতীয়, এবং শেষবারের জন্য তাঁর যে-যাত্রা—সে ছিল জীবনের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে, সন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে, নভেম্বর মাসে। মুখ্যত, মিসেস সারা সি. বুলের অসুস্থতার সংবাদেই তাঁকে সেবার যেতে হয়েছিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবার ভারতবর্ষে ফিরেও এসেছিলেন।…

* * *

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা যখন বিদেশে যাত্রা করেন তখন

ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার, রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। অশান্ত দেশ, অশান্ত জন-জীবন। আর তারই মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করেছিলেন নিবেদিতা। বলা বাহুল্য, সেজন্য নানাদিক থেকে নানা অভিমত তখন প্রচারিতও হয়েছিল। কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন যে সে সময় নিবেদিতাকে রাজবন্দীরূপে আটক করবার গোপন-সিদ্ধান্ত করেছিল ইংরাজ-রাজসরকার এবং সে সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নে জানতে পেরে, বন্ধু-বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন।

আবার, অনেকে এ অনুমান স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে,—নিবেদিতার এ-বারের যাত্রার কথা বহুপূর্বেই স্থির ছিল। প্রায় পাঁচ মাস পূর্বেই এ-সম্বন্ধে মিস ম্যাক্‌লিয়ডকে তিনি চিঠিও লিখেছিলেন। আমাদের অবশ্য ধারণা যে শেষোক্ত অভিমতটিই সত্য, প্রথমটি নয়। কারণ, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিবেদিতার একান্ত কাম্য বস্তু হলেও, সক্রিয় কর্মী হিসাবে রাজনীতি ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ কখনও ছিল না। তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, লেখনী-সাহায্যে দেশের বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে একটি মর্যাদা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে চেষ্টা করছেন, এ সবই সত্য, কিন্তু রাজনীতির কর্মক্ষেত্রটি তাঁর যথার্থ কর্মক্ষেত্র ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লব কোন কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্যকরী হয়েছে, সন্ত্রাস-বাদ অভিপ্সীত ফল প্রসব করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নিদর্শন দুর্লভ নয়। সুতরাং, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দ্রুত-সফলতার জন্য প্রয়োজন হলে, সশস্ত্র বিপ্লবের দুর্গম পথে রাজনৈতিক কর্মীদের অগ্রসর হতে হবে,—একথাও নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাই বলে, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ

ছিল—এর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই, এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সরকারী পরোয়ানা বের হবে সংবাদ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন তারও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, নিবেদিতার সমগ্র জীবনটিই এ অনুমানের পরিপন্থী। তাঁর কোন রচনায় বা পত্রেও এর সমর্থন নেই। কাজেই, পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থানুসারেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন, বৃটিশ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ভয়ে নয়, সেটাই সত্যকথা, গ্রহণযোগ্য কথা। তবে, তার ফলে, স্বভাবতঃই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে কিছুদিনের জন্য তিনি সরে গিয়েছিলেন এবং দূরে অবস্থান করেছিলেন,—এটা সত্য।

সে যাই হোক, পূর্বোক্ত বৎসরের ১৫ই আগষ্ট, বোম্বাই বন্দর থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন নিবেদিতা। এবার তিনি একাকী। আট বৎসর পূর্বে আর একদিন যখন কলিকাতা বন্দর থেকে তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে, সেদিন স্বামীজী ছিলেন সহযাত্রী। আর সমগ্র পথটি স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত অমৃত-কথনে ছিল মুখরিত। কিন্তু আজ নিবেদিতা একক, একেবারে একক।

সুতরাং, এবারের জাহাজ-যাত্রার দিনগুলি প্রধানত ধ্যানে-চিন্তায় আর লেখার কাজের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছিল। তবে স্বামীজী স্থূল-শরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর সূক্ষ্ম-উপস্থিতি নিরন্তর অনুভব করেছিলেন নিবেদিতা। এবং সেই অনুভূতির প্রেরণাতেই 'মদীয় আচার্যদেব, যেমনটি দেখিয়াছি'—গ্রন্থের অনেকাংশ এবং অন্যান্য কতগুলি মূল্যবান প্রবন্ধের পূর্ণরচনা এই সমুদ্রযাত্রার দিনগুলিতেই তিনি সমাপ্ত করেছিলেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছেছিল এবং অনেকদিন পর নিজ জননী ও আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি স্বভাবতঃই আনন্দিত হয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধব এবং পূর্ব-

পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও বহু আনন্দময় পূর্বস্মৃতি বহন করে এনেছিল।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার রাট্‌ক্লিফ তখন লণ্ডনে ছিলেন। তাঁর বাসস্থানটিও নিবেদিতার জননীর বাসগৃহের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আবার আচার্য জগদীশচন্দ্রও পত্নীসহ লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন।

মিস ম্যাক্‌লিয়ড এবং মিস লেগেটের সঙ্গেও দেখা হল। কাজেই নানা পূর্বস্মৃতি, নানা পূর্বকথায় নিবেদিতার দিনগুলি বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হল।

অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডনের সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের নানা সমস্যা ও ভারতীয় সভ্যতার নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন নিবেদিতা, শুরু করলেন বক্তৃতা দিতে।

প্রবন্ধগুলি অনেক সময় 'নীলাস,' এই ছদ্মনাম দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তুও নানা ধরণের ছিল। তবে, সবই ভারতবর্ষকে নিয়ে। ভারতবর্ষের জীবন-দর্শন, পুরাণ, মহাকাব্য, তার ইতিহাস, তার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে।

একদিন নিজ মহান গুরুর মধ্যে অব্যাহত ভারত-চিন্তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে যেন এক জীবন্ত, ঘনীভূত ভারতবর্ষ।

আর আজ গুরুর সেই মহাদায়, চিন্তার অদৃশ্য সূক্ষ্মপথে উত্তরাধিকারসূত্রে নিবেদিতাকে আশ্রয় করেছিল। তাই, কি এদেশে, কি বিদেশে—উত্তর-বিবেকানন্দযুগে নিবেদিতার ধ্যানের বস্তু ছিল ভারতবর্ষ, রচনার বিষয় ছিল ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি, কর্মলক্ষ্য ছিল তার শিক্ষা, স্বাধীনতা ও নব-জাগরণ। সেই হেতু, ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায়ও নানাভাবে ভারতবর্ষের সেবাকার্যেই তিনি নিজকে সর্বথা নিয়োজিত রেখেছিলেন। শোনা যায়, এবারের ইউরোপ ভ্রমণের সময়ই জার্মানীতে সেণ্ট্‌ মাইকেলের সম্মুখে একটি

বাতি জ্বেলে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন নিবেদিতা। ব্যক্ত করেছিলেন এই ব্যাকুল প্রার্থনা—

ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক।
শিকল-দেবীর পূজা-বেদী ধ্বংস হোক।
নূতন উষার স্বর্ণদ্বার অবারিত হোক।...

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ, যে সংবাদ তখন মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তন করছে,—নিয়মিতভাবেই নিবেদিতার কাছে পৌঁছাত। তাঁর নিজের স্কুলের সংবাদও যেত। মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি সদ্য-প্রকাশিত পত্রিকার সংবাদও তিনি পেতেন এবং সে অনুসারেই তাঁর প্রবন্ধ রচনার কাজ, বক্তৃতার কাজ তিনি নিয়মিত করতেন।

ইংলণ্ডের দিনগুলি এমনিভাবে নানা কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছিল।

এর মধ্যে অল্প কিছুদিনের জন্য একবার পিতৃভূমি আয়র্ল্যাণ্ডেও গমন করেছিলেন।

নিজ বাল্যজীবনের সহস্র-স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে পিতৃভূমি, যেখানে স্নেহময় পিতার সঙ্গ ও সাহচর্যে মধুর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল, যার আনন্দ-বেদনার সঙ্গে, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বত্রিশ নাড়ীর সংযোগ ছিল একদিন, সেই স্বপ্ন-জড়িত, চির-আকাঙ্ক্ষিত ভূমি—আয়র্ল্যাণ্ড, আর তার টাইরন অঞ্চল,—তাঁকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।

বহুদিন পর সে পুণ্যভূমির মাটিতে পা দিয়ে স্বভাবতঃই ভারতবর্ষের কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদিতার মনে উঠেছিল। পাশাপাশি দু'টি দেশ, তাদের বর্তমানের দুর্দশা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে যেন তাঁর কল্পনার সম্মুখে এসে দাঁড়াত। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হত ভারতবর্ষের ছায়ানিবিড় গ্রামগুলির কথা। শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে হাটতে হাটতে মনে পড়ত ভারতবর্ষের ক্ষুৎ-

ক্ষাম-পীড়িত কৃষকদের কথা, সে দেশের তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কথা, কলস্বনা নদীগুলির কথা।...

এমনি পরিস্থিতিতেই একদিন একটি বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সেদিন প্রাতঃকালে একটি কৃষিক্ষেত্রের আল্‌পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নিবেদিতা। তখন চাষের মরসুম। কৃষকরা দু'জন-একজন করে মাঠে কাজ করতে নামছে। অদূরে ঋজু, দীর্ঘাঙ্গ একজন কৃষক দৃঢ়হস্তে হলকর্ষণ করছে। কৃষকটির অবয়বে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা দূর থেকেও নিবেদিতার চোখে পড়েছে, নিবেদিতা এগিয়ে গেলেন সেই কৃষকটির দিকে, জিজ্ঞাসা করলেন তার পরিচয়, তার জমির পরিমাণ, শস্য-সম্ভাবনার কথা। তারপর, দু'চারটি কথার পিঠেই দেশের স্বাধীনতার কথা উঠে পড়ল। কিন্তু 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তে সে কৃষকের দেহখানি যেন একখণ্ড ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল, হাতের মুঠো দিয়ে লাঙ্গলের হাতলটি এমন দৃঢ়ভাবে সে চেপে ধরল যে হাতের মাংসপেশীগুলি স্তরে স্তরে ফুলে উঠল। সমগ্র মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হল সঙ্কল্পের একটি অনমনীয় দৃঢ়তা। চোখের তারায় খেলে গেল অকম্পিত বহ্নিজ্বালা। মনে হল, পরাধীনতার অভিশাপ দূর করবার জন্য যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হতেই সে রাজী, যে-কোন মূল্য দিতেই সে প্রস্তুত। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

ঐ কৃষক যুবকটির কথা নিবেদিতা দীর্ঘকাল মনে রেখেছিলেন। সেদিন, সেই অদ্ভুত মুহূর্তটিতে তাঁর মনে হয়েছিল কবে, কতদিন পরে ভারতবর্ষের কৃষক, ভারতবর্ষের যুব-শক্তি ঐ 'স্বাধীনতা,' ঐ 'লিবার্টি' শব্দটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ কঠিন সঙ্কল্পে স্ফীত হয়ে দাঁড়াবে! কবে তাদের রক্তের প্রতিবিন্দুতে বহ্নিজ্বালা ধরিয়ে দেবে ঐ শব্দটির ধ্বনি-ব্যঞ্জনা? সে দিন কতদূরে?

* * *

প্রায় একমাস কাল এ-যাত্রায় আয়র্লাণ্ডে কাটিয়েছিলেন নিবেদিতা

এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধের দিকে গিয়েছিলেন আমেরিকা।... সেখানেও, অনেকদিন পর, বহু পূর্ব-পরিচিত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হল। বোষ্টনে, গ্রীন্‌একরে, নিউইয়র্কে, ওয়াসিংটনে, হার্টফোর্ডে, বল্টিমোরে এবং আরও অন্যান্য স্থানে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহও যে কিছু না হল তাও নয়।

স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক রাজনৈতিক বিপ্লবী তখন আমেরিকায় সমবেত হয়েছিলেন। নিবেদিতার পৃষ্ঠ-পোষকতা ও সাহায্য তখন তারাও লাভ করেছিলেন নানাভাবে, নানাদিক থেকে।

আমেরিকায় প্রায় তিনমাস কাল তিনি অবস্থান করেছিলেন এবার। তারপর, জননীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আবার ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। তখন জানুয়ারী মাস, শীতকাল। নিবেদিতার জননী, মেরী নোবল্, হোয়াফ´-ডেল-বালি নামক স্থানে তখন বাস করছেন। শোনাযায়, অন্তিম রোগশয্যায় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কাছে পাবার জন্য একটি তীব্র-ব্যাকুলতা তাঁর মনে জাগ্রত হয়েছিল এবং সে রুদ্ধ-ব্যাকুলতা অনেক দূরে থেকেও অনুভব করেছিলেন নিবেদিতা। জীবনে মায়ের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা হয়নি। সে ত্রুটি বেদনাদায়ক। তাই, শেষসময় সমস্ত শরীর-মন ঢেলে দিয়েই তিনি মায়ের সেবা করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষা ছিল অক্ষম সন্তানের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মা যেন মার্জনা করেন। কিন্তু মেরী আর সেরে উঠলেন না। সব চিকিৎসা ও সেবাযত্ন ব্যর্থ করে জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে মেরী নোবল শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অন্তিম-দিবসটির সকাল থেকেই অবস্থা খারাপের দিকে গেল। তারপর ধীরে ধীরে চরম মুহূর্তটি এগিয়ে এল। মৃত্যুপথ-যাত্রীর কর্ণমূলে ধীরে ধীরে নিবেদিতা উচ্চারণ করলেন মহামন্ত্র,—পর পর তিনবার,—হরি ওঁম্, হরি ওঁম্, হরি ওঁম্। খণ্ড-জীবন থেকে অনন্ত, অখণ্ড জীবনের

অজ্ঞাত পথে ঐ মন্ত্রই একমাত্র পাথেয়, একমাত্র শাশ্বত অবলম্বন। নিবেদিতার জননী নিজ সন্ন্যাসিনী-কন্যার মুখ থেকে সেই মন্ত্রটি শুনতে শুনতেই মহা-শান্তিতে চোখ বুজলেন। সুখ-দুঃখময় একটি জীবনের হাসিকান্না শেষ হয়ে গেল। নিবেদিতার পক্ষেও মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের শেষ ক্ষীণ-বন্ধন ছিন্ন হল।

তবে, এরপরও কয়েকটি দিন ভাইবোনদের সঙ্গে একত্রে তিনি যাপন করলেন। এ-জীবনে আর তাদের সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না, হয়ত ইংলণ্ডেই আর আসা হবে না। তাই, শেষবারের মত যে কয়টি দিন সম্ভব ভাইবোনদের সঙ্গেই তিনি কাটিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র, মিস্ ম্যাক্লিয়ড প্রভৃতি আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। নিবেদিতাও প্রস্তুত হলেন ভারতবর্ষে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু তার আগে জীবনের আর একটি সাধ পূর্ণ করতে হবে। সে সাধ জোয়ান-অব-আর্কের জন্মস্থান দর্শন। কতদিন পূর্বে, একদা ফরাসীর জাতীয়-জীবনের এক সংকটময় দিনে অখ্যাত, নগণ্য-পল্লী ডম্‌রেমির এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল জোয়ান। কালে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দরিদ্র পিতামাতা বিদ্যালাভের বিশেষ কোন সুযোগ তাকে দিতে পারেন নি। কিন্তু তবু সে শুনেছিল লোকমুখে, শুনেছিল জনশ্রুতিতে—মাতৃভূমি বিপন্ন, বিদেশী-আক্রমণে বিধ্বস্ত। অক্ষম রাজশক্তি, আর নিষ্ক্রিয় জনতা, উভয়েই নিরুদ্বেগ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

পল্লীবালিকার নীল ডাগর চোখ-দু'টিতে নেমে এসেছিল এক বিচিত্র স্বপ্ন, বিচিত্র কল্পনা। কে যেন তাকে ডাকছে, অনিবার্য আকর্ষণে ডাকছে। বলছে 'তুমি এস, তুমি সাধারণ নও। এই জাতিকে রক্ষা করবার ভার তোমার, দায়িত্ব তোমার।'

তোমারই মাঝারে লভিয়া জীবন,
জাগিবে সকল দেশ।...

সে ডাকে জগৎ বিস্মৃত হয়ে কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল জোয়ান।

সে এক অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত ইতিহাস। দৈবাদিষ্ট পল্লী-বালিকা সত্য সত্যই উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশকে, জাগ্রত করেছিল রাজশক্তিকে, আর মোচন করেছিল জাতীয়-সঙ্কট। কিন্তু হায়, ধর্মান্ধতার সেই বর্বর যুগে মহাপ্রাণ জোয়ান্ ধর্মেরই নামে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ডাকিনী অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে সে দণ্ডিত হয়েছিল, লেলিহান অগ্নিশিখা সেই ঋজু, শুভ্র অপাপবিদ্ধ তনুখানিকে ভস্মে পরিণত করেছিল।

পরার্থে আত্মবিসর্জনের অমন করুণ, অমন মর্মস্পর্শী নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিবেদিতার সংবেদনশীল মনে জোয়ান-অব-আর্কের জন্য একটি কোমল, শ্রদ্ধাসিক্ত নিভৃত স্থান ছিল। তাঁকে তিনি বড় ভালবাসতেন, বড় শ্রদ্ধা করতেন। নিজের রচনার বহুস্থানে জোয়ানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে সে শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। কাজেই, তাঁর পুণ্য জন্মস্থান দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই এ সময় নিবেদিতার মনে জাগ্রত হয়েছিল।...

নিবেদিতার সঙ্গে জোয়ান-অব-আর্কের অবয়বে এবং চরিত্রে কি কোন সাদৃশ্য ছিল? ত্যাগে ও তেজস্বিতায়, প্রেমে ও মাধুর্যে —উভয়ে কি সমগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন?—এ প্রশ্নটি স্বাভবতঃই মনে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে দেহে ও মনে, ত্যাগে ও পরার্থ-পরতায় উভয়ের মধ্যে যেন প্রভূত সাদৃশ্য এবং মিল ছিল।...

সে যাই হোক, ডম্‌রেমি দর্শনের অব্যবহিত পরেই মার্সেলিস বন্দর থেকে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য যাত্রা করেছিলেন নিবেদিতা।

১৬ই জুলাই তারিখে জাহাজ বোম্বাই উপকূলে পৌঁছেছিল আর ১৮ই জুলাই বোসপাড়া লেনের আপন গৃহটিতে দীর্ঘ দু'বৎসরের অনুপস্থিতির পর তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

* * *

এরপর, জীবনের একেবারে শেষ দিকে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের

দ্বিতীয়ার্ধে আর একবার তাঁকে পাশ্চাত্য দেশে যেতে হয়েছিল। তবে, এবারের যাওয়া অতি অল্পদিনের জন্য এবং তার হেতুও ছিল মিসেস ওলি বুলের কঠিন পীড়া।

নিবেদিতার নিজের শরীরও তখন খুব সুস্থ ছিল না। স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য তখন তিনি দার্জিলিং-এ। কিন্তু ঠিক সে সময়ই জরুরী তার-বার্তায় আহ্বান এসেছিল; অসুস্থ সারা সি. বুল তাঁকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন, একটিবার তাঁকে অবশ্য আসতে হবে। সুতরাং, নিজের দুর্বল শরীর নিয়েই দার্জিলিং থেকে সরাসরি তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং বোস্টনের অন্তর্গত কেম্ব্রিজে মিসেস বুলের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন নভেম্বরের ১৫ই তারিখে।

মিসেস বুলের নাম নানা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। স্বামীজীর অন্যতম নিকট-ভক্ত এই রমণী অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অচঞ্চল স্থির-বুদ্ধি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বামীজী সেজন্য তাঁর নাম রেখেছিলেন 'ধীরামাতা'। কিন্তু আজ রোগ-যন্ত্রণার অসহনীয়তার মধ্যে মিসেস বুল নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—কি দেহে, কি মনে।...

নিবেদিতাকে কাছে পেয়ে তাঁর হাতে পায়ে যেন বল এসেছিল। সাময়িকভাবে রোগেরও একটু উপশম হয়েছিল। কিন্তু সেটা একান্তই সাময়িক। রোগ সারল না এবং এক মাসের মধ্যেই মিসেস বুলের মৃত্যু হল।

এবার, এই শেষ অসুখের সময়ই মিসেস বুলের জন্য বিশেষ প্রার্থনা নিবেদন করতে একদিন গীর্জায় গিয়েছিলেন নিবেদিতা এবং প্রার্থনাকালে এক অপূর্ব অনুভূতিতে তাঁর মন-প্রাণ ভরে উঠেছিল। যীশুমাতা মেরী এবং দেবী সারদামণিকে তিনি একাত্মরূপে দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমার কাছে লেখা তাঁর ১১ই ডিসেম্বরের একটি পত্র সে

দুর্লভ দর্শনেরই অনুপম অভিব্যক্তি। পত্রটির কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সেটি এইরূপ ছিল :

চির স্নেহময়ী মা আমার!

আজ প্রাতঃকালে সারার জন্য প্রার্থনা করতে আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম। সারা খুবই অসুস্থ, মা। সেখানে আর সবাই যখন যীশুমাতা মেরীর কথা চিন্তা করছিল তখন হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে পড়ল। মনে পড়ল তোমার মুখখানি, তোমার স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু। তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন বাস্তব হয়ে, মূর্ত হয়ে আমার সম্মুখে এসেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল যে তোমার এই শুভ-আবির্ভাব বেচারা সারাকে তার রোগশয্যায় শান্তি দেবে, আশ্বাস দেবে।

আর ঐ সঙ্গে আরও একটি দিনের কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যারতির সময় তোমার সামনে বসে অতি নির্বোধের মত আমি ধ্যান করতে চেষ্টা করেছিলাম, বুঝতে পারিনি যে তোমার দেব-বাঞ্ছিত পায়েব তলাটিতে শিশুর মত বসে থাকাই যথেষ্ট। সেই যথার্থ ধ্যান।

স্নেহময়ী, প্রেমময়ী মা আমার! তোমার ভালবাসায় তো আমাদের মত উচ্ছ্বাস নেই, উগ্রতা নেই—এ জগতের সামগ্রীই তো সে নয়। লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে সকলের শিরোপরি সে আসে কল্যাণরূপে, শান্তিরূপে। সে থামে না, কিছুর অপেক্ষাও রাখে না।...

কয়েকমাস পূর্বেকার সে রবিবারটি কী দুর্লভ আশীর্বাদই না বহন করে এনেছিল আমার জীবনে। সেদিন স্নানের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান সেরেই অল্পক্ষণের জন্য ফিরে এসেছিলাম।

সেদিন তোমার ঘরখানির স্বাগত-সম্ভাষণ তোমার স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত

আশীর্বাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার সম্মুখে এক অপরূপ মুক্তি-দ্বার খুলে দিয়েছিল।

মা, তুমি বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার! তাঁর আশ্রয় এবং সান্ত্বনা তোমাতেই মূর্ত হয়ে আছে। তোমার কাছটিতে আমরা তাই নিরব হয়ে, শান্ত হয়ে বসে থাকব। আবার, মধ্যে মধ্যে নিছক কৌতুকের জন্য হয়ত একটু গোলমালও করব। কিন্তু একথা স্মরণ রাখব, সর্বদাই স্মরণ রাখব যে ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি যা-কিছু তা সবই শান্ত, সবই নিরব। আমাদের জীবনের অতি-গভীরে আমাদের অজ্ঞাতসারেই তারা প্রবেশ করে—বাতাসের মত, সূর্যালোকের মত, পুষ্পসুরভির মত, গঙ্গার স্নিগ্ধতার মত।

এই সব শান্ত, মধুময় জিনিষের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা হতে পারে।

বেচারা সারাকে তোমার আশিষ দিয়ে, শান্তির আঁচলটি দিয়ে আবৃত করে রেখো মা!…

ঊর্দ্ধলোকে যে শান্তি বিরাজ করে, যেথায় ভালবাসাও নেই, ঘৃণাও নেই—তোমার চিন্তা তো মধ্যে মধ্যে সেখানে পৌঁছায়, তোমার সে চিন্তা কি শিশিরবিন্দুর মত ভগবানে-স্পন্দন-রত স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, যা জগতের ছোঁয়া লেগে কখনো মলিন হয় না?

মা আমার—

আমি তোমার সেই চিরদিনের বোকা খুকু,

নিবেদিতা।

কিন্তু এ সত্ত্বেও অবধারিত মৃত্যু তার কৃষ্ণছায়া বিস্তার করে দিল। চলে গেলেন ওলিবুল।

নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে মিসেস বুলের সুন্দর জীবনটির অসংখ্য স্মৃতি জড়িত ছিল। বেলুড়ে গঙ্গা-তীরে, উত্তর-ভারতে, হিমালয়ের বুকে নানা তীর্থে—স্বামীজীর অপার্থিব সহচর্যের সেই সুখ-স্মৃতি-

ভরা দিনগুলি একই সঙ্গে তাঁরা যাপন করেছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের কঠিন সংকটের কালে—নৈনীতালে, আলমোড়ায়—এই 'ধীরামাতা' মায়েরই মত স্নেহে ও সহানুভূতিতে নিবেদিতাকে কত উৎসাহ দিতেন, কত আশার কথা শোনাতেন, নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেন অকৃত্রিম স্নেহে ও প্রীতিতে।

এরও পরে, ব্রিটানীতে, হাডসন নদীর তীরে এই ওলিবুলেরই গৃহে ধ্যান-তপস্যার সে কী মধুময় দিন ছিল! আজ সে সবই চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল, অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়ে গেল।

স্বভাবতঃই নিবেদিতার মনে তখন একটি গভীর অবসাদ যেন দুর্বহ বোঝার মত ভারী হয়ে নেমে এসেছিল। প্রচ্ছন্ন একটি মৃত্যু-চিন্তা যেন তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছিল।

এরই মধ্যে, ভারতবর্ষ থেকেও দুঃসংবাদ গেল, স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী-সন্তান, নিবেদিতার পরম শুভানুধ্যায়ী গুরুভ্রাতা, স্বামী সদানন্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেহত্যাগ করেছেন।...

অপরদিকে, মিসেস বুলের মৃত্যুর পর তাঁর উইল নিয়েও নিবেদিতার পক্ষে নানা অশান্তির কারণ হল।

মিসেস বুলের জীবিতকালে 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ের' অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি সানন্দে বহন করতেন, সে দিকটা বহুলাংশে তাঁরই দায়িত্বের বিষয় ছিল। কাজেই, তাঁর উইলেও 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ে'র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকবে—এটাই ছিল নিবেদিতার স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু মিসেস বুলের কন্যার বিরোধিতার জন্য সমস্ত ব্যাপারটিই নিবেদিতার পক্ষে গভীর হতাশা ও উদ্বেগের হেতু হয়ে উঠল। তবে, দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে নিবেদিতার সেই কিছু নূতন পরিচয় ছিল না, জীবন-সংগ্রাম কোনদিনই সহজ রূপ নিয়ে তার সম্মুখে আসেনি। তাই, ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত করলেন।

ভারতের পথে একবার ইংলণ্ডেও পদার্পণ করলেন। জন্মভূমির

সঙ্গে জীবনের সেই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। আর জীবনে সেখানে যাওয়া হবে না। মহাকাল প্রতীক্ষা করছে অলক্ষ্যে। পুরাতন পরিচিত বন্ধু কারো কারো সঙ্গে এবারও দেখা হল এবং সেও শেষবারেরই মত।

মিঃ র‍্যাটক্লিফ, অধ্যাপক চেইন, নেভিনসন প্রমুখ সকলেই তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁরা সবাই আন্তরিক খুশী হলেন নিবেদিতাকে পেয়ে। সবাই তাঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে চান নিজেদের মধ্যে। উচ্চ জীবন-পথের এক মহানীয়া সহযাত্রী, সর্বাংশে না হলেও, বহুলাংশে আদর্শ এক, লক্ষ্য এক—এ জগতে এমন সম্পদ সুলভ নয়। সুতরাং, পরস্পরের সান্নিধ্য বিশেষ আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল বৈকি!···

ইংলণ্ডে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করেই, এবারও প্যারিস হয়ে, মার্সেলিস বন্দর হয়ে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করলেন নিবেদিতা। প্যারিসে দেখা হল মিস ম্যাক্লিয়ডের সঙ্গে। তিনি অপেক্ষা করছিলেন নিবেদিতার জন্য।

ম্যাক্লিয়ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিবেদিতাকে যেন অনেকটা সান্ত্বনা দিল, আশা দিল।

সিদ্ধ-সঙ্কল্প মহাপুরুষের নির্দেশে জন-কল্যাণের পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ। জীবনের বহু কিছু ত্যাগ করেছ—তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। সিদ্ধি তোমার করায়ত্ত হবে, অকল্যাণ কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না।···সেটা বিধির বিধানই নয়।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।···

ম্যাক্লিয়ডের মুখের এ-সব উৎসাহবাক্য নিবেদিতার বেদনা-বিদ্ধ চিত্তে প্রভূত সান্ত্বনা এনে দিয়েছিল।

এরপরই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

মার্চমাসের শেষ সপ্তাহে জাহাজ মার্সেলিস বন্দর ত্যাগ করেছিল।

বিদায় ইউরোপ! বিদায় প্রিয় মাতৃভূমি! চির বিদায়! আর

দুর্লভ দর্শনেরই অনুপম অভিব্যক্তি। পত্রটির কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সেটি এইরূপ ছিল :

চির স্নেহময়ী মা আমার !

আজ প্রাতঃকালে সারার জন্য প্রার্থনা করতে আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম। সারা খুবই অসুস্থ, মা। সেখানে আর সবাই যখন যীশুমাতা মেরীর কথা চিন্তা করছিল তখন হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে পড়ল। মনে পড়ল তোমার মুখখানি, তোমার স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু। তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন বাস্তব হয়ে, মূর্ত হয়ে আমার সম্মুখে এসেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল যে তোমার এই শুভ-আবির্ভাব বেচারা সারাকে তার রোগশয্যায় শান্তি দেবে, আশ্বাস দেবে।

আর ঐ সঙ্গে আরও একটি দিনের কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যারতির সময় তোমার সামনে বসে অতি নির্বোধের মত আমি ধ্যান করতে চেষ্টা করেছিলাম, বুঝতে পারিনি যে তোমার দেব-বাঞ্ছিত পায়ের তলাটিতে শিশুর মত বসে থাকাই যথেষ্ট। সেই যথার্থ ধ্যান।

স্নেহময়ী, প্রেমময়ী মা আমার ! তোমার ভালবাসায় তো আমাদের মত উচ্ছ্বাস নেই, উগ্রতা নেই—এ জগতের সামগ্রীই তো সে নয়। লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে সকলের শিরোপরি সে আসে কল্যাণরূপে, শান্তিরূপে। সে থামে না, কিছুর অপেক্ষাও রাখে না।···

কয়েকমাস পূর্বেকার সে রবিবারটি কী দুর্লভ আশীর্বাদই না বহন করে এনেছিল আমার জীবনে। সেদিন স্নানের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান সেরেই অল্পক্ষণের জন্য ফিরে এসেছিলাম।

সেদিন তোমার ঘরখানির স্বাগত-সম্ভাষণ তোমার স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত

আশীর্বাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার সম্মুখে এক অপরূপ মুক্তি-দ্বার খুলে দিয়েছিল।

মা, তুমি বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার। তাঁর আশ্রয় এবং সান্ত্বনা তোমাতেই মূর্ত হয়ে আছে। তোমার কাছটিতে আমরা তাই নিরব হয়ে, শান্ত হয়ে বসে থাকব। আবার, মধ্যে মধ্যে নিছক কৌতুকের জন্য হয়ত একটু গোলমালও করব। কিন্তু একথা স্মরণ রাখব, সর্বদাই স্মরণ রাখব যে ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি যা-কিছু তা সবই শান্ত, সবই নিরব। আমাদের জীবনের অতি-গভীরে আমাদের অজ্ঞাতসারেই তারা প্রবেশ করে—বাতাসের মত, সূর্যালোকের মত, পুষ্পসুরভির মত, গঙ্গার স্নিগ্ধতার মত।

এই সব শান্ত, মধুময় জিনিষের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা হতে পারে।

বেচারা সারাকে তোমার আশিষ দিয়ে, শান্তির আঁচলটি দিয়ে আবৃত করে রেখো মা!···

ঊর্দ্ধলোকে যে শান্তি বিরাজ করে, যেথায় ভালবাসাও নেই, ঘৃণাও নেই—তোমার চিন্তা তো মধ্যে মধ্যে সেখানে পৌঁছায়, তোমার সে চিন্তা কি শিশিরবিন্দুর মত ভগবানে-স্পন্দন-রত স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, যা জগতের ছোঁয়া লেগে কখনো মলিন হয় না?

মা আমার—

আমি তোমার সেই চিরদিনের বোকা খুকু,

নিবেদিতা।

কিন্তু এ সত্ত্বেও অবধারিত মৃত্যু তার কৃষ্ণছায়া বিস্তার করে দিল। চলে গেলেন ওলিবুল।

নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে মিসেস বুলের সুন্দর জীবনটির অসংখ্য স্মৃতি জড়িত ছিল। বেলুড়ে গঙ্গা তীরে, উত্তর-ভারতে, হিমালয়ের বুকে নানা তীর্থে—স্বামীজীর অপার্থিব সহচর্যের সেই সুখ-স্মৃতি-

ভরা দিনগুলি একই সঙ্গে তাঁরা যাপন করেছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের কঠিন সংকটের কালে—নৈনীতালে, আলমোড়ায়—এই 'ধীরামাতা' মায়েরই মত স্নেহে ও সহানুভূতিতে নিবেদিতাকে কত উৎসাহ দিতেন, কত আশার কথা শোনাতেন, নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেন অকৃত্রিম স্নেহে ও প্রীতিতে।

এরও পরে, ব্রিটানীতে, হাড্‌সন নদীর তীরে এই ওলিবুলেরই গৃহে ধ্যান-তপস্যার সে কী মধুময় দিন ছিল! আজ সে সবই চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল, অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়ে গেল।

স্বভাবতঃই নিবেদিতার মনে তখন একটি গভীর অবসাদ যেন দুর্বহ বোঝার মত ভারী হয়ে নেমে এসেছিল। প্রচ্ছন্ন একটি মৃত্যু-চিন্তা যেন তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছিল।

এরই মধ্যে, ভারতবর্ষ থেকেও দুঃসংবাদ গেল, স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী-সন্তান, নিবেদিতার পরম শুভানুধ্যায়ী গুরুভ্রাতা, স্বামী সদানন্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেহত্যাগ করেছেন।...

অপরদিকে, মিসেস বুলের মৃত্যুর পর তাঁর উইল নিয়েও নিবেদিতার পক্ষে নানা অশান্তির কারণ হল।

মিসেস বুলের জীবিতকালে 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ের' অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি সানন্দে বহন করতেন, সে দিকটা বহুলাংশে তাঁরই দায়িত্বের বিষয় ছিল। কাজেই, তাঁর উইলেও 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ে'র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকবে—এটাই ছিল নিবেদিতার স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু মিসেস বুলের কন্যার বিরোধিতার জন্য সমস্ত ব্যাপারটিই নিবেদিতার পক্ষে গভীর হতাশা ও উদ্বেগের হেতু হয়ে উঠল। তবে, দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে নিবেদিতার সেই কিছু নূতন পরিচয় ছিল না, জীবন-সংগ্রাম কোনদিনই সহজ রূপ নিয়ে তার সম্মুখে আসেনি। তাই, ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত করলেন।

ভারতের পথে একবার ইংলণ্ডেও পদার্পণ করলেন। জন্মভূমির

সঙ্গে জীবনের সেই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। আর জীবনে সেখানে যাওয়া হবে না। মহাকাল প্রতীক্ষা করছে অলক্ষ্যে। পুরাতন পরিচিত বন্ধু কারো কারো সঙ্গে এবারও দেখা হল এবং সেও শেষবারেরই মত।

মিঃ র‍্যাটক্লিফ, অধ্যাপক চেইন, নেভিনসন প্রমুখ সকলেই তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁরা সবাই আন্তরিক খুশী হলেন নিবেদিতাকে পেয়ে। সবাই তাঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে চান নিজেদের মধ্যে। উচ্চ জীবন পথের এক মহানীয়া সহযাত্রী, সর্বাংশে না হলেও, বহুলাংশে আদর্শ এক, লক্ষ্য এক—এ জগতে এমন সম্পদ সুলভ নয়। সুতরাং, পরস্পরের সান্নিধ্য বিশেষ আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল বৈকি!···

ইংলণ্ডে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করেই, এবারও প্যারিস হয়ে, মার্সেলিস বন্দর হয়ে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করলেন নিবেদিতা। প্যারিসে দেখা হল মিস ম্যাক্‌লিয়ডের সঙ্গে। তিনি অপেক্ষা করছিলেন নিবেদিতার জন্য।

ম্যাক্‌লিয়ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিবেদিতাকে যেন অনেকটা সান্ত্বনা দিল, আশা দিল।

সিদ্ধ-সঙ্কল্প মহাপুরুষের নির্দেশে জন-কল্যাণের পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ। জীবনের বহু কিছু ত্যাগ করেছ—তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। সিদ্ধি তোমার করায়ত্ত হবে, অকল্যাণ কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না।···সেটা বিধির বিধানই নয়।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।···

ম্যাক্‌লিয়ডের মুখের এ-সব উৎসাহবাক্য নিবেদিতার বেদনা-বিদ্ধ চিত্তে প্রভূত সান্ত্বনা এনে দিয়েছিল।

এরপরই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

মার্চমাসের শেষ সপ্তাহে জাহাজ মার্সেলিস বন্দর ত্যাগ করেছিল।

বিদায় ইউরোপ! বিদায় প্রিয় মাতৃভূমি! চির বিদায়! আর

দেখা হবে না এ-জীবনে। অনন্ত মহাজীবনের আসছে আহ্বান।

'যাত্রা কর যাত্রীদল—
এসেছে আদেশ
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত
হল শেষ।'

(৭)।*।*।(৭)

'The great places of pilgrimage, Kedarnath and Badrinarayan, in the Himalayas, are to be regarded as the Cathedral Cities of adjacent dioceses.'

*   *   *

জীবনের প্রান্তে এসে, পরমায়ুর প্রায় গোধূলিলগ্নে এই দু'টি পুণ্যতীর্থ দর্শন করবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিবেদিতার মনে জাগ্রত হয়েছিল।

কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ—ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের দুই দুর্গম হিমালয়-তীর্থ। স্মরণাতীতকাল থেকে ঐ দুই তীর্থ-ভূমি ভারতবর্ষের জন-জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কত ঘটনার পর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এদেশের বুকে, কত বিচিত্র জীবন-ধারার উত্থান-পতনে রচিত হয়েছে বর্ণবহুল বিচিত্র ইতিহাস। কিন্তু কেদার-বদ্রীর মহিমা তাতে কিছুমাত্র মলিন হয় নি, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। পরন্তু ভারতের সকল বিপরীত প্রান্তকে অনিবার্য শক্তিতে আপন কক্ষে আকর্ষণ করে এ জাতির আধ্যাত্মিক একাত্মকেই সে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিবেদিতার ভাষায়:

'The northern Tirtha forms a great palimpsest of the history of Hinduism. Record has here been written upon record. Wave has succeeded wave. And still the bond that knits these farthest points north to the farthest south is living and unbroken, and the people stream along the pilgrim road in

worship to testify to the fact that without the conception of India as a whole we can explain no single art or item of the Indian life.'—

সুতরাং সে মহিমময় তীর্থ ছু'টি একবার দর্শন করতে হবে।…

একদিন ভারতীয-জীবনেব প্রস্তুতিপর্বে, গুরুদেবেব সহযাত্রীরূপে তুষার-তীর্থ অমরনাথ দর্শন করেছিলেন নিবেদিতা, দর্শন করেছিলেন ক্ষীরভবানীর গুহামন্দির, ভূস্বর্গ কাশ্মীর, নৈনীতাল আর আলমোড়া। সে আজ কত বৎসরের কথা। জীবনেব মধুর ও স্বপ্নময় দিন ছিল সেগুলি। তখন জ্ঞান ও কর্মের পিপাসা ছিল অদম্য। দৃষ্টি ছিল দূর ভবিষ্যতেব দিকে নিবদ্ধ।

তারপর কত দীর্ঘদিন কেটে গেল, মহাকালের মহা-আবর্তনে কত অভাবিত পরিবর্তন এল জীবনে, কত কালান্তব ঘটে গেল কর্মের বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে।

এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নেমে এল মৃত্যুব কৃষ্ণ-যবনিকা। দেহত্যাগ করলেন স্বামীজী, পরলোকে গমন করলেন ধীরামাতা, স্বামী সদানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রমুখ গুরু-ভ্রাতাগণ।

নিবেদিতার নিজের কর্মক্লান্ত দেহটিও এখন চাইছে বিশ্রাম, পরিপূর্ণ বিশ্রাম। মনের অবচেতন প্রদেশে মধ্যে মধ্যেই শব্দিত হচ্ছে ধ্বনি—

হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।…

ভালোমন্দ মিশিয়ে অনেক কিছু করা হয়েছে জীবনে, এখন গৃহ-গত-প্রাণ চাহে অবকাশ, চাহে পরিতৃপ্ত শেষ-দর্শন, যে-দর্শন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতে গিয়ে সার্থক হয়, পূর্ণ হয়।

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্
বী হদং জ্যোতির্হৃদয় অহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ
কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিমু নু মনিষ্যে।…

বস্তুত, এমনি একটি মনোভাবের মধ্যেই কেদারনাথ আর বদ্রীনারায়ণের পুরাণ-প্রোক্ত মহাতীর্থের কথা নূতন করে নিবেদিতার মনে উঠেছিল এবং তারই ফলে সন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, জুন মাসে কেদার-বদ্রী দর্শনে তিনি যাত্রা করেছিলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র আর তৎপত্নী অবলা বসুর সহযাত্রীরূপে। প্রাচীন ভারতবর্ষের তীর্থমহিমা এবং পুরাণ-কথার শত বিচিত্র মাধুর্যও সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করে তাঁর কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।...

কলিকাতা থেকে যাত্রা করে—হরিদ্বার, হৃষিকেশ হয়ে লছমন-ঝোলার উপর দিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে, স্বর্গাশ্রম পেছনে ফেলে যাত্রীদল পা বাড়িয়েছিল কেদার-বদ্রীর পথে, 'On the way to Kedar-Badari.'

অবশ্য তারপূর্বে, হরিদ্বার ও কনখলের বিখ্যাত স্থানগুলি দর্শন করবার জন্য, আর 'ব্রহ্মকুণ্ডে' স্নান করবার জন্য কয়েকটি দিন তাঁরা কনখল 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে' যাপন করেছিলেন। হরিদ্বার এবং কনখলের তীর্থমাহাত্ম্যের আকর্ষণও কম ছিল না। সে মাহাত্ম্যের সংবাদ রাখতেন নিবেদিতা।

হরিদ্বারে কুশাবর্তে নীল্লকে বিল্বপর্বতে
কনখলে তু কৃতে স্নানে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

এই হল প্রসিদ্ধি। কেদারখণ্ডের এ-নির্দেশ নিবেদিতা জানতেন, বিশ্বাসও করতেন।

তাঁর মনে হয়েছিল—কত পুরাণ-কথার সঙ্গে জড়িত রয়েছে হরিদ্বার, জড়িত রয়েছে কনখল আর ব্রহ্মকুণ্ড। গঙ্গাদ্বার, মায়াপুরী, হরকী-পৈড়ী—প্রভৃতি কত বিচিত্র নামেই তার পরিচয়।

একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থানরূপেও হরিদ্বারের প্রসিদ্ধি কম নয়। হরিদ্বারের একাংশেই ব্রহ্মকুণ্ড। কেদার-বদ্রী যাত্রার পূর্বে

তীর্থযাত্রী মাত্রেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে। ব্রহ্মকুণ্ডই হরিদ্বারের মুখ্য তীর্থ। নিবেদিতাও স্নান করেছিলেন।…

একদা প্রাচীনযুগে, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন কালে, ইলাবৃত্ত-খণ্ডের রাজা মহামতি শ্বেত তপস্যায় রত ছিলেন—এই ভূখণ্ডে। যথাকালে তপস্যা-তুষ্ট ব্রহ্মা রাজাকে দর্শন দান করে বলেছিলেন, —'কহ রাজা, কি তব প্রার্থনা।'

রাজা বলেছিলেন,—'এ ভূ-খণ্ড সর্ব তীর্থময় হবে, নিত্য সুরভিত থাকবে দেব-আবির্ভাবে। আর সর্বকালের জন্য এ স্থান তোমারই নামে খ্যাত হবে।—এই মম রহিল প্রার্থনা।'…

পিতামহ ব্রহ্মা রাজার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। তাই হরিদ্বারের ঐ সুবৃহৎ জলাধার ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এর পূর্বদিকেই নীল পর্বত। নীল পর্বতের শিখরদেশে চণ্ডী-দেবীর বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির। লোক-প্রবাদ এই যে এখানেই নাকি একদা ভগবতী চণ্ডী স্বয়ং কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই 'চণ্ডীর পাহাড়' বলেও এর পরিচয় আছে।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের পর এই চণ্ডীর পাহাড় দর্শন করেছিলেন নিবেদিতা। তারপর কনখল, সতী-তীর্থ কনখল। নিবেদিতার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত তীর্থভূমি।

সুপ্রাচীন যুগে প্রজাপতি দক্ষের রাজপুরী এই কনখলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিবহীন দক্ষযজ্ঞের কালে পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে, এই কনখলের কোলেই দেহত্যাগ করেছিলেন সতী। আর সেদিন থেকেই কনখলের বিচিত্র তীর্থমহিমা।

কিম্বদন্তি এই যে,—

একদা ব্রাহ্মণ কত,
দক্ষের পুরীতে রত
শাস্ত্র-গ্রন্থ পঠন-পাঠনে।

এমন সময়ে ছল,
ধর্মকেতু নামে খল—
এল সেথা চৌর্যের কারণে।

চৌর্যবৃত্তিই তার উপজীবিকা, সেই তার ব্যবসা। কিন্তু আজ সংগোপনে বসে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রালোচনা শুনতে শুনতে ধর্মকেতুর মনে সহসা চৈতন্যোদয় হয়েছিল, পূর্বকৃত পাপকার্যের জন্য তীব্র অনুশোচনা জেগেছিল। তখন,

ব্রাহ্মণগণের কাছে
ধর্মকেতু ক্ষমা যাচে,
করজোরে করে নিবেদন।
আমি ঘোর হীনমতি,
পাপকার্যে সদারতি
ঘৃণ্য অতি আমার জীবন।...

হে সদাশয় বিপ্রগণ, আমাকে রক্ষা কর। দুঃসহ পাপ-যন্ত্রণা থেকে নিস্তার লাভের পথ বলে দাও।

বিপ্রগণ সে অকপট আবেদনে দয়ার্দ্র হয়ে তাকে পাপ-স্খালনের পথ দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন:

স্নান করে দক্ষঘাটে,
শিব-গুরু মহাপাটে
কর শুচি শিবের অর্চনা।
সর্ব পাপ দূরে যাবে,
মহাশান্তি ফিরে পাবে,
'খল' তুমি আর রহিবে না।

বস্তুত তাই হয়েছিল। তস্কর ধর্মকেতু সজ্জন ধর্মকেতুতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

দক্ষক্ষেত্রের এমনি অপার মহিমা, দক্ষঘাটে স্নান করবার এমনি

অব্যর্থ, অমোঘ দল। এ ঘাটে একটিবার অবগাহন করে—'কো ন খল স্তরতি'-এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ব্রাহ্মণগণ। আর তা থেকেই 'কনখল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল।

দক্ষেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরেই সেই পুরাণ-প্রথিত সতীকুণ্ড। এখান থেকেই মৃত সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে বিরহ-কাতর ভোলানাথ ত্রিভুবন ভ্রমণ করেছিলেন—'সতী-দে' 'সতী-দে' এই আর্তরব উচ্চারণ করতে করতে। পুরাণ-কথায় এও উল্লিখিত আছে যে সে সময় তাঁকে শোকমুক্ত করবার জন্য চক্রধারী নারায়ণ শণির সঙ্গে সতীদেহে প্রবেশ করে তাকে ধীরে ধীরে একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত করে নিক্ষেপ করেছিলেন ভারত-ভূখণ্ডের নানাস্থানে, নানাদিকে। একান্নটি পীঠস্থানের জন্মও ঐ ভাবেই সাধিত হয়েছিল। কাজেই, সতী-মহিমা চির-জাগ্রত, সতী মহিমা সর্ব-কালজয়ী।…

আজও সেখানে, ভাদ্রমাসের শুক্লা-দশমীতে, হাজার হাজার ভক্তিমতী নারী স্নান করবার জন্য শতযোজন পথ অতিক্রম করে সমবেত হয়ে থাকে। তাদের প্রাণের ভক্তি-উচ্ছ্বাসে নিত্য নববেদ রচিত হয়, অক্ষয় উপকথার জন্ম হয়ে থাকে।

'দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কে চিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকবিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষবিদস্তবানঘম্।'

সতীর মুখের এই ধিক্কার আজও তাই হিন্দুরমণীর কাছে পাতিব্রত্যের শাশ্বত মহিমা বহন করে আনে। সতীতীর্থ কনখল—সেই হেতু নিবেদিতাকে বড় অভিভূত করেছিল। তাঁর চক্ষে হিন্দুধর্মের 'Cradle Tales'-র উদ্ভব-ক্ষেত্র এইসব ঐতিহাসিক তীর্থভূমি গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত।

'A map of a country is only a script produced by all the ages of its making'

—এই তাঁর স্বকীয় অভিমত ছিল।…

কনখল থেকে তাঁরা প্রাচীন তপোক্ষেত্র হৃষিকেশে পৌঁছেছিলেন, মে মাসের ৭ই তারিখে। কেদার-বদ্রীর ঠিক প্রবেশমুখেই এই মনোরম হিমালয়-তীর্থটির অবস্থান। চতুর্দিকে স্তর-বিন্যস্ত, আকাশ-ছোঁয়া হিমালয়ের মৌনগাম্ভীর্য, আর নিম্নে কলস্বনা, খরস্রোতা ভাগীরথী। অসংখ্য উপলখণ্ডে তার তলদেশ আকীর্ণ। কাঁচের মত স্বচ্ছ গঙ্গাবারি আপন প্রবাহস্রোতে সে সব উপলখণ্ডে নিয়ত ঝঙ্কৃত করে থাকে গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র—

আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনী, নমোঽস্তুতে।

পুরা-কাহিনীতে হৃষিকেশ 'কুব্জাম্রক ক্ষেত্র' রূপে প্রসিদ্ধ।

সেখানে কথিত আছে—রৈভ্যনামে এক ঋষি এই গঙ্গাদ্বারে বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সে তপস্যা অতুলনীয় ছিল এবং তারই ফলে একদিন নারায়ণের দিব্য-দর্শন লাভে সে কৃতার্থ হয়েছিল। কিন্তু এক আম্রবৃক্ষের শাখা থেকে বিচিত্র কুব্জের বেশে তাঁর প্রকাশ হয়েছিল সেদিন, এবং ভক্ত-রৈভ্যকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেনঃ

'রৈভ্য, তোমার তপস্যায় আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

রৈভ্য প্রার্থনা করেছিলেন শুধু ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, আর বিশ্বাস। তবে, সেই সঙ্গে ঐ তপোক্ষেত্রটির জন্য অন্য একটি প্রার্থনাও নিবেদন করেছিলেন।

বলেছিলেন, নারায়ণ যেন নিত্য সূক্ষ্মদেহে বিরাজ করেন হৃষিকেশে। যতদিন সাগরাম্বরা পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, যাবচ্চন্দ্রার্ক মেদিনী, ততদিন এখানে যেন তাঁর পুণ্য আবির্ভাব অব্যাহত থাকে।

রৈভ্যের সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। নারায়ণের এক চতুর্থাংশ

হৃষিকেশ-রূপে ঐ ক্ষেত্রে নিত্য বর্তমান থাকবে এবং 'হৃষিকেশ' নামেই তার পরিচয় হবে—এ আশ্বাস দিয়েছিলেন নারায়ণ।

আবার, আম্রবৃক্ষে কুব্জরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বলে হৃষিকেশের অপর নাম হয়েছিল 'কুব্জাম্রকক্ষেত্র।'

কতযুগ, মন্বন্তর পূর্বেকার এ সব মনোরম কাহিনী নিবেদিতার কাছে মনে হয়েছিল যেন নূতন, যেন এখনো বাঙ্ময়। গঙ্গার অবিশ্রাম পতন-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তারাও যেন আকাশে-বাতাসে নিত্য শব্দিত হচ্ছে।...

এই হৃষিকেশের এক প্রান্ত থেকে, লছমন ঝোলার পরেই, কেদার-বদ্রীর পায়ে-চলার দুরারোহ পাক্-দণ্ডী পথ, বিশাল পর্বতমালার অন্তহীন অরণ্যানীতে লুক্কায়িত। কঠিন কেদার, কঠিন বদ্রীনারায়ণ—একথা বাস্তব সত্যই বটে!

দশ-এগার দিন, অধিকাংশ সময় পায়ে হেটে, ক্বচিৎ কখনো ডাণ্ডীতে আরোহণ করে নিবেদিতা এবং তাঁর সহযাত্রীগণ পৌঁছেছিলেন কেদারনাথের মন্দিরে।...

আজ দীর্ঘ কালান্তরে কল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত করে হিমালয়ের সেই দুর্গম চড়াই-উৎরাই পথে এক দীর্ঘাঙ্গী শুভ্র-বসনা সন্ন্যাসিনীকে যেন আমরা দেখতে পাই। বার-হাজার ফুট উঁচু পর্বতচূড়ায় কেদার-নাথের মন্দির লক্ষ্য করে দৃঢ় পাদ-বিক্ষেপে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। অন্তরে শিব-ধ্যান, মুখে অস্ফুট শিব-নাম, চতুর্দিকে আরণ্য-প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের মৌন-মহিমা।

কত নাম-না-জানা ফুল, কত বৃক্ষলতা, কত বন্য পাখির বিচিত্র কলস্বর। কত কীট পতঙ্গের একটানা ঝিল্লিধ্বনি, নিবেদিতার কাছে সবই অপূর্ব, সবই স্নিগ্ধ শুচিতায় ভরা।

পথে পড়ছে পঞ্চ-প্রয়াগ। দেব-প্রয়াগ, রুদ্র-প্রয়াগ, কর্ণ-প্রয়াগ, নন্দ-প্রয়াগ আর বিষ্ণু-প্রয়াগ। আরও এগিয়ে মন্দাকিনী-অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। মন্দাকিনীর পার্শ্বদিয়ে এগিয়ে চলেছে দূর-বিসর্পিত

কেদারনাথের পথ। আর অলকানন্দার ধারে ধারে এগিয়েছে বদ্রীনারায়ণের পথ। 'নালা'-চটি থেকেই তারা বিভক্ত হয়ে গেছে।

কঠিন চড়াইয়ের পথে আরও অগ্রসর হয়ে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে শাকম্ভরীর মন্দির দর্শন করেছিলেন নিবেদিতা।

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গামাখ্যং মহাসুরম্।...

এই দেবী চামুণ্ডার স্বকীয় উক্তি।

মহাপ্রস্থানের পথে, স্বর্গারোহণ-পর্বে, এই শাকম্ভরী দেবীকেই ছিন্নবস্ত্রে পূজা করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব। মহাকাব্যের যুগের বহুকাল-বিগত সে সব দিন। নিবেদিতার ধ্যানে তারাও যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর মনে পড়েছিল সেই পুণ্য আখ্যায়িকা:

কুরুক্ষেত্রের মহা-আহবে অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। নির্বংশ হয়েছে কুরুকুল। আত্মগ্লানিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে পঞ্চপাণ্ডব বিশ্বনাথের দর্শন মানসে গিয়েছিলেন কাশীধাম। কিন্তু বৃথা আকিঞ্চন, বৃথা পরিশ্রম। বিশ্বনাথ দর্শন দেননি। অদৃশ্য হয়ে তিনি প্রস্থান করেছিলেন হিমালয়ে। পঞ্চপাণ্ডবও অনুসরণ করলেন। কিন্তু সেখানেও মহিষরূপ ধারণ করে পাণ্ডবদের তিনি বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, শৃঙ্গের আঘাতে মেদিনী বিদীর্ণ করে অদৃশ্য হতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধ্যানযোগে সকল তথ্য অবগত হয়ে ঠিক শেষ মুহূর্তটিতে তাঁকে বাধা দিলেন। মহিষের পশ্চাদ্ভাগে গদার আঘাত করে তাকে অচল করেছিলেন মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন। আর তাতেই স্থিত হয়েছিলেন বিশ্বনাথ। মহিষের পশ্চাদ্ভাগ কিন্তু গদাঘাতে ত্রিকোণাকৃতি প্রস্তরখণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অচিরে তুষারাচ্ছাদনে রজতশুভ্র বিচিত্র শিবলিঙ্গের অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছিল। এদিকে পাণ্ডবদের তপস্যাও ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠেছিল। ফলে পরমলগ্নে দর্শনও দিয়েছিলেন মহাদেব।

তারপরই ঊর্দ্ধলোকে অনন্তের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের মহা-প্রস্থান।

আবার এই পবিত্র ভূমিতেই, একদা বত্রিশবৎসর মাত্র বয়সে, আচার্য শঙ্কর সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছিলেন। কত যুগের কত পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত এই কেদারনাথ। ভক্তিবিগলিত চিত্তে কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্দিরের শেষ ধাপটিতে এসে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। সমগ্র অন্তর জুড়ে এক অবাচ্য অনুভূতি—যার তুলনা হতে পারে শুধু আর একটি কালের স্বর্গীয় অনুভূতির সঙ্গে, যে কালে জীবন্ত, মনুষ্যদেহধারী গুরুমূর্তি-শিবের অনুগামী হয়ে তিনি দর্শন করেছিলেন অমরনাথের গুহামন্দির, গুহামন্দিরের শিব-বিগ্রহ।

ভারতের নানা প্রদেশ থেকে, নানা প্রত্যন্ত থেকে এই বিশেষ তিথি উপলক্ষ্যে কেদারনাথের দুর্লভ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কত নরনারী, কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অশেষ দুঃখ-ক্লেশ অতিক্রম করে সমবেত হয়েছে মন্দিরের দ্বারদেশে।

সেই সম্প্রদায়হীন, বর্ণহীন, আভিজাত্যহীন এক ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা। চিত্ত তাঁর প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ, তাঁর তীর্থ-দর্শন সার্থক।

* * * *

কেদারনাথের পর বদ্রীনারায়ণের পথে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং এ যাত্রারও প্রতিটি পদক্ষেপ নিবেদিতার কাছে একটি নব-আবিষ্কারের পর্যায়ভুক্ত ছিল। তীর্থকামী অসংখ্য নর-নারীর শোভাযাত্রাটিকে মনে হয়েছিল সর্বথা অতুলনীয়, সমগ্র পরিবেশটিকে মনে হয়েছিল প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। আর হিমালয়ের চির-সবুজতার মধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে, পাতায় পাতায়, ফলে পুষ্পে যে মহা-উৎসবের আনন্দ-অর্ঘ্য তা যেন এ পৃথিবীরই নয়। সে স্বর্গীয়, সে শাশ্বত ও সনাতন। সমগ্র আর্যাবর্তের হৃদয় স্পন্দন যেন তাদের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

ঐ বদ্রীনারায়ণের পথে, অলকানন্দার তীরে, কত বৃদ্ধা রমণীকে তিনি দেখেছিলেন যাঁদের ভক্তি-বিশ্বাস, যাঁদের আত্মসমর্পণ তাঁকে অভিভূত করেছিল। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য আর তিনি দেখেন নি।

দুরারোহ চড়াই-র পথে, উৎরাই-র পথে একটি যষ্ঠীমাত্র অবলম্বন করে কত দীর্ঘ পথ তাঁরা অতিক্রম করে চলেছেন। অন্য কারো সাহায্য তাঁরা গ্রহণ করবেন না।

'ইষ্টে নিষ্ঠা, গুরৌ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস জগদীশ্বরে'—এই সম্বল নিয়ে দুর্গম তীর্থ-পথের তাঁরা যাত্রী। একদিন একটি বৃদ্ধাকে দেখেছিলেন অলকানন্দার তীরে। তখন সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে। আকাশ-গাত্রে, পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় সূর্য-কিরণ অপূর্ব সৌন্দর্যের বিস্তার করেছে। কিন্তু শীতের প্রচণ্ডতা দুঃসহ। তারি মধ্যে সেই বৃদ্ধা অলকানন্দায় স্নান করে সিক্তবস্ত্রে হাত দু'টি জোড় করে ঊর্দ্ধমুখে সূর্যকে প্রণাম জানাচ্ছেন। বৃদ্ধার মুখে ও অবয়বে আত্মনিবেদনের সে কী পবিত্র-সুন্দর অভিব্যক্তি!

বহুদিন পরেও বৃদ্ধার সেই উজ্জ্বল মুখখানা, তাঁর সূর্য-প্রণামের সেই বিচিত্র ভঙ্গীটি নিবেদিতার মনে ছিল। কত লোকের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সে অভিজ্ঞতাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন উত্তরকালে।

এইভাবে, জুনমাসের মধ্যভাগে, বদ্রীনারায়ণ পৌঁছেছিলেন যাত্রীদল।

পাহাড়ের গায়ে সুপ্রাচীন বদ্রীনারায়ণের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। একদিন মাহাকাব্যের যুগে এই স্থানেই দ্রৌপদীসহ চার-পাণ্ডব অর্জুনের স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

নর ও নারায়ণ,—এই দুই রূপে, ভগবান এই মহাতীর্থে নিত্য অধিষ্ঠিত। কথিত আছে, কবচ নামে এক কুখ্যাত দানবকে নিহত করবার জন্য এই বদরিকাশ্রমেই তপস্যা করেছিলেন নর-নারায়ণ-রূপী ভগবান। তারপর, তপস্যা-শেষে কবচকে বধ করে এ স্থানেই তিনি

অধিষ্ঠিত হলেন এবং তখন থেকে ভক্তেরপূজা-অর্ঘ্যও নিত্য গ্রহণ করে আসছেন।—

এ ইতিবৃত্তও জানতেন নিবেদিতা এবং বিশ্বাসও করতেন তার সত্যতা। তাই, কঠিন পার্বত্যপথ অতিক্রম করে জীবনের অপরাহ্ণকালে তিনি বদ্রীনারায়ণ-তীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে বসু-দম্পতি। কত আবেগে, কত ভক্তি-বিমিশ্র কৌতূহলে চিত্তটি ভরে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। তাঁর কাছে তীর্থটি জাগ্রত, দেব-আবির্ভাব অনুভূতি-লভ্য। কিন্তু, গোঁড়া হিন্দুসমাজের কঠিন বিধান, অ-হিন্দু বলে, অ-ভারতীয় বলে—নিবেদিতাকে মন্দিরে প্রবেশ করবার অনুমতি দিল না। তাই বিগ্রহদর্শনও তাঁর অদৃষ্টে ঘটল না। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত বিষণ্ণ অন্তরে মন্দির-যাত্রীদের গমন ও নির্গমন তিনি দেখতে লাগলেন। কিন্তু, এরই মধ্যে অকস্মাৎ আর এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হল। কে জানে, কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে—সহসা মনের অবসন্নতা ছায়াবাজির মত অন্তর্হিত হয়ে গেল। কে যেন অদৃশ্য কল্যাণ-হস্তের স্নিগ্ধ-মধুর স্পর্শে সমস্ত মনপ্রাণ তাঁর ভরে দিল, সমগ্র সত্ত্বাকে পরমানন্দে উদ্ভাসিত করে দিল।…

বদ্রীনাথের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ দর্শনে কৃতার্থ হলেন নিবেদিতা। অনুভব করলেন, এক পূর্বগ মহাজনের মহাবাণীর সত্যতা,—

'এমন স্থান কি সত্যি আছে পৃথিবীতে! আহা, ভগবান নিজে এ-স্থানটি মনোনীত করে জগতের কল্যাণ-কামনায় এখানে তপস্যা করেছেন। এর প্রতি ধূলিকণা, প্রতি শিলাখণ্ড, প্রতি তৃণলতা ও গুল্মগুচ্ছ—চির পবিত্র, চির মধুময় ও চিন্ময়।'

এ তীর্থের সমতুল কিছু নাহি হয়।

এই একান্ত অনুভূতির মধ্য দিয়েই নিবেদিতার তীর্থভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। বদ্রীনারায়ণ থেকে রওনা হবার পূর্বে নর-

নারায়ণরূপী দেবতার উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ প্রণতি জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। তারপরই চির-বিদায়।...

প্রত্যাবর্তন-কালে চামৌলী হয়ে কোটদ্বারার পথে বদ্রীনারায়ণ থেকে তাঁরা নেমে এসেছিলেন, আর ২৯ শে জুন পদার্পণ করেছিলেন সমতল ভূখণ্ডে।

একদিন, বেশ কয়েকবৎসর পূর্বে, 'কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বাংলার ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ্য করে নিবেদিতা বলেছিলেন :

'তোমরা তোমাদের এই প্রাচীনা, তপোবৃদ্ধা জন্মভূমিকে ভাল করে দেখ। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে এর তীর্থ-মহিমা উপলব্ধি কর, এর ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন কর। এ দেশের নাড়ী-স্পন্দনের সঙ্গে তোমাদের হৃদ্-স্পন্দনও সমতালে স্পন্দিত হোক।'

সে নির্দেশ তাঁর স্বকীয় জীবনেও অক্ষরে অক্ষরে ঐ ভাবে তিনি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর গুরুর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমিটিকে ভাল করে দেখতে চেয়েছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন। এই ভূমির যে প্রাচীন পরিচয় সেটিকেও অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই করতে চেয়েছিলেন। সে আকাঙ্ক্ষা এই এতদিনে তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছিল। ভারতবর্ষের ভাব-রূপটির প্রতিফলন অন্তরে গ্রহণ করে প্রণাম করেছিলেন দেবতাকে, ভালবেসেছিলেন ভক্তকে আর একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই আর্যাবর্ত্তকে, যে আর্যাবর্ত্ত—

'ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে আছে নিত্য জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।'—

..*

॥ ষোল ॥

'মৃত্যু, তুমি মাতৃরূপা কালী
সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।'...

* * *

নিবেদিতার চরিতানুধ্যানের শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি। সন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উত্তর-সীমান্তে যে দীপ্ত-জীবনটির সূচনা, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্তে, হিমালয়ের শান্ত-শীতল ক্রোড়ে তার পরিসমাপ্তি, পূর্ণচ্ছেদ। মধ্যে চুয়াল্লিশ বৎসরের নানা অকল্পিত বৈচিত্র্যের একটি অপরিসর জীবন, আবার তারও সবটা নয়—শুধু পনের-ষোল বৎসর, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম-দর্শনলাভের পুণ্য-ক্ষণটি থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত-অবধি-পরিব্যাপ্ত, যে-কয়টি বৎসর, তারই মধ্য দিয়ে মুখ্যত এই মনস্বিনী নারীর অনন্য জীবনাখ্যায়িকা বিরচিত।...

তাঁর ত্যাগ অনন্য, প্রেমানুরাগ অনন্য। তাঁর তেজস্বিতা ও কমনীয়তা, তাঁর মনীষা ও নম্র-মাধুর্য, তাঁর যোদ্ধৃভাব ও সেবাপরায়ণতা, তাঁর পাশ্চাত্য শোণিত ও প্রাচ্য চিন্তাপ্রবাহ—সবই যেন পরস্পর বিরোধী হয়েও একই বৃন্তে বিধৃত ছিল। পরিবর্তনের ব্যাপকতা ছিল যেমন অপরিমেয়, তাদের দ্রুততাও ছিল তেমনি অবিশ্বাস্য।...

ইংরাজীতে 'মেটামরফসিস্' বলে একটি শব্দ আছে। একটি আমূল এবং সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনই ঐ শব্দটিতে সূচিত হয়ে থাকে। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কালে, ঐ জাতীয় পরিবর্তন কী ভাবে এবং

কোন্ নিগূঢ় প্রণালীতে মার্গারেট নোবল্‌কে—প্রথমে বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ও উত্তর-সাধিকারূপে রূপায়িত করেছিল, এবং তারও পরে, সূক্ষ্মতর প্রক্রিয়ায়, ভারত-ভগিনীরূপে সর্বথা পরিবর্তিত করেছিল, সেটি যথার্থ ই এক অনুপম অনুধ্যান-সামগ্রী।...

একদিন নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে স্বামীজী বলেছিলেন,

'Be thou to India's future son

Mistress, servant, friend in one'—যে কথা একাধিকবার আমার পূর্বে উল্লেখ করেছি,—সে আশীর্বাদই যথাকালে তাঁর জীবনে সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু কোন্ মন্ত্রগুপ্তিতে সেটি সম্ভব হয়েছিল—সেটিই এক বিচিত্র রহস্য। নিবেদিতা নিজে সে রহস্য কখনো অনাবৃত করেন নি। তাঁর চরিতাখ্যায়িকার গ্রন্থন-কার্য তাই খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ৺মোহিতলাল মজুমদার একদা তাঁর অননুকরণীয় ভাষা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীতে এ-সমস্যাটি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

'নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন,—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক-শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটিকে যে-ব্রত দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যেভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। কাজেই নিবেদিতাকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তাঁহার বাহিরের জীবন-যবনিকার অন্তরালে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাংলার মাটিতে নূতন করিয়া হলকর্ষণের পর, যখন

নবজীবনের বীজ বপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে নিবেদিতা যেন আর একটি বীজ। এই বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলপুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সার রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য। এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা সে করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবারই ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল—তাহা নির্ণয় করিবে কে? নিবেদিতার আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাব-জীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে? ধর্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ, কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর গ্রহণ কে কোথায় দেখিয়াছে?'… নিঃসংশয়ে কেহ দেখে নাই।…

যাহা অপ্রাপ্য তাহার দেখা পাওয়াই বা যাইবে কেন?—এই যথার্থ সমস্যা, এবং সে সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানই বর্তমান গ্রন্থের দুরূহ সাধনা, আর সে জীবনের শেষ কয়টি দিনের কাহিনী বিশ্লেষণেই তার পরিসমাপ্তি।…

* * * *

জীবনে শেষবারের মত পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে এসে খুব বেশীদিন আর নিবেদিতা জীবিত ছিলেন না। মাত্র ছয় মাস, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। মর্ত জীবনের সেইছিল তাঁর শেষ কয়টি দিন।

ঐ অক্টোবর মাসেই দার্জিলিং-এ তাঁর মৃত্যু হয়।…

ইউরোপ থেকে ফিরে দেহ ও মন—দু'টিতেই নিবেদিতা যেন নিরতিশয় ক্লান্ত ও কর্মভার-পীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। একটি বৈরাগ্য-কঠিন উদাসীনতা তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করেছিল।

একদিন বহুপূর্বে এক কর-রেখাবিৎ তাঁর কররেখা বিচার করে নাকি এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে তিনি স্বল্পায়ু হবেন, বিয়াল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। একালে প্রায়ই সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর মনে জাগ্রত হত। কে যেন বলত, অস্পষ্ট ইঙ্গিতে বলত, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তোমার জীবনান্ত ঘটবে।'

ক্রমে, আত্মগত-চিন্তার ফলে, সে ধারণাটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আর সে অনুসারে, মৃত্যুর জন্য ক্রমশঃই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মৃত্যুর পদধ্বনি মধ্যে মধ্যেই যেন তিনি শুনতে পেতেন। সে আসছে, মহারহস্যময়ী মৃত্যু, হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে—

'তীরের সঞ্চয় তোর পরে থাক তীরে,—
তাকাস নে ফিরে।

সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে পশ্চাতের
কোলাহল হতে অকূল আলোতে।'...এমনি আহ্বান।

এখন অন্তরে বাহিরে শুধু একটি কামনা উগ্র হয়ে দেখা দিচ্ছে, সে কামনা—নিজ জীবিতকালে ভারতবর্ষের দৈন্য-দুর্দশার কিছু নিরসন কি দেখে যাওয়া যাবে? এ দেশের শত-সমস্যার কিছু সমাধান, দীর্ঘ-নিদ্রার পর নবযাত্রার পথে জাতির কিছুটা অগ্রগতি,—একি প্রত্যক্ষ করে যাওয়া সম্ভব হবে? যদি হয়, যদি সার্থক হয় এই আকুতি—

'তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।'

তবেই তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দেবেন, চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বেন। মুক্তির জন্য তাঁর কোন উদ্বেগ নেই, কোন লোভও নেই।...

এ সময়েই, পর পর বেশ কতগুলি দিন, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নিবেদিতার।...

শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করে, জগন্নাথ-ক্ষেত্র দর্শন করে, সবে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন—ইংরাজী ১১ই এপ্রিল তারিখে। আর তার দু'দিন পূর্বে নিবেদিতাও মিসেস ওলি বুলের শেষ-কৃত্যাদি সম্পন্ন করে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে। সুতরাং সাক্ষাতের সুযোগও হয়েছিল।

তাছাড়া, মা এবার একমাসেরও কিছু বেশী দিন কলিকাতায় থেকে তারপর জয়রামবাটী যাত্রা করেছিলেন। সুতরাং, নিবেদিতা সেই একমাস-কালের প্রায় প্রত্যেকটি দিন তাঁর পূতঃ সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন। অপরাহ্নের দিকে, বিদ্যালয়ের কাজ শেষ করেই সাধারণত মা'র কাছে তিনি গমন করতেন এবং যতটা সময় সম্ভব তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসতেন। কত কথা হত সমাগত ভক্তদের সঙ্গে, কত প্রসঙ্গের অবতারণা হত মা'কে কেন্দ্র করে। আর তারই মধ্যে এক মুগ্ধমতি বালিকার মত বদ্ধ করপুটে বসে থাকতেন মায়ের স্নেহধন্য নিবেদিতা।...

মায়ের একটু সস্নেহ-দৃষ্টি, একটু কল্যাণ-করস্পর্শ, কোন তুচ্ছ উপহার মুহূর্তে নিবেদিতাকে যেন আনন্দে ডুবিয়ে দিত, এই স্থূল মাটির পৃথিবী থেকে আর এক সূক্ষ্ম অমৃতলোকে উন্নীত করে দিত।...

মায়ের সঙ্গে নিবেদিতার অপার্থিব সম্বন্ধের কথা ইতিপূর্বে আমরা একাধিকস্থানে উল্লেখ করেছি। নিবেদিতার চরিতানুধ্যানে সে নিঃস্বার্থ-গম্ভীর ভাব-সম্পর্কের অনুশীলন অপরিহার্য। যে নিবেদিতা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এত অনন্যা ছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের মত অসাধারণ এক প্রতিভাধর পুরুষের কাছেও দীর্ঘ দ্বন্দ্বের পূর্বে সম্যক

আত্মসমর্পণ করেননি, যে নিবেদিতার মনীষা ও তেজস্বিতা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডেই বহুল পরিমাণে স্বীকৃত ছিল, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অসামান্য পুরুষগণও যাঁর প্রজ্ঞার এবং ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেই নিবেদিতা শ্রীশ্রীমার মত আধুনিক শিক্ষায় প্রায়-অশিক্ষিতা একটি গ্রাম্য নারীর সহজ সারল্যের কাছে স্নেহ-নির্ভর একটি শিশুর মত, উৎফুল্ল আনন্দে প্রহরের পর প্রহর কী আকর্ষণের বশে অতিবাহিত করতেন—সে এক মহাবিস্ময়েরই ব্যাপার ছিল। অবশ্য তার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি।

কোনদিন কোন দ্বন্দ্ব, কোন সংশয় সেখানে লেশমাত্র ছায়াপাত করতে পারে নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ স্বামীজীর নির্দেশে মায়ের পদপ্রান্তে যে দিন প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন নিবেদিতা, সেদিন থেকে, একেবারে জীবনের অন্তিম-ক্ষণটি পর্যন্ত এক অনাবিল মাধুর্য ও স্নেহ-বিশ্বাসের সুবর্ণসূত্রে গোলার্ধের দুই প্রান্তের এই দুই মহীয়সী নারী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত ছিলেন। সে সম্পর্ক সহসা স্থাপিত হলেও, দিনে দিনে, নানা ঘটনার ঘাতে-প্রতিঘাতে দৃঢ় হয়েছিল, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বস্তুত, জীবনের সংকট-সঙ্কুল দিনগুলিতে একমাত্র মা-ই ছিলেন নিবেদিতার পরম নির্ভর, চরম ভরসা। আবার সুখের দিনে, এবং আনন্দোৎসবের দিনেও তিনিই ছিলেন অশেষ মঙ্গলদায়িনী, তিনিই ছিলেন কেন্দ্রস্থা। অন্য যে-কোন আশ্রয়-স্থল থেকে যে-কোন মুহূর্তে আঘাত আসতে পারত, অপ্রত্যাশিত বিরোধিতা ঘটতে পারত—কিন্তু মায়ের আশ্রয় শাশ্বত, মায়ের স্নেহ অক্ষয়।

কাজেই, আজ জীবন-সায়াহ্নে সে অক্ষয় ঐশ্বর্য দুই হাত ভরে আহরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন নিবেদিতা। যে-কয়টি দিন মা কলিকাতায় ছিলেন, সে কয়টি দিন যথাসাধ্য তাঁর পূতঃসঙ্গ ও সান্নিধ্য তিনি লাভ করতে চেয়েছিলেন। পাদযুগে প্রণত হয়ে নিত্য প্রর্থনা করেছিলেন…

'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
সে তপস্যা যেন ব্যর্থ নাহি হয়…'

'সত্য যে কঠিন,
সে কখনো করেনা বঞ্চনা।'

তাই সত্যকে যেন ভালবাসতে পারি, সত্যকে যেন গ্রহণ করতে পারি।—

এমনি ভাবেই মাতৃসান্নিধ্যেব একমাস সময় তিনি যাপন করেছিলেন।

তারপর, মে-মাসের প্রথমার্ধে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য নিবেদিতা যাত্রা করেছিলেন মায়াবতীর উদ্দেশ্যে এবং তাব অব্যবহিত পরে মা-ও যাত্রা করেছিলেন তাঁর পিত্রালয় জয়রামবাটীর পথে। আর মার সঙ্গে তার দেখা হয়নি জীবনে।

কেদার-বদ্রীর মত, এবার মায়াবতী যাত্রার সময়ও নিবেদিতার সহযাত্রী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র আর তাঁর সহধর্মিণী।…

প্রায় একমাসকাল মায়াবতীর নির্জন, শান্ত পরিবেশে ভালই ছিলেন নিবেদিতা। হিমকণাবাহী শীতল বায়ু তাঁকে বেশ-পরিতৃপ্ত করেছিল। একালে, মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমের অধিবাসী যাঁরা, তাঁদের কাছে একটি ভাষণও দিয়েছিলেন একদিন। ভাষণের বিষয় ছিল—'ইনটেলেক্চুয়াল কালচার।'

তারপর কাঠগুদাম হয়ে জুলাই মাসের প্রথম দিকেই তিনি কলিকাতা ফিরে এসেছিলেন।

এদিকে সময় এগিয়ে চলেছিল যেন নিরতিশয় দ্রুতগতিতে।

আবার এ-কালের অল্প কিছু দিন পূর্বে নিবেদিতার পক্ষে একটি বিশেষ বেদনা-দায়ক ঘটনাও ঘটেছিল। ঘটনাটি ভগিনী ক্রিশ্চিনকে নিয়ে। ক্রিশ্চিনের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। ভগিনী ক্রিশ্চিন ও নিবেদিতা একই গুরুর পদপ্রান্তে জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সেবায়

আত্মনিয়োগের সঙ্কল্পও উভয়ের জীবনকে বহুলাংশে একই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। চরিত্রের নানা স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক যুগে, তার সংগঠনের কাজে, ক্রিশ্চিনের অবদান সামান্য ছিলনা। নিবেদিতার পরেই সে ক্ষেত্রে ক্রিশ্চিনের নাম উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতা স্বয়ং সে-কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করেছেন। এমন কি তাঁর স্বকীয় ধারণা এই ছিল যে ক্রিশ্চিন যদি নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন তবে বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত হবে। এবং স্বভাবতঃই তিনিও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ক্রিশ্চিনের সঙ্গে নিবেদিতার মত-বিরোধ ঘটেছিল। হয়ত, বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারেই সে মতভেদ ঘটে থাকবে, অথবা অন্য কোন ব্যাপারেও সেটা হতে পারে,—আমরা সঠিক জানিনা। তবে, এরই ফলে বিদ্যালয়ের সংশ্রব থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন ক্রিশ্চিন এবং মধ্যে বেশ কিছুদিন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত ঘটে নি।···সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

তারপর দেখা হয়েছিল মায়াবতীতে। ক্রিশ্চিন সে সময় মায়াবতীতেই ছিলেন। তখন, বিদ্যালয়ের কাজে পুনঃ যোগ দেবার জন্য নিবেদিতা তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু ক্রিশ্চিন সম্মত হননি এবং পরম দুর্ভাগ্য এই যে নিবেদিতার জীবিতকালে আর তিনি বোসপাড়া লেনে প্রবেশও করেন নি। উত্তর কালে, যখন প্রবেশ করেছিলেন তখন নিবেদিতা আর ইহ জগতে নেই। জাগতিক মান-অভিমান ও কান্না-হাসির পালাগান শেষ করে, এ পৃথিবীর বুক থেকে তিনি চির-বিদায় গ্রহণ করেছেন।···

আর, শুধু ক্রিশ্চিনই নয়! তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুধীরা বসুও এ-সময় নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। সে ত্যাগেরও সঠিক কারণ জানা যায় না। ক্রিশ্চিনের ব্যক্তিগত

প্রভাব কোনভাবে সুধীরা দেবীকে প্রভাবিত করেছিল কিনা সেও এক অনুমান। তবে, হেতু যাই হোক, নিবেদিতার পক্ষে এটিও যে বিশেষ বেদনাদায়ক হয়েছিল—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রত্যুত, এসময়টাই যেন নানাভাবে নিবেদিতার পক্ষে একটা দুঃখের সময় ছিল এবং ক্রমে ক্রমে তিনি যেন সংসারে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন।...

বাহ্য ঘটনাপ্রবাহও তখন অদ্ভুত ভাবেই আবর্তিত হয়েছিল। কারণ, নিবেদিতার মায়াবতী থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের ঠিক একমাস পরেই বিবেকানন্দ-জননী দেবী ভুবনেশ্বরী মারা গিয়েছিলেন, ইংরাজী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই তারিখে। আবার, তার একমাস মধ্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন রামকৃষ্ণ-তনয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

উভয়েই নিবেদিতার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং উভয়েরই একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা।

স্বামীজীর জননীর মৃত্যুক্ষণে তাঁর শয্যাপার্শ্বেই নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। দেখেছিলেন মহাপ্রস্থানের সে বিচিত্র দৃশ্য, কেমন করে মৃত্যুর মহাশূন্যতার মধ্যে জীবনের শেষ-নিঃশ্বাস অকস্মাৎ এক সর্বগ্রাসী যবনিকা টেনে দেয়, কিভাবে অদৃশ্য লিপিতে অঙ্কিত করে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ-রেখা। নিজ আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণের দিনটির কথাও কি ঠিক সেই মুহূর্তটিতে তাঁর মনে এসেছিল? আসাই অবশ্য সম্ভব। তবে, সে মহাপ্রয়াণ তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন পরে, অনেক পরে, যখন স্বামীজী আর পৃথিবীর মানুষ নন, যখন তিনি ইতিহাসের পুরুষরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছেন, তখন।

কিন্তু ভুবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যু-ক্ষণে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃতদেহের অনুগমন করে শ্মশানেও গিয়েছিলেন এবং শোনা যায়, শ্মশান ঘাটে বসেই স্বামীজীর সর্ব-কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথকে একখানি পত্রও লিখেছিলেন। তারপর, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সকলের সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন শ্মশান থেকে।...

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দেহাবসান ঘটেছিল 'উদ্বোধন'-বাটীতে। স্বামীজীর যে কয়জন গুরুভ্রাতার সঙ্গে নিবেদিতার অতি-নিকট সম্বন্ধ ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁদের অন্যতম। নানাভাবে, নানা কাজে নিবেদিতা তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন। উৎসাহ পেয়েছিলেন দুঃখের দিনগুলিতে।

কঠোর, সংযমী সাধু ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। দীর্ঘকাল অবিরাম পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছিল এবং চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনীত হয়ে 'উদ্বোধন' বাটীতেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। এ সবই নিবেদিতার চোখের উপর সংঘটিত হয়েছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা, তাঁর গুরুগতপ্রাণতা ও কর্মকৌশল, সর্বোপরি তাঁর নিরভিমান উচ্চ-জীবন—স্বতঃই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—'শশীকে (রামকৃষ্ণানন্দ) মঠের কেন্দ্র বলে জানবে।'

আজ সহসা, সেই রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মৃত্যু নিবেদিতাকে গভীর ভাবে আঘাত করেছিল। সে মৃত্যু আরেকবার যেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে মৃত্যু অপরাজেয় ও ধ্রুব, মৃত্যুই জীবনের অপরিহার্য পরিণাম।···

এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পূর্বে আবার, মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়ার মৃত্যু সংবাদও পেয়েছিলেন নিবেদিতা। এবং সে সংবাদও তাঁর পক্ষে দুঃখেরই সংবাদ ছিল। কারণ, শত বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও মিসেস বুলের কন্যা চিরদিনই নিবেদিতার স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

অতএব, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের মাসগুলি একাধিক মৃত্যুর আঘাতে ভারাক্রান্ত হয়ে নিবেদিতাকে পীড়িত করেছিল।···

তবে, ওলিয়ার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অন্য একটি সংবাদে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

মিসেস বুলের উইলের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে উইল নিয়ে ওলিয়া যে বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিল এবং তার জন্য নিবেদিতার

যে বিশেষ উদ্বেগ ছিল সে কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। মিসেস বুলের অর্থ-সহায়তা বিদ্যালয় পরিচালনায় অপরিহার্য ছিল এবং সেজন্য মিসেস বুলের উইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এটাও স্বভাবতঃই নিবেদিতা আশা করেছিলেন। সে আশা নিরর্থকও ছিল না। কিন্তু, ওলিয়া ছিলেন তার প্রতিবন্ধক। এখন ওলিয়ার মৃত্যুতে সে প্রতি-বন্ধকতা অপসারিত হল। নিবেদিতা সংবাদ পেলেন যে বিদ্যালয়ের জন্য বাৎসরিক সাত শত পাউণ্ড অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে উইলে। সুতরাং, ওলিয়ার মৃত্যু-সংবাদ দুঃখের হলেও নিবেদিতার কাছে, অন্যদিক থেকে, সে-সংবাদ একটু স্বস্তির ভাবও বহন করে এনেছিল।

এদিকে পূজা-অবকাশ এসে গেল। বাংলার আকাশে-বাতাসে শরতের আগমনী গান প্রতিধ্বনিত হল। কাশের বন সাদা হয়ে এল, ঝড়ে-পড়া শেফালী ফুলে পল্লী-পথ মনোরম শ্রী ধারণ করল। শৈল-সুতার আগমন-সম্ভাবনায় বঙ্গ-প্রকৃতি স্নিগ্ধ-মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে গেল।

বিদ্যালয়ের ছুটি হল প্রায় একমাসের জন্য। নিবেদিতা অবকাশ যাপনের জন্য বসু-দম্পতির সঙ্গে দার্জিলিং যাওয়া স্থির করলেন। যাত্রার পূর্বে 'উদ্বোধনে' গিয়ে স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা যোগীন-মা ও গোলাপ-মার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গিয়ে তাঁর কাছ থেকেও শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন। গিরিশবাবু নিজেও তখন বিশেষ সুস্থ ছিলেন না। অসুস্থ অবস্থায়, রোগশয্যা থেকেই 'তপোবন' নামক নাটকটি তখন তিনি রচনা করছেন।

নিবেদিতা তাঁকে তাগিদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—নাটকটি যেন তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলেন, যেন দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেই সেটি তিনি শুনতে পান।

কিন্তু নিবেদিতার সে আশা আর পূর্ণ হয় নি। 'তপোবন' নাটক যথা সময়েই সমাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু নিবেদিতা তখন পরলোকে।

তাই করুণ মর্মবেদনায় নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন গিরিশবাবু। উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেনঃ

পবিত্রা নিবেদিতা,—

বৎসে, তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিং যাইবার সময় আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, —'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি ত জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে দেখা করতে আইস না? শুনিতে পাই মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে। যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনো আমায় তোমার স্মরণ থাকে তবে আমার স্নেহপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।'···

বড় মর্মস্পর্শী এই উৎসর্গ, নিবেদিতার প্রতি গিরিশচন্দ্রের মনোভাব কেমন ছিল তার একটি নিদর্শনও বটে! কিন্তু যাক্ সে কথা।—

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের যথাযথ ব্যবস্থাদি শেষ হল এবং যাত্রার তারিখও স্থির হয়ে গেল। যাত্রার দিন পল্লীর গুণমুগ্ধ বহু নরনারী নিবেদিতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। প্রাক্তন ছাত্রীরাও প্রণাম করে গেল তাদের মাতৃসমা সিস্টারকে। তারপর দার্জিলিং পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন নিবেদিতা। কিন্তু সে দিন কে জানত যে সে যাত্রাই তাঁর শেষ-যাত্রা। কে জানত, যে আর কোনদিন নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণতলে তিনি ফিরে আসবেন না, বাগবাজারের পল্লী-পথে আর তাঁর পদচিহ্ন পতিত হবে না। কেই-বা জানত যে সে দীর্ঘ, ঋজু তনুখানি, সেই সর্বজন-পরিচিত গৌরবর্ণ মুখখানি আর কোনদিন দেখা যাবেনা। না, কেউ জানত না।···

তবে নিবেদিতা নিজে হয়ত জানতেন সেকথা।

সুস্পষ্ট না হলেও, তাঁর অবচেতন মনের নিভৃত ক্ষেত্রে মৃত্যুর ছায়াপাত হয়ত তিনি অনুভব করেছিলেন। একটি পূর্বাভাস, যাকে

ইংরাজীতে প্রিমনিসন্ বলে—তা হয়ত তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই, 'উদ্বোধন'-বাটীতে যোগীন-মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন :

'যোগীন-মা, ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, এই হয়ত আপনাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা।'

যোগীন-মা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মনেও সংশয় জেগেছিল। কিন্তু সে কথাও থাক।

সমতল ভূ-ভাগ ত্যাগ করে হিমালয়ের কোলে শেষ-আশ্রয় গ্রহণ করলেন নিবেদিতা।

* * *

দার্জিলিং!

ভূটিয়াদের পরিভাষায় দোরজে-লিঙ।

বাংলার এককালীন প্রসিদ্ধ শৈল-নিবাস। ইংরাজ আমলের ঐশ্বর্য-সমারোহের দিনগুলিতে দার্জিলিং-র চেহারাই ছিল স্বতন্ত্র।

এর নিম্নভাগে, হিমালয়ের পাদমূলে, বিখ্যাত তরাই অঞ্চলের বিস্তৃতি। আর উপরের দিকে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় জালা পাহাড়।

মধ্যে কত বনজ সম্পদ, কত কলস্বনা পার্বত্য নির্ঝরিণীর অপরূপ সৌন্দর্য। মহানন্দা, রংগীত প্রমুখ পার্বত্য-নদীর কত অশ্রান্ত প্রবাহ!

তিব্বতী বৌদ্ধদের বহু মন্দির এই দার্জিলিং-এ, বিশেষ করে ঘুম এবং দা-শহরে। দার্জিলিং চিরদিনই মেঘের-মুলুক রূপে বিখ্যাত। ক্বচিৎ কখনো ঊর্দ্ধ-আকাশের মেঘাবরণ অপসৃত হয়। আর সেই অবকাশে, দার্জিলিং-এর নির্মেঘ আকাশতলে যদি কেউ দাঁড়ায় তবে দেখতে পাবে শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায় ছেচল্লিশ মাইল দূরের কাঞ্চন-জঙ্ঘার বিচিত্র মহিমা। রজনীর শেষযামে, টাইগার হিলের শীর্ষদেশে যদি পূর্বাস্য হয়ে কেউ বসে, আর দৈবক্রমে আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে, তবে দেখতে পাবে এভারেষ্টের অমলিন

শিখরচূড়া। দেখতে পাবে, ধূর্জটির অর্ধশায়িত ধ্যানমূর্তি, তুষার-শুভ্র বিস্তৃত তাঁর বর-তনু। উষার স্বর্ণকিরণে মুহুর্মুহু সে-তনু বহুভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, অবাচ্য সৌন্দর্যে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করে দিচ্ছে।

আজ প্রকৃতির সেই রম্য-নিকেতনে, হিমশীতল বায়ু-স্পর্শে নিবেদিতার ক্লান্ত দেহ ধীরে ধীরে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। মনটিও যেন বেশ প্রফুল্লতা লাভ করল। 'রায়ভিলা' নামক একটি বাড়ীতে তাঁরা বাসা বাঁধলেন। পূর্ব-পরিচিত অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কিছু কিছু লেখার কাজেও ধীরে ধীরে হাত দিলেন নিবেদিতা। কিন্তু এসবের মধ্যেও, ক্ষণে ক্ষণেই যেন একটি অস্পষ্ট মৃত্যু-চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসত। জীবনের একটি হিসাব-নিকাশ করতে ইচ্ছা হত। চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে, পৃথিবীর অপরাংশে আয়র্লাণ্ডের একটি নিভৃত প্রান্তে কোথায় একদিন যেন জীবনের প্রারম্ভ সূচিত হয়েছিল, আর চুয়াল্লিশ বৎসর পরে বঙ্গদেশের আর এক প্রান্তে পাহাড়-ঘেরা দার্জিলিং-এর 'রায়ভিলা'য় বসে তার পরিসমাপ্তির কথা মনে আসে।

মধ্যের যে আশা-নিরাশার দীর্ঘ দিনগুলি, বিশেষ করে ভারতবর্ষের বুকে, স্বামীজী-নির্দিষ্ট পথে ধর্ম ও কর্মের যে অভিযান —সে কি সার্থক হয়েছে?

গুরুর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন তাঁর জীবনে কি মূর্ত হয়েছে?

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।'

এ-মন্ত্র কি তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছে?
হয়ে থাকলে সে কতটুকু এবং কত দূর-প্রসারী?

এমনি প্রশ্ন নিবেদিতাকে যেন গভীরভাবে অন্তর্মুখী করে তুলত।

আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে আর একটি ভাবের উদয় হত। মনে হত, কর্ম মিথ্যা, ধর্মের বাহ্য-অনুষ্ঠান মিথ্যা, আশা-নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এক ক্ষণস্থায়ী প্রহেলিকা ভিন্ন আর কিছু নয়।—

'ঈশাবাস্যমিদং'—এ অনুভূতিই শাশ্বত অনুভূতি। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—এটিই সারকথা।

তাঁরই জন্য ব্যাকুল হও, তাঁরই তরে বিরহ-বেদনা অনুভব কর। তাঁরই প্রসাদলাভে সর্ব-সার্থকতা অর্জন কর। তাঁর অভাব নেই, ক্ষুধা নেই। অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই।

তাঁরই— 'নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।'

এই তাঁর সত্যিকার রূপ!

অতএব, আমার ভালো-মন্দ, ইহকাল-পরকাল, আমার কান্না-হাসির মায়া-মরিচীকা সবই তাঁকে নিবেদন করে আমি নিশ্চিন্ত হব, মুক্ত হব।

আমার হৃদয়-পদ্মে সর্বমহিমায় তিনি আবির্ভূত হবেন। হে দেব,

'আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্ম দলে।'…

মৃত্যু! কোন্ লোকান্তরে যাত্রা সে তো নয়। কোন মহাশূন্যতায় নিঃশেষ অবলুপ্তিও হয়ত সে নয়। কারণ দেহেরই তো বিনাশ, আত্মা অবিনাশী।

'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বশঃ ভারত।

এ-ধরনেরই চিন্তা এখন নিবেদিতার ধ্যানে ও কল্পনায় জাগ্রত হত। কত উদাস নিঃসঙ্গ মুহূর্তে দূর পর্বতশিখরের দিকে তাকিয়ে পুনঃ পুনঃ কেবলই স্বামীজীর কথা মনে আসত!

মৃত্যুর তরঙ্গহীন মহাপারাবার প্রসারিত রয়েছে সম্মুখে—সীমাহীন, অন্তহীন; আর তারই মধ্যে জীবন-তরণী ভাসমান। এইবার সে ডুববে অথবা সে ডুবেই গেছে। এ জীবনের এই তো পরিণাম! কাজেই,

'Let all things that breathe, without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely each in his own path'—

এই তাঁর অন্তরের কামনা।··

ইতিমধ্যে তাঁর নিজের উইলটিও প্রস্তুত করা হল। ব্যাঙ্কে তাঁর যে টাকা আছে, তিনশত পাউণ্ড, ওলিবুলের সম্পত্তির মধ্যে যে সাতশত পাউণ্ড প্রতিবৎসরে প্রদত্ত, আর তাঁর যাবতীয় গ্রন্থের সত্ত্ব ও উপসত্ত্ব—বেলুড়ের স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত মঠের ট্রাষ্টিদের হাতে দান করলেন নিবেদিতা।

শর্ত রইল, ঐ অর্থ একটি স্থায়ী-ফাণ্ড হিসাবে জমা থাকবে আর তার আয় থেকে ভারতীয়-প্রণালীতে ভারতীয়-নারীর জন্য জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভগ্নী-ক্রিশ্চিনের পরামর্শমত সে অর্থ ব্যয়িত হবে। অবশ্য যতদিন ক্রিশ্চিন জীবিত থাকেন।—

মোটামুটি এই তাঁর উইলের সারকথা।

এদিকে জীবনের পরমায়ুও নিঃশেষ হয়ে এল। অন্তিম মুহূর্তের অবিলম্বতা নিজের মধ্যে ক্রমশঃই স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এরই মধ্যে একদিন আবার 'সন্দকফু' নামক একটি গিরিশৃঙ্গে যাবার কথা উঠল। পথটি দুর্গম। অশ্বপৃষ্ঠে যেতে হবে. সময়ও দু'তিন দিনের কমে হবে না। তথাপি, নিবেদিতা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি যাবেন, অশ্বপৃষ্ঠে পর্বতারোহণ চিরদিনই তাঁর কাছে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

কিন্তু যাত্রার পূর্বেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিন রক্তামাশয় তাঁকে শয্যাশায়ী করে দিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। তাঁরই চিকিৎসাধীনে নিবেদিতাকে রাখা হল। মাতৃস্নেহে সেবাভার গ্রহণ করলেন বসু-জায়া অবলাদেবী। কিন্তু সবই ব্যর্থ, সবই নিরর্থক হল।

সুনিপুণ চিকিৎসা এবং সেবা সত্ত্বেও দিনে দিনে নিবেদিতার জীবন-দীপ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। তারপর, সহসা মর্ত-জীবনের শেষ দিনটি উপস্থিত হল একেবারে অকস্মাৎ।

সেদিন শুক্রবার, সন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দেব ১৩ই অক্টোবর। প্রভাতটি ছিল বড় প্রসন্ন ও মধুর। নির্মেঘ আকাশে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়েছিল সহস্র বর্ণ-মাধুর্যে। সমগ্র পৃথিবীর অন্তরের প্রার্থনা—

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—যেন সেদিনের আকাশে বাতাসে, হিমালয়ের শিখরে শিখরে বিচিত্র লিপিতে চিত্রিত হয়েছিল।

মৃত্যুপথ-যাত্রী, মহীয়সী ভারত-ভগিনী নিবেদিতার কল্পলোকে এক তরঙ্গহীন মহাসমুদ্র বিস্তৃত হয়ে দেখা দিল। একটি ক্ষুদ্রায়তন তরণী ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে, কিন্তু অস্ত-দিগন্তের নিম্নবলয় অতিক্রম করে আবার আবির্ভূত হবেন ভবিষ্যতের সবিতা।

সহসা আরক্তিম হয়ে উঠল মুখমণ্ডল। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হল এই শেষ বাণী—

'The boat is sinking but the sun will rise again.'

ডুবছে, তরণী ডুবছে কিন্তু আবার উঠবে সূর্য্য।

সত্য সত্যই নিমজ্জিত হল তরণী। এল অন্তিম নিঃশ্বাস, এল মহানিদ্রার মহাশূন্যতা। মহামায়ার কোলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন নিবেদিতা। এক বিচিত্র মহিমময় জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে গেল।···

সেদিন অপরাহ্ণে দার্জিলিং-এর শ্মশানক্ষেত্রে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হল। গঙ্গাজলে বিধৌত করা হল সে পবিত্র দেহখানি, সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে উত্তরাস্যে চিতাশয্যার উপর তাঁকে স্থাপিত করা হল। তারপর প্রধূমিত বহ্নিশিখা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করল, নিঃশেষ করে দিল।

'মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে হল তার সীমা।'···

আজ সেই পুণ্য শ্মশানভূমিতে গেলে দেখা যাবে একটি স্মৃতি-ফলক অতীত দিনের সাক্ষ্য-বহন করে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে।

অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যেন ঘোষণা করছে,—এই সেই ভূমি, যেখানে সর্বরিক্তা ভারত-ভগিনী নিবেদিতা তাঁর শেষ-শয্যা রচনা করেছিলেন।

'এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।'

অদূরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা।...

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সমগ্র দেশে নিবেদিতার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে গেল। ছড়িয়ে গেল বাংলায়, ছড়িয়ে গেল সমগ্র ভারতবর্ষে। একান্ত আপনজনের আকস্মিক সে মৃত্যু-সংবাদ সমগ্র দেশকে যেন বিমূঢ় করে দিল। জীবিতকালে সুস্পষ্টভাবে যে সত্য উপলব্ধি করা যায় নি, মৃত্যুর পর সেটি প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিল। বোঝা গেল, নিবেদিতার জীবনব্রত কত নিবিড় সফলতা অর্জন করেছে, দেশের বুকে তাঁর স্থান কত মহিমময়, কত গভীর প্রীতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।...

আজ ভগ্নী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার চির-আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ভারতবর্ষ। তবে যে স্বাধীনতা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন স্বপ্ন ছিল, তাঁর ধ্যানের সামগ্রী ছিল এবং যে স্বাধীনতার মন্ত্র গুরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে নিবেদিতা স্বয়ং কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন,—সে স্বাধীনতার রূপ বা প্রকৃতি কিরূপ ছিল, আজকের ভারতবর্ষের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তা সঠিক অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে প্রয়াসেও আমরা অগ্রসর হব না।

আমরা এ গ্রন্থ শেষে শুধু অকুণ্ঠ প্রণতি জ্ঞাপন করব সেই মহীয়সী নারীকে—সতীর সঙ্গে যাঁর উপমা, কাদম্বরীর মহাশ্বেতার যিনি সমগোষ্ঠী। যাঁর ত্যাগের তুলনা নেই, গুরুপ্রেমের তুলনা নেই,

ভারতবর্ষের প্রতি যে গভীর প্রীতি ও একাত্মবোধ, তারও তুলনা নেই। তেজে ও নম্রতায়, ভক্তিতে ও প্রজ্ঞায় তাঁর দিব্য জীবনখানি নিত্য উদ্ভাসিত ছিল। সারল্যে ও উচ্ছ্বাসে, নির্ভীক কর্মপ্রয়াস ও নিরলস তপস্যায়—তাঁর চরিত্রটি চির নির্মল ছিল, নিষ্কলুষ ছিল।...

আজ তাই, ওগো তপস্বিনী,
এ দেশের প্রতি ঘরে ঘরে,
গুরুর আশীষে আর দেবতার বরে,
তুমি অনিন্দিতা।
পরম আত্মীয়ারূপে নিত্য-সমাদৃতা
ভগ্নী নিবেদিতা!...

ভারতের মাটিকে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তুমি অকপটে ভালবেসেছিলে, একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছিলে। সে অকৃত্রিম ভালবাসার পাদপীঠে নিজকে সর্বাংশে উৎসর্গ করতে কোন বাধা তুমি সহ্য করনি। মিথ্যার সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে কখনো, কোন হেতুতে তোমার কোন আপোষ ছিল না, কম্প্রমাইজ ছিল না।

আজ তাই, হে নিবেদিতা, অগ্নিশিখা-সম-প্রভা তোমার সে শুদ্ধ জীবনটিকে আদর্শরূপে আমরা বরণ করি, অপ্রাকৃতজ্ঞানে মনন করি, সুদুর্লভ জেনে ধ্যান করি—

তুমি দেবি, দানিও আশীষ
অমৃতের ধারা;
তমসার পরপার হতে,
অমৃতের সুধা-স্নিগ্ধ পথে
পাঠাইও বাণী তব দিব্য মধুক্ষরা,
প্রসন্ন-প্রখরা।

সমাপ্ত